মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[চতুর্থ খণ্ড]

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[চতুর্থ খণ্ড]

মূল

মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী
০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস
[চতুর্থ খণ্ড]

মূল : মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ : মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান

প্রকাশক : মাওলানা মুফতী ইসহাক
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২

পরিবেশক : অন্যরকম প্রকাশনী, বাংলার প্রকাশন
রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ

মূল্য : ৫৮০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

জনৈক লেখক বই উৎসর্গ করেছেন তার জীবনসঙ্গিনীকে। বলেছেন, জীবনের বহু অপূর্ণতা নাকি নীরবে পূর্ণ করে দিয়েছে সে। লেখাটা পড়ে ভালো লাগল। মনে হল, আমারও তো এমন হয়েছে; হয়তো সবারই এমন হয়। আল্লাহর নবীর পাক যবানীতে এ কথা বহু আগেই উচ্চারিত হয়েছে-

من نكح فقد استكمل نصف الإيمان

ইচ্ছে জাগল, আমিও একটি বই 'তার' নামে, তার সুস্থ, সুন্দর ও দীর্ঘ জীবন কামনায় উৎসর্গ করব। কিন্তু মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়াল।... থাক, আরেকটি হাদিস মনে পড়ছে।

তবু মনের ইচ্ছেটা লিখে দিলাম। হয়তো একদিন, লেখার দোষগুলোও ঘুচে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

—অনুবাদক

অনুবাদকের আরজ

হামিদান ওয়া মুসল্লিয়ান ওয়া মুসাল্লিমা। পরম করুণাময় আল্লাহ্র দরবারে লাখো-কোটি শোকর ও সুজুদ, 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডটি প্রকাশের পথে। দয়াময়ের অসীম দয়া ছাড়া নগণ্য বান্দার হাতে এমন ভারী ও বৃহৎ কাজ সম্পন্ন হওয়া সত্যিই অসম্ভব। কাজেই, প্রশংসা সবই কেবল তার।

অতীতের আরেক নাম ইতিহাস। ইতিহাসের শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না। কারণ, জাতীয় উন্নয়নের সঠিক পথ কোন্‌টি এবং অধঃপতন থেকে মুক্তির উপায় কী, তা জানতে হলে ইতিহাসের কাছেই ফিরে আসতে হবে বারবার। তাই তো মহান আল্লাহর পাক কালামে বারবার ইরশাদ হয়েছে,

سیروا فی الارض

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের ইসলামি অঙ্গনে ইতিহাসচর্চার এক আশান্বিত আয়োজন ও শুভ প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। আরববিশ্বের বড় বড় লেখকের ছোট-বড় বহু ইতিহাসগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত ও পাঠকনন্দিত হয়েছে। কেউ কেউ নিজ থেকে সংকলনেরও চেষ্টা করেছেন। অনেকেই আরো লিখছেন, অনুবাদ করছেন; বাজারে আসছে, পাঠকও কিনছে।

ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখার এমনই মনোহর পরিবেশে পাঠক সমীপে হাজির হয়েছে 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' নামের আরেক বিপ্লবী ও কালজয়ী ইতিহাসগ্রন্থ। এখানে ইতিহাস শুধু ইতিহাস নয়; বরং অনেক কিছুর সমন্বয়। ইসলামের বিরুদ্ধে ছড়ানো প্রাচ্যবিদদের নানান অলীক গল্পকাহিনির নিরীক্ষণ, ইতিহাসের বিভিন্ন স্পর্শকাতর ঘটনার যথোপযুক্ত চিত্রায়ণ, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিতে বর্ণিত বিভিন্ন বানোয়াট বর্ণনার চুলচেরা বিশ্লেষণ ইত্যাদি। এ ছাড়াও এর অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আশা করি পাঠক তা অবগত হয়েছেন।

এমন একটি মূল্যবান রচনার অনুবাদকর্মে যুক্ত হতে পেরে আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ ও পুলকিত। তাই হৃদয়ের গভীর থেকে শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মহোদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাধ্যমতো অনুবাদ করতে চেষ্টায় কোনো কার্পণ্য করিনি, এটুকু বলতে পারি। পেরেছি কতটুকু, তা সুধীপাঠকই ভালো বলতে পারবেন। এই খণ্ডে আমার অনুবাদ-অংশ ভূমিকার পর থেকে। ভূমিকা অনুবাদ করেছেন তরুণ লেখক ও অনুবাদক মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন। পাঠকের কাছে অনুরোধ থাকবে, কোথাও কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করবেন। কথা দিচ্ছি, পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ, আমাদের এই উদ্যোগ ও আয়োজন যেন কবুল করেন এবং লেখক থেকে পাঠক পর্যন্ত সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

বিনয়াবনত
মুহাম্মদ নূরুয্যামান
মুরাদপুর, ঢাকা

২৯ জুমাদাল উখরা, ১৪৪২
রাত : ১২.১৬ মি.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

যা না বললেই নয়

আগত পৃষ্ঠাগুলো সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি মনে রাখা আবশ্যক। যথা :

১. কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা বা ঘটনা দেখে সাহাবিদের প্রতি ইসলামি বিধিবদ্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে কোনো মতামত বা ধারণা গ্রহণ করা কখনোই কারো জন্য সমীচীন নয়। কেউ এমনটি করলে আমরা তার জন্য দায়ী থাকব না।

২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ সাহাবিদের ব্যাপারে যে আকিদা-বিশ্বাস লালন করে গেছেন, আমাদেরকে তা-ই পোষণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে-
আল ফিকহুল আকবার
আল আকিদাতুত-তাহাবিয়া
আকাইদে নাসাফি
আকিদায়ে ওয়াসিতিয়া

এ ছাড়াও বিভিন্ন কিতাবে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

৩. ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিছক ইতিহাসের জ্ঞানের চেয়ে বেশি কিছু নয়। এটা কখনোই আকিদা-বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত নয়। ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য হলো অতীতকে সামনে রেখে শিক্ষা লাভ করা। অতীতের বিভিন্ন ঘটনা এজন্যই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

৪. যয়িফ (দুর্বল) ও কাজ্জাব (মিথ্যুক) বর্ণনাকারীরা সাহাবিদের ব্যাপারে যেসব ভ্রান্তিমূলক কথা উল্লেখ করেছে, তার বাস্তবতা উন্মোচন করার জন্য আমরা এখানে সেগুলো উল্লেখ করব। আলি রা. ও মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যে সংঘটিত বিবাদের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা কেবল নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করেছি। দুর্বল ও বানোয়াট রেওয়ায়েতগুলো প্রত্যাখ্যান করেছি। আকিদার গ্রন্থাদিতে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম যে অবস্থান তুলে ধরেছেন আমরা এতে তারই সমর্থন ব্যক্ত করেছি।

৫. সাহাবিদের ব্যাপারে জমহুর মুসলিম উম্মাহর আকিদা নিম্নরূপ :

- নবীদের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। এরপর হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। এরপর হজরত উসমান বিন আফফান রা.। এরপর হজরত আলি বিন আবু তালেব রা.।[১]
- যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু; তাই আমরা তাকে প্রথম খলিফা হিসেবে বিশ্বাস করি। এরপর হজরত উমর বিন খাত্তাব রা. কে, এরপর হজরত উসমান রা. কে, এরপর হজরত আলি বিন আবু তালেব রা. কে খলিফা বলে বিশ্বাস করি। তারা খোলাফায়ে রাশেদিন এবং হেদায়েতের ইমাম।
- আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা লালন করি। তাদের মধ্যে কারো প্রতি ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করি না। কারো ব্যাপারে দায়মুক্তির ঘোষণা দিই না। যারা সাহাবিদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং তাদের মন্দ বলে, আমরা তাদের ঘৃণা করি। আমরা কেবল সাহাবিদের ভালো আলোচনা করে থাকি। তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখাই দীন, ঈমান ও নেক কাজ, আর ঘৃণা পোষণ করা কুফরি, নেফাকি ও অবাধ্যতা।[২]
- যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেনি, তাদের চেয়ে সর্বনিম্ন স্তরের সাহাবিও উত্তম। তারা বহু আমলের অধিকারী হলেও সাহাবিদের সমতুল্য হতে পারে না। কেননা সাহাবিগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ লাভ করেছেন। তাকে স্বচক্ষে দেখেছেন। তার কথা শুনেছেন। তাই তারা তাবেয়িদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[৩]
- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত রাফেজিদের আকিদা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেননা তারা সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদেরকে মন্দ বলে।

  একইভাবে আমরা নাসেবিদের আকিদা থেকেও মুক্ত। কেননা তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে আহলে বাইতকে কষ্ট দেয়। আহলে সুন্নাত

---

[১] ইমাম আবু হানিফা কৃত আল ফিকহুল আকবার, ৪১ পৃষ্ঠা
[২] ইমাম আবু জাফর তাহাবি কৃত আকিদাতুত তাহাবিয়া, ৮১ পৃষ্ঠা
[৩] ইমাম আহমদ বিন হামবল কৃত উসুলুস সুন্নাহ

ওয়াল জামাআত 'মুশাজারাতে সাহাবা' তথা সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধের ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তারা বলেন, এ বিষয়ে যেসব বর্ণনায় তাদের মন্দাচার তুলে ধরা হয়েছে, তার কিছু তো নির্জলা মিথ্যা, আর কিছু বর্ণনায় হেরফের করা হয়েছে, প্রকৃত বিষয় বিকৃত করা হয়েছে। সহিহ রেওয়ায়েতে মুশাজারাত সংক্রান্ত যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে আমরা সাহাবিদেরকে মাজুর তথা অপারগ মনে করি। কিংবা আমরা এক্ষেত্রে তাদেরকে মুজতাহিদে মুসিব (চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে সঠিক পন্থা অবলম্বনকারী) কিংবা মুজতাহিদে মুখতি (প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সঠিক পথ হারিয়ে ফেলা ব্যক্তি) মনে করে থাকি।

এই আকিদা পোষণ করা সত্ত্বেও আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সাহাবায়ে কেরামকে কবিরা গুনাহ থেকে মাসুম মনে করি না; বরং তাদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর বিষয়। কিন্তু তাদের অসাধারণ গুণাবলি ও যোগ্যতা রয়েছে। যার ফলে তাদের থেকে সংঘটিত সব কিছু ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি পরবর্তীদের জন্য যা ক্ষমাযোগ্য নয়, সাহাবিদের জন্য সেগুলোও ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা তাদের নিকট এসব গুনাহ মোচনকারী নেক আমল ছিল। কিন্তু পরবর্তীদের নিকট তা নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলেছেন, তাদের যুগ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যুগ। অতএব, তাদের কোনো সদস্য এক মুদ পরিমাণ সদকা করা পরবর্তীদের পাহাড় পরিমাণ সদকার চেয়েও উত্তম।

কেউ যদি সম্পূর্ণ জেনে-বুঝে বিচক্ষণতার সাথে তাদের জীবন পর্যালোচনা করে, তাদের উপর প্রদত্ত আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও ফজিলতের প্রতি লক্ষ করে, তা হলে ভালোভাবেই বুঝতে পারবে, নবীদের পর তারাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কেউ তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি, পারবেও না। গোটা উম্মত থেকে তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। তারাই হলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন।[৪]

---

[৪] ইমাম ইবনে তাইমিয়া কৃত আল আকিদা আল ওয়াসিতিয়া, ১১৯, ১২০

- সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত মুশাজারাত ও যুদ্ধের যথোপযুক্ত বহু ব্যাখ্যা রয়েছে। সে কারণে তাদের দোষচর্চা করা যাবে না। তাদের প্রতি কোনো ধরনের দোষারোপ করা যাবে না। যদি অকাট্য দলিল-প্রমাণসমৃদ্ধ বিষয়ে তাদেরকে দোষারোপ করা হয়, তা হলে তা হবে কুফুরি। যেমন, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর উপর অপবাদ আরোপ করা। অন্যথায় এটা বিদআত বা ফিসক।[৫]

---

[৫] শরহে আকাইদ আন নাসাফি, ৩৭২, ৩৭৩

প্রাক্‌কথন

এ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, গত কয়েক দশক যাবৎ আমাদের ইতিহাস বদলে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বিশেষত প্রাচ্যবিদরা সাহাবায়ে কেরামকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানানোর জন্য মরণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর তাদের মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো। ব্যয় করছে কোটি কোটি টাকা। যেসব স্কলার এ লক্ষ্যে কাজ করছে, তাদেরকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের জন্য যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বোপরি তাদের গবেষণা প্রচার-প্রসারের জন্য ঢালা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ।

সাহাবায়ে কেরাম এবং ইসলামি ইতিহাসের মহান ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক শৈলীতে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ তৈরি করে বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরই পাশাপাশি গভীর পরিকল্পনা ও গবেষণামূলক পদ্ধতিতেও কাজ হচ্ছে। তাই দেখা যায়, প্রাচীন এবং নতুন লিখিত গ্রন্থাদির রেফারেন্স-সংবলিত কিতাবাদি একের পর এক বাজারে আসছে। বহু ভাষাতে তার অনুবাদও হচ্ছে। নেটে সার্চ করে দেখুন, এ সকল মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক তথ্য সরবরাহকারী বহু ওয়েবসাইটের তালিকা আপনার সামনে চলে আসবে। সাধারণ পাঠকশ্রেণি এসবের মাধ্যমে ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে জনৈক মুসলিম পাঠকের অনুভূতি উল্লেখ করছি, যা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর কাছে লিখেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, “ইসলামি ইতিহাসের প্রাচীন ভাণ্ডার এক অদ্ভুত বিস্ময়। ...কিন্তু আলেমসমাজ এদিকে মনোনিবেশ করেননি; অথচ তারা চাইলে কুরআন, হাদিস ও সালাফের বাণী সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমদের একটি বোর্ড গঠন করে ইতিহাসের বর্ণনাসমূহের ভিন্নতা ও বৈপরীত্যগুলো যাচাই করে দেখতে পারতেন। হয়তো এর দ্বারা কমপক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীরা ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের একটি স্বচ্ছ ধারণা পেত, যাতে প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম ও খাইরুল কুরুন তথা কল্যাণ-যুগের একটি সর্বসম্মত ও সুন্দর চিত্র উঠে আসতো।

তবে এখনো সময় ফুরিয়ে যায়নি। মুহতারাম, আপনি যদি এ বিষয়ে কিছু করতেন! অন্যথায় আগামী প্রজন্ম যখন দেখবে, একদিকে শুধু অন্যান্য ধর্মই নয়; বরং রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের ইতিহাস হচ্ছে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বসম্মত, অন্যদিকে গোটা ইসলামি ইতিহাসের পুরো ভাণ্ডারটি হচ্ছে মতভিন্নতা এবং মারামারি ও রক্তপাতে ভরপুর, তখন তারা ভীষণভাবে সন্দিহান হয়ে পড়বে। ফলে অতি সহজেই ইসলামবিদ্বেষী মিশনারিদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে যাবে এবং স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এবং তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদ্গার করতে শুরু করবে। নাউজুবিল্লাহ।"

মুফতি তাকি উসমানি তার উত্তরে লিখেছিলেন, কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামের ইতিহাসকে আপনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবে খুব যাচাই-বাছাই করে সংকলন করা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। কিন্তু আজ আমরা যে সময়টি পার করছি, তাতে কাজের কোনো শেষ নেই। কিন্তু লোকের প্রকট অভাব। একজনের পক্ষে আর কী কী করা সম্ভব... তবে চেষ্টা করব, আমার পরিচিত ও বন্ধুদেরকে এদিকে মনোযোগী করতে।[৬]

এই ব্যক্তি যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন বর্তমানে তা আরও প্রকট রূপ ধারণ করেছে। পূর্ববর্তী মনীষীদের ইলমি ধারা অনুযায়ী কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি ব্যতীত সঠিক পন্থায় এমন গবেষণামূলক কাজ আঞ্জাম দেওয়া এখন আরো জরুরি হয়ে পড়েছে।

এর জন্য আমি আমার আকাবির উসতাদ ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের বহুবার বলতে শুনেছি যে, বিশুদ্ধভাবে ইতিহাসের কাজ আঞ্জাম দেওয়া এখন মুসলিম উম্মাহর জন্য এক আবশ্যক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে যে ধরনের কাজ হওয়া উচিত ছিল এখনো তা হয়নি। পক্ষান্তরে গবেষণার নামে উলটো এখন কিছু স্বাধীনচেতা লোক ভিন্ন কাজ শুরু করেছে, যা কল্যাণ বয়ে আনার পরিবর্তে এক নতুন ফেতনার রূপ ধারণ করছে। আমাদের মনীষীগণ এটি বেশ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. অত্যন্ত দরদের সাথে লেখেন, ইহকালীন বা পরকালীন কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মহান মনীষীদেরকে লাগামহীন সমালোচনা ও পর্যালোচনার লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নেওয়াকে

---

[৬] ফাতাওয়ায়ে উসমানি, ১/১৮০

বর্তমানে ইলমি খেদমত ও গবেষক হওয়ার আলামত বলে মনে করা হচ্ছে। উম্মাহর মহান মনীষী এবং ইমামগণের বিরুদ্ধে বহু পূর্ব থেকেই এ ধরনের নির্যাতনের প্রশিক্ষণ চলছিল। কিন্তু এখন এটা বৃদ্ধি পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। নিজেকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে'র সদস্য দাবিদার এমন বহু লেখক সাহাবায়ে কেরামের মহান ব্যক্তিত্বকে রীতিমতো সমালোচনার লক্ষবস্তুতে পরিণত করাকে নিজেদের গবেষণা ও যোগ্যতা প্রকাশের মোক্ষম ক্ষেত্র মনে করেছে। একদল গবেষক হজরত মুয়াবিয়া রা. ও তার পুত্র ইয়াজিদকে সমর্থনের নামে হজরত আলি রা. ও তার সন্তানসন্ততি; বরং গোটা বনু হাশেমকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। আর তাতে সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও শ্রদ্ধা দূরের কথা, ইসলামের ন্যায়সঙ্গত ও বিজ্ঞোচিত সমালোচনার নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে লংঘন করা হয়েছে। অপরদিকে এদের বিপক্ষে কলম ধরে আরেক দল হজরত মুয়াবিয়া, উসমান গনি রা. এবং তাদের সাথি-সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ঠিক একইভাবে সমালোচনার তির বর্ষণ করেছে।

এসবের ফলে কুরআন-হাদিস এবং ইলমি আদবের ব্যাপারে অনবহিত এবং ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত আধুনিক সভ্যতার অন্ধভক্ত আধুনিক শিক্ষিত সমাজ উক্ত উভয় শ্রেণির সমালোচকদের সমালোচনা এবং রচনার মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছে। তারা সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।[৭]

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িমূলক তাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের মোকাবেলায় আলেমগণ সাহাবিদের ব্যাপারে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস তুলে ধরেছেন। তারা রাফেজি এবং নাসেবিদের খণ্ডন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের উপর তারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা কোনো ধরনের ক্রটি করেননি।

এই সকল খেদমত এবং অবদান সত্ত্বেও সাহাবিগণের ইতিহাস থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ এবং গবেষণামূলক ইতিহাসের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার প্রয়োজন এখনো বাকি রয়েছে। এজন্য আকাবির আসলাফের রীতি-পদ্ধতিতে তাদের বাতলানো মূলনীতি অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহর

---

[৭] মাকামে সাহাবা, ৯, ১০

সামনে সাহাবায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস উপস্থাপন করা আমরা জরুরি মনে করছি। পাঠকদের নিকট দোয়া চাই, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করেন।

***

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি যে, একসময় গোটা দুনিয়া কুফর-শিরকের অন্ধকারে ডুবে ছিল। এর মধ্যেই এক সময় ইসলামের আলো জ্বলে ওঠে, যা মূর্খতার অন্ধকার বিদূরিত করে দেয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ প্রতিকূল পরিবেশে ইসলামের দাওয়াতের সূচনা করেছেন। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ তার পাশে জমা হয়ে যান। তার অনুসরণ করেন। তাকে একসময় মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়। মদিনার আনসারগণ তাকে মহামান্য আমির ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করে নেন।

এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম মদিনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দাওয়াতের পাশাপাশি জিহাদ চলতে শুরু করে। মাত্র দশ বছরের মধ্যেই যা গোটা আরববিশ্বে তাওহিদের বাণী উচ্চকিত করে তোলে। মক্কা বিজয় হয়। লাত-হুবলদের ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা হয়। মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মুসলিমরা আরব উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে পারস্য এবং রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে টক্কর দেন। তারা শত শত বছর ধরে চলে আসা জুলুম-নির্যাতনে নিষ্পেষিত মানুষকে মুক্তি দেন। তাদেরকে প্রকৃত মাবুদের সামনে মাথানত করার স্বাধীনতা প্রদান করেন। এভাবে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে ঈমান ও রুহানিয়াতে পরিপূর্ণ এক পবিত্র সমাজ ও সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির গর্বের স্থান দখল করে থাকবে।

ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

***

এখন মূল কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হচ্ছে। এতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টি (অনুবাদের চতুর্থ খণ্ড এবং পঞ্চম খণ্ডের একটি বড় অংশ) সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত মুশাজারাতের বর্ণনা সম্বলিত। এতে বলা

হয়েছে, মুসলমানদের লাগাতার বিজয়ের পর কীভাবে এক পরিবর্তন ধারা শুরু হয়ে যায়। মুসলিমবিশ্বে কীভাবে পশ্চাদপদতা তৈরি হয়? কীভাবে তাদের মধ্যে ভেতরগত ফেতনা সৃষ্টি হয়?

এটা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সংঘটিত প্রথম ফেতনার যুগ। ৩৪ হিজরি থেকে নিয়ে ৪০ হিজরি পর্যন্ত প্রায় পৌনে সাত বছর তা স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় ৩৪ হিজরিতে তা সূচনা লাভ করেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু পূর্বেই তার শেকড় গজিয়ে উঠেছিল। এই ফেতনার ফলে হজরত উসমান বিন আফফান রা. শাহাদাত বরণ করেন। হজরত আলি রা. এর শাসনামলে এ ফেতনা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ সময়ই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা জঙ্গে জামাল এবং জঙ্গে সিফফিন সংঘটিত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদী সর্বপ্রথম একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করে।

এ বিবাদে তিনটি দল তৈরি হয়েছিল। একটি হজরত আলি রা. এর। দ্বিতীয়টি তার বিরোধীপক্ষের। এ ছাড়াও একটি দল ছিল, যারা পর্দার আড়াল থেকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে যাচ্ছিল।

এটা ছিল হাঙ্গামাকালীন সময়। তখন প্রকৃত সংবাদের পরিবর্তে গুজবের ছড়াছড়ি ছিল। সাধারণত শত্রুরাই এগুলো ছড়িয়ে দিত। ফলে এ সময় সংঘটিত ঘটনাবলির ব্যাপারে গুজব ও মিথ্যা বর্ণনা প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে এজাতীয় কিছু বিষয় ইতিহাসে স্থান লাভ করে। যার কিছু কিছুতে সাহাবিদের মধ্যকার মনোমালিন্য এবং বিবাদের অবাস্তব ও বিকৃত রূপ তুলে ধরা হয়েছে।

তাই এ সময়ে সংঘটিত বিষয়াবলির প্রতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করা জরুরি। আসমাউর রিজালের (বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত শাস্ত্র) মাধ্যমে সন্দেহপূর্ণ বর্ণনাগুলো যাচাই-বাছাই করা জরুরি। আলহামদু লিল্লাহ আমরা এ পথে হেঁটেছি। এভাবে যাচাই-বাছাই করে ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বইটির কলেবর বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। সহিহ বর্ণনা অনুসন্ধান করা, দুর্বল বর্ণনা যাচাই-বাছাই করা, বর্ণনাকারীদের অবস্থান যাচাই করা, শাস্ত্রীয় শর্তানুযায়ী অগ্রসর হওয়ার ফলে এর কোনো বিকল্প ছিল না।

***

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অনুবাদের পঞ্চম খণ্ডের বাকি অংশ) খেলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এরপর সাধারণ শাসনের সূচনাকাল এতে স্থান পেয়েছে। হজরত আলি রা. এর শাহাদাত বরণের পর হজরত হাসান রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে শান্তি, নিরাপত্তা ও বিজয়কাল শুরু হয়, যা বিশ বছর পর্যন্ত চলমান থাকে। এই অধ্যায়ে বিশ বছরের ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়। এ সময় যারা ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়েছিল তারা হজরত মুয়াবিয়া রা. কে বিদ্বেষমূলক প্রোপাগান্ডার লক্ষবস্তু বানিয়েছে। তারা মুয়াবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে বহু বানোয়াট বর্ণনা ছড়িয়ে দিয়েছে। একসময় তা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরা, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনকালকে সহিহ বর্ণনার আলোকে ফুটিয়ে তোলা এবং ভুল বর্ণনাগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করা ঈমানি এবং ইলমি দায়িত্ব মনে করি। তাই মাত্র বিশ বছরের আলোচনা করতে গিয়ে কলেবর কিছুটা বড় হয়ে গেছে। এটা অধ্যয়ন করে ইনশাআল্লাহ আমরা ঈমানের নতুন এক সজীবতা অনুভব করতে পারব।

***

তৃতীয় অধ্যায়টি (অনুবাদের ষষ্ঠ খণ্ডের একটি বড় অংশ) ইয়াজিদের শাসনামলের শুরু থেকে নিয়ে হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর শাহাদাতকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ষাট হিজরি থেকে নিয়ে তেহাত্তর হিজরি পর্যন্ত এই সময়ে কারবালা, হাররা, মক্কা ও মদিনায় উমাইয়া সৈন্যদের অভিযান পরিচালনাসহ আরো কিছু স্পর্শকাতর আলোচনা স্থান পেয়েছে। ঘটনাগুলো সম্পর্কে বহু দুর্বল এবং মনগড়া বর্ণনা রয়েছে। এসবের মধ্য থেকে সহিহ বর্ণনাগুলো নির্বাচন করা এবং বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

***

চতুর্থ অধ্যায়ে (অনুবাদের ষষ্ঠ খণ্ডের বাকি অংশ) কিছু মহান ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে। যারা হিজরি প্রথম শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর ইলম, ঈমান এবং আখলাক-চরিত্র গঠনে মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

***

পঞ্চম অধ্যায়ের (অনুবাদের সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড) শিরোনাম হলো 'সংশয় নিরসন'। সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত মুশাজারাত বিষয়ে সাধারণ মানুষের

মনে অসংখ্য প্রশ্ন ও আপত্তি তৈরি হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সঠিক অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত সন্দেহ ও আপত্তি নিরসন করাটা আবশ্যক ছিল। ইতোপূর্বে আলোচনা করার সময় মূল আলোচনা এবং টীকাতে এ দিকে লক্ষ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই প্রয়োজন মেটানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে।

****

রিজালশাস্ত্র এবং জরাহ-তাদিলের উপর ভিত্তি করেই আমরা এই আলোচনা করেছি। যারা রিজালশাস্ত্রকে সন্দেহপূর্ণ মনে করে তাদের জন্য এই হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রয়াস। আমরা রিজালশাস্ত্রের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে যদিও ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইজলি, ইমাম উকাইলি, মুহাম্মদ বিন সা'দ, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হিব্বান, ইমাম ইবনুল জাওযি, ইবনে আদি, ইমাম মিযযি রহিমাহুল্লাহর মতো প্রথমসারির বিচারকদের মাধ্যমে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেছি। তবু আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাফেজ জাহাবি এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর মতের উপর নির্ভর করেছি। তারা পূর্ববর্তী মনীষীদের মতগুলো ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি এর সারনির্যাস তুলে ধরেছেন। কোনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে মতভিন্নতা তৈরি হয়ে গেলে সকল বিশেষজ্ঞ এই দুই মহান গবেষকের গবেষণার উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে থাকেন।

মুশাজারাতের মূলনীতি সংক্রান্ত অন্যান্য কিতাবের পাশাপাশি বিশেষভাবে ইবনে হাজার রহ. এর 'নুখবাতুল ফিকার', ইমাম সুয়ুতির 'তাদরিবুর রাবি', মাওলানা আবদুল হাই লৌখনবির 'আর-রাফউ ওয়াত তাকমিল', মাওলানা যফর আহমদ উসমানির 'কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস' বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছে।

ইতিহাসের বিশেষ কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দমা' এবং ইমাম সাখাবির 'আল-ইলান বিত তাওবিখ', আল্লাহ কাফিজির পুস্তিকা 'আল মুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ' থেকে অধিক পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতিহাসের ঘটনাবলির উৎস নির্ধারণে আমরা প্রথমে হাদিসের গ্রন্থাদি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ইতিহাসের গ্রন্থাদি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। হাদিসের ভাণ্ডারের মধ্যে আমরা সিহাহ সিত্তা, ইমাম মালেক রহ. এর মুওয়াত্তা,

ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবার মুসান্নাফ, মুসনাদে আহমদ ইবনে হামবল, মুসতাদরাকে হাকেম, ইমাম আবদুর রাজ্জাক বিন হুমামের মুসান্নাফ-সহ হাতের নাগালে থাকা সকল উৎসগ্রন্থ থেকে যথাসম্ভব সাহায্য গ্রহণ করেছি।

তেমনিভাবে আমরা সাধ্যানুযায়ী ইতিহাসের সকল প্রাচীন উৎসগ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি। ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথমে খলিফা বিন খাইয়াত, মুহাম্মদ বিন সা'দ, ইবনে জারির তাবারি, ইবনে আবি খাইসামা রহিমাহুমুল্লাহর মতো পূর্ববর্তী মনীষীদের বর্ণনার উপর নির্ভর করেছি। তারা ইতিহাসবেত্তা হওয়ার পাশাপাশি রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। এরপর আল্লামা বালাজুরি, আল্লামা ইবনুল জাওযি, আল্লামা ইবনে আবদিল বার, ইবনুল আসির জাযারি, হাফেজ জাহাবি, হাফেজ ইবনে কাসির, আল্লামা ইবনে খালদুন এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহিমাহুমুল্লাহর কিতাবাদি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। স্পর্শকাতর বিষয়াদির ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূল বিষয় এবং তার বর্ণনা-সূত্র যাচাই-বাছায়ের প্রতি পূর্ণ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্ণনার বিশুদ্ধতা এবং দুর্বলতার ব্যাপারে কিছু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ড. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ গিব্বান সুবহি প্রণীত 'ফেতনায়ে মাকতালে উসমান' অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ ছাড়াও ড. মুহাম্মদ বিন তাহের আল বারযানজি এবং ড. মুহাম্মদ সুবহি হাসান হাল্লাক কৃত 'সহিহ তারিখে তাবারি' থেকে অধিক সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। তারিখে তাবারির বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির উপর নির্ভর করা হয়েছে। তেমনিভাবে হাদিসের সনদগত বিষয়ে শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানি, ডক্টর শুয়াইব আল আরনাউত, ড. আহমদ মুহাম্মদ শাকেরের গবেষণামূলক কাজগুলো সামনে রাখা হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু স্থানে তাদের সাথে মতবিরোধের সুযোগ আছে বলে মনে হয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হজরত উসমান গনি রা. এর শাহাদাত থেকে নিয়ে হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর শাহাদাত পর্যন্ত অবস্থার প্রতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ সময়কালে সাহাবিদের মধ্যে মুশাজারাত এবং আমাদের মুসলিম ইতিহাসের কিছু স্পর্শকাতর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনার ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বহু চিন্তাধারাও গড়ে

উঠেছে। এসব চিন্তাধারা থেকে দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. লেখেন, গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় জানা, তাদের মধ্যকার স্তর এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত পারস্পরিক মতভিন্নতার মধ্যে সিদ্ধান্ত করাটা ইতিহাসের সাধারণ কোনো কাজ নয়। বরং সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি হাদিসশাস্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইবনে হাজার রহ. 'আল ইসাবাহ'র ভূমিকায়, ইবনে আবদিল বার রহ. 'আল-ইসতিয়াবে'র ভূমিকায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সাহাবিদের মর্যাদা, তাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্তর এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত মতবিরোধের সিদ্ধান্তকে আলেমগণ আকিদার বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামের সকল আকিদার গ্রন্থাবলিতে এটাকে এক স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়টি যেহেতু ইসলামি আকিদার অংশ এবং এর ভিত্তিতে ইসলামি দল এবং ফেরকা তৈরি হয়েছে এজন্য এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের মতো শরয়ি দলিল-প্রমাণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে কোনো বর্ণনার মাধ্যমে দলিল পেশ করতে চাইলে তাকে মুহাদ্দিসদের উদ্ভাবিত জরাহ-তাদিলের মূলনীতির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে সেটা তালাশ করা এবং তার উপর নির্ভর করা একটি মৌলিক ভুল; সেই ইতিহাসগ্রন্থের লেখক যত বড় বিশ্বস্ত ব্যক্তিই হোন না কেন, কিংবা তা যত বড় নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসই লেখুন না কেন, তবু যাচাই-বাছাই ছাড়া শুধু তার লিখিত গ্রন্থে তালাশ করে তার উপর নির্ভর করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা এটা ইতিহাসশাস্ত্র। সঠিক এবং ভুল যাবতীয় বর্ণনা একত্র করাই এই শাস্ত্রের রীতি।[৮]

যেহেতু ইতিহাস থেকে যাচাই-বাছাই করে সঠিক বিষয় উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য, তাই আমি ইতিহাসের রেওয়ায়েতগুলোর অন্ধ অনুসরণ করিনি। মুহাদ্দিসদের জরাহ-তাদিলসংক্রান্ত মূলনীতির ভিত্তিতে হাজার হাজার বর্ণনা যাচাই-বাছাই করেছি। বর্ণনাকারীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করেছি। এক্ষেত্রে আমি সামান্যও ত্রুটি করিনি। আলহামদুলিল্লাহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য এবং তার অনুগ্রহ লাভ করেছি। তার তাওফিকের মাধ্যমে ইলম ও চিন্তার এক বসন্তের মাধ্যমে আমি এই

---

[৮] মাকামে সাহাবা, পৃষ্ঠা ২৯

মরুভূমি অতিক্রম করেছি। (কোনো কবি বলেছেন) 'পা তো চলেনি বরং তাকে চালানো হয়েছে।'

নিকট অতীতের কিছু গবেষক সাহাবিদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার জবাবে মুসলিম ইতিহাসের শুরু যুগের উপর গবেষণামূলক কিছু কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সাহাবিগণের বিরুদ্ধে চালানো প্রোপাগান্ডার জবাব দেওয়া আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কিন্তু ওই ক্ষেত্রে তাদের এবং আমাদের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাদের অবলম্বনকৃত পদ্ধতি উম্মাহকে পূর্ববর্তী মনীষীদের পথ থেকে বিচ্যুত করে হাদিস অস্বীকারের পথে নিয়ে যায়। তাদের গৃহীত পদ্ধতির সারনির্যাস চারটি পয়েন্টে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. কোনো বর্ণনা—হোক তা সনদগতভাবে সহিহ বা যয়িফ কিংবা সেটা থাক ইতিহাস কিংবা হাদিসের গ্রন্থাদিতে, যদি তার প্রতি আমাদের মনে কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় তৈরি হয় তা হলে সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে।

২. এইজাতীয় বর্ণনা উদ্ধৃতিকারী ঐতিহাসিক এবং মুহাদ্দিসদেরকে কোনো ভ্রান্ত দলের এজেন্ট মনে করা হবে।

৩. আমাদের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল হলে আসমাউর রিজালের মনীষীদের নিতান্ত দুর্বল মতকেও গ্রহণযোগ্য মনে করা হবে। এর বিপরীত হলে বিশেষজ্ঞদের বিশাল অংশের মতও প্রত্যাখ্যান করা হবে।

৪. মুসলিম উম্মাহর আলেমদের সর্বসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকে চূড়ান্ত জ্ঞান করা হবে না। নিজেদের নতুন গবেষণাকে চূড়ান্ত মনে করা হবে।

বলাবাহুল্য এই পদ্ধতির আগাগোড়া পুরোই দলান্ধতার উপর ভিত্তিশীল। পক্ষান্তরে জমহুর আলেম এবং আকাবির-আসলাফের রীতি-পদ্ধতিই সঠিক। তাদের গৃহীত পন্থার মূলনীতি চারটি।

১. যেসকল মনীষীর আমানত দিয়ানত এবং তাদের ইলমি অবস্থান ব্যাপকভাবে সকলেই মেনে থাকে এবং জমহুর আলেম যাদের কিতাবাদি দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন, তাদেরকে সঠিক আকিদার অধিকারী, বিশ্বস্ত, আমানতদার এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামী মনে করা হবে।

২. আমাদের মনীষীগণ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নন। তাদের থেকে ইলমি ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেতে পারে। তাই তাদের সঙ্গে মতভিন্নতার সুযোগ

রয়েছে। কোনো গ্রন্থ এবং রচনায় তাদের গৃহীত ও নির্ধারিত নীতিমালার উপর আপত্তি তোলার সুযোগ রয়েছে। তাদের বর্ণনা, উপস্থাপিত দলিল বা গবেষণাকে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। কিন্তু তাদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা কিংবা তাদেরকে কোনো ভ্রান্ত দলের এজেন্ট মনে করা জঘন্য বাড়াবাড়ি।

৩. প্রথম শতাব্দী থেকেই যে বিষয়ের উপর জমহুর আলেম একমত পোষণ করে আসছেন এবং এগুলোর উপর ঐকমত্য চলে আসছে সেসব বিষয়ে মতভিন্নতার কোনো সুযোগ নেই। গবেষণার নামে এই ধরনের মতভিন্নতা পোষণ করা সবসময় নতুন কোনো ফেরকা ও দল তৈরির ভিত্তিমূল হয়ে থাকে।

৪. কোনো বর্ণনা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি এবং ইতিহাসের যাবতীয় দিক সামনে রাখতে হবে। নিছক সন্দেহ বা আপত্তিকর মনে হওয়া কোনো বর্ণনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট নয় (যদি এটাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তা হলে বহু সহিহ, মারফু হাদিস প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। কেননা আমাদের জ্ঞান এবং বোধগম্যতার স্বল্পতার কারণে সেখানে সন্দেহ তৈরি হতে পারে)।

ইতিহাসের মূলনীতি সংক্রান্ত আলোচনা এবং এরপর ইতিহাসের বর্ণনা যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের পথচলা ইনশাআল্লাহ উল্লিখিত চারটি পয়েন্টেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

আমাদের (মূল বইয়ের) দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শুরু হয়েছিল ২০১২ সনে। বিভিন্ন সময় ধীরে ধীরে এ কাজ চলমান ছিল। অবশেষে পাঁচ বছর পর ২০১৭ সালের শেষদিকে তা পূর্ণতা পেয়েছে।

এর মধ্যে আমার আকাবির, আসাতিজা এবং আলেম বন্ধুদের সাথে সবসময় পরামর্শের ধারা অব্যাহত ছিল। এসময়ে আল্লাহর রহমতে বাইতুল্লাহ জিয়ারতের তাওফিক হয়েছে। সেখানে এ কাজটির পূর্ণতা এবং মাকবুলিয়াতের জন্য মন ভরে দোয়া করেছি। মক্কা শরিফে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব, জামিয়াতুর রশিদ করাচির প্রিন্সিপাল মুফতি আবদুর রহিম হাফিজাহুল্লাহ থেকে ইতিহাস যাচাই-বাছাইয়ের রীতি-পদ্ধতি এবং মূলনীতি বিষয়ে বহুভাবে উপকৃত হয়েছি। জামিয়াতুর রশিদ করাচির

দারুল ইফতার প্রধান মুফতি মুহাম্মদ যারিন এই কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। রেওয়ায়েত-সংক্রান্ত মূলনীতি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত উপকারী উৎসগ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি আমাকে সাহস যুগিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এ সকল মনীষীর ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী করুন।

দৈনিক 'ইসলামে'র সাবেক কর্মকর্তা এবং আমার বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ আশেক এলাহির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কষ্ট করে (মূল বইয়ের) প্রথম খণ্ড পুরোটা এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ কম্পোজ করেছেন। ইদারায়ে উলুমুল কুরআনের সম্মানিত উসতাদ জনাব আহমাদ মাহমুদ খুব অল্প সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কম্পোজ করে দিয়েছেন। মুফতি আবদুল খালেক গ্রন্থটির নজরে সানির ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টির প্রমাণ রেখেছেন। আমি অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আল মানহালের পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আলতাফ মাইমান, ভাই হামেদ আলি খোখর এবং 'ইদারাতুন নুরে'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মুহাম্মদ আলি ভাইয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতার ফলে কাজটি আত্মপ্রকাশ করছে। এই কল্যাণ-কাজের সাথে যারাই কোনোধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে শামিল হয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

প্রথম খণ্ডের শুরুতে আমি 'ইলমে তারিখ' তথা ইতিহাসের পরিচয়ের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এই খণ্ডে রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাই এবং বিশুদ্ধতার পদ্ধতি বোঝার জন্য একটি প্রবন্ধ পেশ করছি। এতে সেসব মূলনীতির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা হয়েছে, যা আমাদের সামনের ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভিত্তিমূল হিসাবে অনুসৃত হয়েছে।

ইসমাইল রেহান
১৯ জুমাদাল উলা, ১৪৩৯
৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

জ্ঞাতব্য

১. পাঠক যাতে হাতের নাগালে থাকা সহজলভ্য যেকোনো উৎস দেখে নিতে পারেন এজন্য বহু স্থানে একাধিক বা তার চেয়েও বেশি কিতাবের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু কিছু স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী বহু রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশ বহু কিতাবে বিক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান রয়েছে, এজন্য কোনো একটি রেফারেন্স তালাশ করে ঘটনাটি সম্পূর্ণ না পেলে অন্যান্য রেফারেন্স দেখে নিতে হবে।

২. রেফারেন্সের ক্ষেত্রে অধিক প্রচলিত এবং নতুন তাহকিকসমৃদ্ধ কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিতাবের শেষে গ্রন্থপঞ্জি নামে একটি শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আমাদের রেফারেন্সের গ্রন্থাদির প্রকাশনীর নাম উল্লেখ রয়েছে। পাঠক সেসব প্রকাশনীর গ্রন্থ তালাশ করলে ইনশাআল্লাহ অতি দ্রুত পেয়ে যাবেন। কিন্তু কোনো কোনো সময় একই প্রকাশনীর কোনো কিতাবে নতুন সংস্করণে ২-৪ পৃষ্ঠা কমবেশ হয়ে থাকে, এজন্য রেফারেন্সে উল্লিখিত পৃষ্ঠায় না পেলে ২-৪ পৃষ্ঠা পূর্বে বা পরে তালাশ করতে হবে।

৩. যদি কপি ভিন্নতার কারণে রেফারেন্সে উল্লেখিত খণ্ড ও পৃষ্ঠায় কোনো ঘটনা না পাওয়া যায়, তা হলে অধিকাংশ ইতিহাসের গ্রন্থে হিজরি সনের অধীনে সেটাকে খুঁজে দেখা যেতে পারে। কিংবা শাসন এবং শাসকদের অধীনেও তালাশ করা যেতে পারে। তাহলে ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে।

‘তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ’র স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান ‘আল মানহাল পাবলিশার্স’-এর পক্ষ থেকে মাকতাবাতুল ইত্তিহাদকে প্রদত্ত বাংলা অনুবাদ প্রকাশের

অনুমতিপত্র
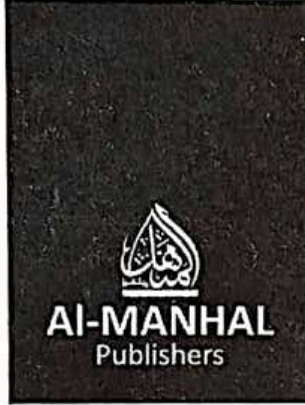
92 321 2855000
92 321 3135009
92 213 4914596

St# 4 & 5, Block: 1/A,
Near Shaikh Zaid Islamic Centre,
Gulistan-e-Juhar, Karachi, Pakistan.

www.almanhalpublisher.com
admin@almanhalpublisher.com
web.facebook.com/almanhal.publisher
@almanhalpublish

Ref: AMP-107

Date: 10-Feb-2021

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh.

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, "Tareekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 151375926893) will take strict legal action.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعتِ کتاب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بنام: مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ بازار، ڈھاکہ، بنگلادیش

ہم مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ دیش کو اپنی مشہور ومعروف کتاب بنام "تاریخ امت مسلمہ (چار جلدیں)" مؤلف حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب مدظلہٗ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

نیز مکتبۃ الاتحاد کے سوا کسی اور شخص / ادارے کو مذکورہ کتاب کے مواد کی نقل یا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بصورتِ دیگر مکتبۃ الاتحاد کو مجوزہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے۔

والسلام

المنہل پبلشرز

کراچی، پاکستان

Al Manhal Publisher
Block 1-A, Gulistan-e-Juhar, Karachi
021-34612901 | 0321-3135009

حامد علی کھوکھر

جنرل منیجر

المنہل پبلشرز، کراچی

সূচিপত্র

ইতিহাস অধ্যয়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের মূলনীতি

খেলাফতে রাশেদার
পারস্পরিক মতানৈক্য ও মতবিরোধের যুগ

হজরত আলি রা. এর খেলাফতকাল

ইতিহাস অধ্যয়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের মূলনীতি

সন্দেহপূর্ণ বর্ণনার বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কী কী মূলনীতি অনুসরণ করা হবে?

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রচনাশৈলীর একটি সমীক্ষা

কেউ কেউ অভিযোগ করে যে, ইতিহাসের কিতাবাদি অধ্যয়নের সময় মাঝেমধ্যে মনে হয়, সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র বোধহয় ভালো ছিল না! মনে হয়, তারা ছিলেন স্বার্থলিপ্সু! নাউজুবিল্লাহ। আর এমন মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার পর হয়তো সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে, নয়তো ইতিহাসের গ্রন্থাদির ব্যাপারে মানুষ বিরূপ ধারণার শিকার হবে।

এর কিছু মৌলিক কারণ রয়েছে। সামনে কিছু কারণ উল্লেখ করছি। প্রকৃতপক্ষে চারটি কারণে এই ভুল ধারণা তৈরি হয়ে থাকে।

১. আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঈমানি দুর্বলতার কারণে এমন ধারণা তৈরি হয়। বর্তমানে এ ব্যাধি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। একটি ঘটনা আপন জায়গায় সম্পূর্ণ ঠিক আছে, কিন্তু মানুষ ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে। ফলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্ধ গ্লাস পানির প্রতি লক্ষ করা হলে মানুষ বলবে, আলহামদুলিল্লাহ, অর্ধ গ্লাস পানি পাওয়া গেল। কিন্তু নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে বলা হবে, আফসোস, গ্লাসের অর্ধেক খালি পড়ে আছে।

২. ঘটনাগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা না রাখা। আকায়েদ, কালামশাস্ত্র, ফিকহ, হাদিস এবং হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থের উপর যাদের গভীর এবং বিস্তৃত অধ্যয়ন রয়েছে কেবল তারাই সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারে। কেননা ঘটনার অন্য দিকের দ্ব্যর্থতা নিরসনকারী বিক্ষিপ্ত বর্ণনাসমূহের প্রতিও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে সাধারণ পাঠকের অধ্যয়ন এতো বিস্তৃত হয় না। ফলে তারা সন্দেহ উদ্রেককারী এসব বর্ণনার সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৩. ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থাদির কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি। এজন্য এসব গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে কোনো আপত্তি তৈরি হলে তা নিরসন করা মুশকিল হয়ে যায়। হাদিসের গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলেও বিভিন্ন আপত্তি তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে,

যা অধ্যয়নের ফলে ওই সকল আপত্তি নিরসন হয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটি হয় না।

৪. ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে নিরেট দুর্বল ও সন্দেহপূর্ণ বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে, যা যাচাই-বাছাইয়ের দাবি রাখে। হজরত উসমান গনি রা. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হওয়ার পর মুনাফিক শ্রেণির লোকেরা বানোয়াট বিষয় ছড়িয়ে দেয়। যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মুশাজারাতে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবির ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। এইসব সংবাদ মুখে মুখে বর্ণিত হতে থাকে। বর্ণনাকারী প্রতিপক্ষের ব্যাপারে কঠোর মনোভাবাপন্ন হলে এটাকে সাওয়াবের কাজ মনে করে এতে অংশগ্রহণ করেছেন। যেহেতু তখন সবধরনের বর্ণনাই সংকলিত হচ্ছিল এজন্য এজাতীয় দুর্বল, সন্দেহপূর্ণ এবং বানোয়াট বর্ণনাও এতে শামিল হয়ে যায়। মনীষীদের খেদমত মনে করে পূর্ণ আমানতের সাথে ঐতিহাসিকগণ এগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করে দিয়েছেন।

যদিও দুর্বল বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কোনো আকিদা তৈরি না করার মূলনীতি রয়েছে; কিন্তু এ মূলনীতি উপেক্ষা করে কিছু লোক দুর্বল বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই রাফেজি ও নাসেবি মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। অথচ অধিকাংশ আলেম এসব দুর্বল বর্ণনা উদ্ধৃত করার সুযোগ দেওয়ার পরও এর মাধ্যমে আদালতে সাহাবার পরিপন্থি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের বৈধতা প্রদান করেননি।

হাদিসশাস্ত্র এবং ইতিহাসের মধ্যকার পার্থক্য

আলেমগণ অবগত আছেন যে, মিথ্যুক বর্ণনাকারীরা হাদিসশাস্ত্রেও এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। তারা বহু মনগড়া বর্ণনা মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু হাদিসশাস্ত্রের ইমামগণ বছরের পর বছর কষ্ট-মেহনত করে দুধকে দুধের স্থানে এবং পানিকে পানির জায়গায় রেখে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের যাচাই-বাছাই করা হয়নি। সেখানে এমন সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। বরং আলেমগণ এসব দুর্বল বর্ণনা উদ্ধৃত করার সুযোগ প্রদান করেছেন। তবে এগুলো থেকে আকিদা বা শরিয়তের হুকুম বের করার এবং এগুলো দ্বারা তারা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের বৈধতা প্রদান

করেননি। তারা এসব বর্ণনার দুর্বলতা বা দুর্বলতার স্তর চিহ্নিত করার প্রয়োজন অনুভব করেননি।[১]

তা সত্ত্বেও জরাহ-তাদিলের ইমামগণ রিজালশাস্ত্রের যে বিশাল ভাণ্ডার তৈরি করে দিয়েছেন এবং উসুলবিদগণ বর্ণনার যে স্তর নির্ধারণের মূলনীতি উল্লেখ করে গিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে এখনো ঐতিহাসিক বর্ণনার সহিহ, হাসান, মুনকার ও বানোয়াট বর্ণনাগুলোকে চেনা যেতে পারে। প্রাচীন ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান প্রতিটি বর্ণনার সনদ (সূত্র) দেখে আজও সেগুলো যাচাই-বাছাই করা যেতে পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, সাহাবিদের অবস্থা এবং ইতিহাসের উপর লিখিত কিতাবের অধিকাংশ বর্ণনা দুর্বল রাবিদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, যারা তখন ঐতিহাসিক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

উদাহরণত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত সিরাতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক, সিরাতে ইবনে হিশাম, ওয়াকিদির 'ফুতুহুশ শাম', বালাজুরির 'ফুতুহুল বুলদান', মুহাম্মদ বিন সা'দের 'তাবাকাতুল কুবরা', বালাজুরির 'আনসাবুল আশরাফ' নেওয়া হলে দেখা যাবে অধিকাংশের উৎস সনদগতভাবে যয়িফ। সহিহ, হাসান, আপত্তিকর, পরিত্যাজ্য সবধরনের বর্ণনাই তাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আলেমগণ এগুলোর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন।

এরপর ইমাম তাবারির মতো ফকিহের 'তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক', ইবনে হিব্বানের মতো বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাইকারীর 'সিরাতুন নবী', আল্লামা ইবনুল জাওযির মতো মুহাদ্দিসের 'আল মুসতাযাম', ইবনুল আসির জাযারির মতো বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ঐতিহাসিকের 'আল কামিল', জরাহ-তাদিলশাস্ত্রের ইমাম হাফেজ জাহাবির 'তারিখুল ইসলাম', হাফেজ ইবনে কাসিরের মতো গবেষকের 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'র প্রতি দৃষ্টিপাত করা হলে দেখা যাবে এতে উল্লিখিত অধিকাংশ ঐতিহাসিক-বর্ণনাই সনদগতভাবে দুর্বল।

পূর্ববর্তী আলেমগণ সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের মতো বিশুদ্ধ সনদনির্ভর ইতিহাসগ্রন্থ কেন লিপিবদ্ধ করলেন না?

---

[১] তাদরিবুর রাবি, ১/৩৫০

এখন এই প্রশ্ন তৈরি হবে যে, অতীতের বড় বড় আলেমগণ কেন সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিমের মতো বিশুদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করলেন না?

এর উত্তর হলো, ইতিহাস আসলে নিত্যদিনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সন্নিবেশের নাম। এজন্য কোনো নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত সূত্রের উপর নির্ভর করলে অধিকাংশ সময় এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।

শুধু একটি মাত্র দিনের সংবাদ একমাত্র সহিহ এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়াই মুশকিল বিষয়। কদাচিৎ দুয়েকটি ক্ষেত্রে আপনার কাঙ্ক্ষিত সংবাদটির বর্ণনাকারীরা সকলে সৎ, বুদ্ধিমান, আমানতদার এবং নির্ভরযোগ্য হতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সবসময় এ ধরনের বর্ণনাকারী পাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসংবলিত মাত্র চার পৃষ্ঠার কোনো দৈনিক পত্রিকা যদি বের করতে চান তা হলে অবশ্যই আপনাকে বর্ণনাকারী তথা রিপোর্টার এবং সংবাদ মাধ্যমে শিথিলতার সুযোগ রাখতে হবে। আপনি যদি রিপোর্টের জন্য গুনাহ, পাপাচার ও ফাসেকি থেকে মুক্ত হওয়া, শরিয়তের পাবন্দ হওয়া, কোনো মাদরাসা থেকে ডিগ্রি অর্জন করা, কোনো খানকার সঙ্গে সম্পৃক্ততা কিংবা কমপক্ষে তাবলিগে তিন চিল্লার শর্তারোপ করেন তা হলে মাদরাসার মাহফিল, ইসলাহি বয়ান এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জানাজার নামাজের মতো হাতেগোনা কিছু সংবাদ ব্যতীত ভিন্ন কিছু আপনার হাতে আসবে না।

খবর যে পরিবেশের হয়ে থাকে তার চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণ সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠা সাধারণ মানুষই হয়ে থাকে। এটাই স্বাভাবিক বিষয়। মসজিদ, মাদরাসা ও খানকা, আলেম, সালেহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিসের মজলিসে নেককার লোকদের অধিক সমাগম হয়ে থাকে। এই অঙ্গনের সংবাদসমূহের বর্ণনাকারী অধিকাংশই ন্যায়পরায়ণ এবং বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এ অঙ্গনের সংবাদগুলো হালাল-হারামের বিধান, নেক কাজের ফজিলত এবং গুনাহের ক্ষতি সংক্রান্ত হয়ে থাকে। বেশির চেয়ে বেশি আপনি বড় বড় কিছু ব্যক্তির অবস্থা, তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলির সংবাদগুলো ভালো সূত্রে পেতে পারেন। কিন্তু রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি, প্রশাসন, পুলিশ, যুদ্ধক্ষেত্র এবং হাট-

বাজার থেকে নিয়ে দুনিয়ার কোনো সেক্টরে আপনি সকলকে আমানতদার পাবেন না। এসব বিষয়ের সংবাদদাতারা নির্ভরযোগ্য হতে পারে আবার অনির্ভরযোগ্যও হতে পারে। তারা সত্যবাদীও হতে পারে, মিথ্যুকও হতে পারে। তারা সন্দেহপূর্ণ হতে পারে আবার সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও করতে পারে। প্রত্যেক যুগেই এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। যদিও আমরা বলে থাকি যে, খাইরুল কুরুনের অধিকাংশ মানুষ নেককার ছিল; কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, মুহাদ্দিসগণ সে যুগেও সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত কাউকে চোখ বন্ধ করে নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নেননি।

দুনিয়ার সাধারণ ঘটনাবলি সাধারণ মানুষদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে থাকে। সাধারণ লোকেরাই সর্বপ্রথম তা অবগত হয়ে অন্যদের নিকট বর্ণনা করে। গ্রামাঞ্চলের আনন্দ ও দুঃখের ঘটনাগুলো নাপিত বা তার নিকট বসে থাকা অবসর ব্যক্তিরাই সর্বপ্রথম জানতে পারে। অপরাধমূলক ঘটনাবলি সর্বপ্রথম অপরাধী এবং মাস্তান লোকেরাই জানতে পারে। এরপর পুলিশ, গ্রাম্য আদালত এবং হাইকোর্ট অথবা হাসপাতালে গমনাগমনকারী লোকেরা অবগত হতে পারে। শহরের অন্যান্য লোক সন্ধ্যায় টিভি দেখে কিংবা পরদিন পত্রিকার মাধ্যমে সে সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আমানতদারির অধিকারী উঁচু শ্রেণির ব্যক্তিরা শিক্ষাদীক্ষা, ইসলাহে উম্মত ও জনগণের সেবার মতো মহৎ কার্যাবলিতে লিপ্ত থাকেন। তারা অধিকাংশ সময় এজাতীয় বিষয়ে অনবহিত থাকেন কিংবা বহু বিলম্বে অবগত হতে পারেন।

অর্থাৎ পৃথিবীর ঘটনাবলি সাধারণ লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়াটাই স্বভাবগত বিষয়। তাই আপনাতেই এই সূত্রগুলো দুর্বল হয়ে যায়। বিশ্বের ঘটনাবলি সম্পর্কে জানার জন্য আমাদেরকে এসব সংবাদপত্রের উপর বিশ্বাস করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবে কোনো সংবাদ অসম্ভব পর্যায়ের হলে সেটা ভিন্ন কথা। এই সংবাদগুলো প্রতিদিন সংবাদ এজেন্সিগুলো পাঠকের নিকট পৌঁছে দিয়ে থাকে, যাদের রিপোর্টার মুসলমান নাকি নাস্তিক আমরা সেটাও জানি না। এর দ্বারা বুঝতে পারলাম, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত এবং সৎ লোকদেরকে দুনিয়ার সংবাদপত্রের মাধ্যম বানানোটা পছন্দনীয় হলেও সকল সংবাদে এটাকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন বিষয়। (অথচ বর্তমানে সকল ধরনের সংবাদের দ্রুত প্রচারমাধ্যম বিদ্যমান রয়েছে) তেমনিভাবে অতীতেও এর

প্রতি গুরুত্বারোপ করা কঠিন; বরং অসম্ভব বিষয় ছিল। নিজের ঘটনাবলির উপর অনুমান করেও এটা বুঝা যেতে পারে।

ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মনীষীদের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ

বিজ্ঞ আলেমগণ অবশ্য নির্ভরযোগ্য এবং সতর্ক পন্থায় ইতিহাসের ঘটনাবলি একত্র করার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিজরিতে কয়েকজন মনীষী এই ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। উদাহরণত ইমাম বুখারির ওসতাদ খলিফা বিন খাইয়াত রহ. একটি ইতিহাসগ্রন্থ লিখেছেন, যা তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত নামে প্রসিদ্ধ। এরপর স্বয়ং ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনাকারীদের অবস্থার উপর আত-তারিখুল কাবির এবং আত- তারিখুল আওসাত লিপিবদ্ধ করেছেন। খলিফা বিন খাইয়াত হিজরি বর্ষ হিসেবে ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন আর ইমাম বুখারি ব্যক্তির নাম হিসেবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। মুহাদ্দিস ইবনে আবি খাইসামা এই পদ্ধতিতেই কাজ করেছেন।

খলিফা বিন খাইয়াত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে ইতিহাস জমা করার চেষ্টা করেছেন। এ কারণে তিনি আড়াই শতাব্দীর ইতিহাসের কেবল সারসংক্ষেপ জমা করতে সক্ষম হয়েছেন। এত দীর্ঘ বিস্তৃত সময়ের ইতিহাস তার কলমে মাত্র সাড়ে চারশো পৃষ্ঠায় শেষ হয়ে গেছে! গড়ে প্রতিবছরের ইতিহাসের জন্য মাত্র দেড় পৃষ্ঠা বরাদ্দ হয়েছে। আপনি এই কিতাবে কাদিসিয়ার যুদ্ধের বিবরণ খুলে দেখুন। তা মাত্র এক পৃষ্ঠা। ইয়ারমুকের যুদ্ধ খুলে দেখুন, মাত্র আধা পৃষ্ঠা। আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং উমর ফারুক রা. এর শাসনামলে বিরাট বিরাট যেসব বিজয় অর্জিত হয়েছে, যেগুলো জমা করতে ওয়াকিদিকে 'ফুতুহুশ শামে'র সাড়ে পাঁচশো পৃষ্ঠা ব্যয় করতে হয়েছে, সেগুলোর বিবরণ তারিখে খলিফায় মাত্র ৫০ পৃষ্ঠায় শেষ হয়ে গেছে! এত সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও খলিফা বিন খাইয়াত দুর্বল বর্ণনা নিতে বাধ্য হয়েছেন। এজন্য তার বর্ণনাতেও দুর্বল সূত্র রয়েছে।

এবার আরেকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করুন। তারিখে খলিফা সনদগত দিক থেকে সবচেয়ে উঁচুস্তরের হওয়া সত্ত্বেও এটা তারিখে তাবারি এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার মতো গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। তারিখে খলিফায় ঘটনার কারণ, কার্যকারণ, প্রেক্ষাপট, ঘটনার পরবর্তী প্রভাব

এবং অন্যান্য দিকের উপর বেশি আলোচনা করা হয়নি। কেননা, তার বর্ণনাসূত্র সীমিত। তা অধ্যয়ন করে পাঠক সকল ঘটনাতেই অন্ধকার অনুভব করবেন।

এটা মানুষের স্বভাবগত বিষয়। যদি মানুষ কোনো ঘটনা সম্পর্কে কী, কেন, কীভাবে, কে, কোথায় এবং কখন এই ছ'টি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান না পায় তা হলে তারা তুষ্ট হতে পারে না। খলিফা বিন খাইয়াতের অর্ধশতাব্দী পর ইবনে আবি খাইসামা আত-তারিখুল কাবির লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই কিতাবে ঘটনাবলিকে যথোপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্থান দেওয়া হয়নি। এতে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা সাত পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে একটি পূর্ণ পৃষ্ঠাতেও বদরযুদ্ধের আলোচনা করা হয়নি। এর কারণ হলো, তারা নিজেদের ওসতাদের থেকে উৎকৃষ্ট সনদে গুটিকয়েক সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই পেয়েছিলেন।

ইমাম বুখারি 'তারিখুল কাবির' এবং 'তারিখুল আওসাত' লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রেও ঘটনা একত্র করার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি; বরং সতর্কতার সঙ্গে বর্ণনাকারীদের অবস্থা সন্নিবেশ করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সহিহ সনদের শর্তাদি পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেননি। বর্ণনাকারীদের অবস্থা জানার জন্য 'তারিখুল কাবির' উত্তম উৎসগ্রন্থ; কিন্তু আপনি যদি এতে ইসলামি ইতিহাসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন ইরান ও শামের বিজয় কিংবা হজরত উসমানের মর্মান্তিক শাহাদাতের গভীরে পৌঁছতে চান তা হলে আপনি হাজারখানেক পৃষ্ঠা উলটালেও যথেষ্ট পরিমাণ উপাদান পাবেন না।

কিন্তু এতে ইমাম বুখারির মর্যাদার কোনো ঘাটতি হয় না। কেননা ঘটনাবলি একত্র করার মানদণ্ড উঁচুমানের হলে সংকলনের পরিমাণ খুব সামান্যই হয়ে থাকে।

শুধু ইতিহাসের ক্ষেত্রেই নয়; বরং হাদিসের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে থাকে। সহিহ বুখারিতে ৭৫৬৩ টি রেওয়ায়েত রয়েছে। তার নামকরণ করা হয়েছে,

الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه

এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে, কিতাবটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস সহিহ বর্ণনার সাথে যয়িফ বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণত মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে সাড়ে উনিশ হাজার, মুসনাদে আহমদ ইবনে হামবলে সাড়ে সাতাইশ হাজার, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবায় প্রায় আটত্রিশ হাজার রেওয়ায়েত রয়েছে। এসব হাদিসের কিতাবেও বহুসংখ্যক দুর্বল রেওয়ায়েত রয়েছে। তাই ইতিহাসের কিতাবাদিতে কেন দুর্বল বর্ণনা রয়েছে এ প্রশ্ন তোলার কোনো অর্থ হয় না (এ কথাটি ভুলে গেলে চলবে না যে, যয়িফ অর্থ কিন্তু ভুল নয়)।

এর দ্বারা বুঝতে পারলাম, ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যখন কেবল নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সংকলনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তখন তারিখে খলিফার মতো সংক্ষিপ্ত কিতাব অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু যখন এ ধরনের কিতাব অতীতের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়নি তখন তারা যয়িফ বর্ণনাগুলো একত্র করেছেন। আজ যদি আমাদের নিকট 'ফুতুহুল বুলদান', 'তারিখে তাবারি', 'তাবাকাতুল কুবরা', 'আনসাবুল আশরাফে'র মতো কিতাব, যাতে সহিহ ও যয়িফ বর্ণনা একত্র করা হয়েছে, তা বিদ্যমান না থাকতো তা হলে আমাদের জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য; বরং অসম্ভব হয়ে যেত।

ঘটনাবলির যৌক্তিক স্তর

সংবাদের পূর্ণতাদানের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে যয়িফ বর্ণনা একত্র করা হয়েছে। প্রতিদিন যেসব বিষয় সংঘটিত হয়ে থাকে তার মধ্যে কিছু বিষয় সংবাদের স্থান দখল করে নেয়। এ সংবাদের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ইতিহাস রচনা করা হয়। ইতিহাস যদি সংবাদদানের দাবি পূরণ না করতে পারে তা হলে তো তাকে আসলে ইতিহাস বলা যাবে না। কোনো তথ্য যদি সংবাদদানের মূলনীতি অনুযায়ী না হয় তা হলে তাকে সংবাদের মর্যাদা দেওয়া হয় না। যেমন কোনো দোকানদার যদি বলে আজ আমি দোকান খুলেছিলাম তা হলে এটা সংবাদ নয়। কিন্তু যদি কেউ এ তথ্য পেশ করে যে, প্রধানমন্ত্রী আজ অ্যাসেম্বলির বৈঠকে অংশগ্রহণ করেননি তা হলে এটি সংবাদ হবে।

সংবাদের ছ'টি মৌলিক প্রশ্ন

সংবাদের প্রথম শর্ত হলো তথ্যটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের হওয়া। উল্লেখযোগ্য বিষয় পূর্ণরূপে উল্লেখ করাটা সংবাদের প্রথম মূলনীতি। এজন্য ছ'টি প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হয়। সেটা হলো, কী, কেন, কীভাবে, কোথায়, কে, কখন।

অর্থাৎ ১. কী হয়েছে, ২. কেন হয়েছে, ৩. কীভাবে হয়েছে, ৪. কোথায় হয়েছে, ৫. কে করেছে, ৬. কীভাবে করেছে।

'কী হয়েছে' এর উত্তর উল্লেখযোগ্য বিষয় হতে হবে। এর মাধ্যমে পাঠক এবং শ্রোতাকে নতুন বিষয় সম্পর্কে অবগত করতে হবে। উদাহরণত, যদি বলা হয়, মাহমুদ গজনবি সোমনাথ বিজয় করেছেন, তা হলে এটি উল্লেখযোগ্য একটি তথ্য হবে। কিন্তু যদি কেউ বলে যে, সোমনাথ দুর্গ মাটির উপর নির্মাণ করা হয়েছে, তা হলে এটি উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয় হবে না। কেননা সকলেই তা জানে। এখানে সংবাদ দেওয়ার মতো কিছুই নেই।

কী হয়েছে এবং কেন হয়েছে, এর উত্তরে একটি যৌক্তিক মিল থাকতে হবে। ঘটনার যৌক্তিক ধারার প্রতি লক্ষ রাখা এবং সে অনুযায়ী তা প্রমাণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তায়ালা এই গোটা বিশ্বজগৎ উপকরণ কেন্দ্রিক বানিয়েছেন। বিরল কিছু ক্ষেত্র বাদ দিলে সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ঘটনা অন্য কোনো ঘটনার কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এ ঘটনাটি ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার কারণ হয়ে থাকে।

এরপর বিভিন্ন ঘটনা, অবস্থা এবং পরিবর্তনের মাত্রা যেমন হয়ে থাকে, তার কারণ ও কার্যকারণমূলক ঘটনাও তেমন হয়ে থাকে। যেমনভাবে গমের বীজ থেকে আম হতে পারে না তেমনিভাবে কোনো জায়গায় মুদিদোকান দেওয়ার মাধ্যমেও কেউ রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন আনতে পারে না। ঘটনার মধ্যকার এ সম্পর্ককে যৌক্তিক মিল বলা হয়ে থাকে। এগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা ব্যতীত ইতিহাস উপকারী হতে পারে না। তা পূর্ণতা পেতে পারে না। ইতিহাস কেন; বরং যদি কোনো ব্যক্তির জীবনীর মধ্যে এই যৌক্তিক মিল খুঁজে না পাওয়া যায় তা হলে তা অনর্থক হয়ে যায়। কয়েক লাইনের কোনো ঘটনাও যদি এই

সম্পর্কবিমুক্ত হয় তা হলে তা শিক্ষা এবং নসিহত লাভের উপকরণের পরিবর্তে পাঠক এবং শ্রোতাদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উদাহরণত, যদি কেউ আওরঙ্গজেব আলমগিরের ব্যাপারে লেখে যে, আলমগির একজন প্রসিদ্ধ মোগলশাসক ছিলেন। তার শাসনামলে মারাঠি সরদার শিবাজি মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। একসময় সে মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করে রাজধানীতে আসে। পুনরায় সে বিদ্রোহ করে পলায়ন করে। আলমগির মারাঠিদের শক্তি দমন করেন।

এক্ষেত্রে আপনাতেই কয়েকটি 'কেন' এবং 'কীভাবে' প্রশ্ন চলে আসবে। উদাহরণত প্রশ্ন উঠবে, শিবাজি কেন বিদ্রোহ করল? এরপর সে কীভাবেই পুনরায় আনুগত্যের ঘোষণা দিল? এরপর কেন আবার বিদ্রোহ করল?

পূর্ব থেকেই সবার জানা বিষয় কিংবা যে বিষয় উল্লেখ না করলে ঘটনার পরস্পর মিল খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় না, যৌক্তিক মিলের জন্য সে সকল বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। উদাহরণত, উল্লিখিত বিষয়ে আলমগির একজন প্রসিদ্ধ মোগলসম্রাট ছিলেন। এ বাক্য থেকে কোনো ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয় না। তেমনিভাবে আলমগির কেন মারাঠিদের দমন করলেন এটাও কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। কেননা এর উত্তর অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কারণ তারা বিদ্রোহ করেছিল। তাই তাদের দমন করাটা আবশ্যক ছিল।

যৌক্তিক মিলের জন্য দুর্বল উৎস অনিবার্য

প্রথম দিকের মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কেবল ইতিহাসের বর্ণনাগুলো সন্নিবেশন করেছিলেন। পরবর্তী ঐতিহাসিক যেমন ইবনুল আসির ও ইবনে খালদুন ঘটনাবলির যৌক্তিক সম্পর্কের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। যার ফলে ঘটনাবলির পারস্পরিক সম্পর্ক খুব সহজেই বুঝে আসে। এই যৌক্তিক মিল খুঁজে পাওয়ার জন্য যয়িফ বর্ণনা থেকেও সাহায্য নেওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। দুর্বল বর্ণনাকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করার কিছু মূলনীতি রয়েছে। সামনে আমরা সেগুলো উল্লেখ করব। ঐতিহাসিকগণ সাধারণত সেসব মূলনীতির প্রতি লক্ষ রেখে থাকেন। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সাথে মতভিন্নতার সুযোগ রয়েছে।

ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে কি বানোয়াট বর্ণনা নেই?

কেউ কেউ মনে করে যে, হাদিসের মধ্যে সহিহ, যয়িফ, মুনকার, বানোয়াট বর্ণনা থাকতে পারে। এজন্য এগুলো যাচাই-বাছাই করে পার্থক্য করা ঠিক আছে। কিন্তু ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে এ ধরনের কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

যদি বানোয়াট রাবিরা কেবল আকিদা-সুনান, বিধি-বিধান, আদব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বানোয়াট বর্ণনার পন্থা অবলম্বন করত তা হলে তাদের এই মত সঠিক ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কেবল আকিদা, বিধি-বিধান ও সুনানের ক্ষেত্রেই বানোয়াট বর্ণনা করা হয়নি; বরং সিরাত এবং ইতিহাসেও এমনটা করা হয়েছে। বাতিল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা পোষণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর বর্ণনাকারীরা সকল ক্ষেত্রেই মনগড়া এবং বানোয়াট বর্ণনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছে। প্রথম হিজরি শতাব্দী থেকেই বানোয়াট বর্ণনার রীতি চালু হয়েছে। চতুর্থ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা ভালোভাবেই অব্যাহত ছিল। বানোয়াট বর্ণনাকারীরা যেভাবে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস এবং বিধি-বিধানের বিপরীতে বানোয়াট ও মনগড়া বিশ্বাস ও বিধান মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেভাবে তারা প্রকৃত ও নির্ভুল ইতিহাসের মধ্যেও মনগড়া বর্ণনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। তারা এর মাধ্যমে পরবর্তীপ্রজন্মকে সাহাবি এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলে নিজেদের সমমনা বানানোর প্রয়াস চালিয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে ইমাম মালেক, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ি, ইমাম তাহাবি প্রমুখ ইমাম বিভিন্ন বর্ণনা পৃথক করার কাজ শুরু করেন। এক্ষেত্রে তারা আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান এবং সুনানের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা এর মাধ্যমে শরিয়তের মৌলিক দলিলগুলো সংকলিত আকারে সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন। এই সময়ে কেউ কেউ সিরাত, বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনা, বিভিন্ন ব্যক্তির মর্যাদা এবং সাহাবিদের ফজিলত শিরোনামে বহু ঐতিহাসিক বর্ণনা একত্র করেছেন। কিন্তু তারা মুহাদ্দিসদের মতো সনদ নিয়ে আলোচনা করেননি। কেননা সকলেই জানতেন যে, ইতিহাসের এই বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস বা বিধি-বিধানের বিপরীতে দলিল-প্রমাণ পেশ করা বৈধ নয়। কেউ যদি

মনে করে যে, আকিদা-বিশ্বাস এবং বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইতিহাসের বর্ণনাগুলো নির্দ্বিধায় বিচার্য হওয়ার জন্য এগুলোকে এই অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে তা হলে এটা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে যখন হাদিস এবং ইতিহাসের বিশাল ভাণ্ডার সবার সামনে উপস্থিত হয়নি তখনো ইয়াহইয়া বিন মাইন, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হিব্বান, ইমাম আহমদ বিন হামবলের মতো জরাহ-তাদিলের ইমামগণ সাহাবিদের ব্যাপারে বর্ণনার ক্ষেত্রে দোষত্রুটি এবং অন্যান্য আশ্চর্যজনক বিষয় বর্ণনাকারী বহু রাবিকে তারা যয়িফ, মুনকার এবং মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তারা এই সকল বর্ণনাকারীকে ভালোভাবেই জানতেন। উম্মতকে তাদের বর্ণনার ব্যাপারে তারা সতর্ক করতে চেয়েছেন। এজন্য এই বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে তাদের অভিমতগুলো কঠোর ধরনের। কিন্তু যেহেতু আকিদা ও বিধান একত্র করা ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য ছিল না এজন্য তারা এজাতীয় বহু রাবির বর্ণনায় কোনো বিধান আরোপ করা ব্যতীতই তা উল্লেখ করে দিয়েছেন। ফলে ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে এমন বহু বর্ণনা স্থান পেয়েছে, মুহাদ্দিসদের মূলনীতির আলোকে যাচাই-বাছাই করলে যা অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হবে।

বর্ণনা করার অর্থ কি সেটাকে আকিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া?

কেউ কেউ মনে করেন যে, তারিখে তাবারির লেখক ইবনে জারির তাবারি, আল কামিল ফিত তারিখের রচয়িতা ইবনুল আসির জাযারি, তারিখুল ইসলামের প্রণেতা হাফেজ জাহাবি, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার সংকলক হাফেজ ইবনে কাসির দুর্বল রাবিদের বর্ণনা আপন-আপন কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন, যার মাধ্যমে বাহ্যত সাহাবিদের উপর আপত্তি চলে আসে, তাদের প্রতি দোষারোপ করা হয়। এর মাধ্যমে কারো কারো নিকট অনুমিত হয় যে, এসব ঐতিহাসিক বোধহয় এমন বিশ্বাসই লালন করতেন! তারা মনে করতেন, সাহাবিরা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না! এটা প্রমাণ করার জন্যই এসকল ঐতিহাসিক এইসব বর্ণনা নিজেদের কিতাবে স্থান দিয়েছেন!

এ শ্রেণির লোকদের মতে ইতিহাসের বর্ণনা এবং বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য; কিন্তু সাহাবিগণ অগ্রহণযোগ্য! নাউজুবিল্লাহ।

এটি এক মারাত্মক ভুল। কেননা, এই সব ঐতিহাসিক কেবল শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এই বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করে থাকেন। তদুপরি অধিকাংশ বর্ণনার একটি সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনভাবে হাদিসের উপর বাহ্যিকভাবে আপত্তি তোলা হলে কোনো সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সে আপত্তি নিরসন হয়ে যায় তেমনিভাবে আপত্তিকর ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোও ব্যাখ্যা করা হলে সেসব আপত্তি নিরসন হয়ে যায়। ব্যাখ্যাগুলোকে প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বলা যায়। একই ঘটনা আপনজনদের নিকট কীর্তি হিসেবে বিবেচিত হয় আর বিরোধীদের নিকট সেটা হয় নিন্দাযোগ্য।[১০]

যেসব বর্ণনাকে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আপত্তিকর মনে করা হয় তার অধিকাংশই এই ধরনের। এজাতীয় বর্ণনা শুধু ইতিহাসের গ্রন্থাদিতেই নয়; বরং হাদিসের কিতাবাদিতে রয়েছে। এসব বর্ণনা, ইতিহাসের কিতাবে থাকুক কিংবা হাদিসের কিতাবে, সেগুলো সহিহ হোক কিংবা দুর্বল, এগুলো কোনোভাবেই 'আদালতে সাহাবা' আকিদার পরিপন্থি নয়। যদি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা হয় তা হলে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হয় না। অধিকাংশ ঘটনাই ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, ইজতিহাদি ভুল, দুঃখ-বেদনা কিংবা রাগ-গোসসার মতো কোনো সাময়িক বিষয় মাত্র।

প্রকৃত বিষয় হলো, হাদিসসংক্রান্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকার ও টীকাকারগণ তার অস্পষ্টতা দূর করেছেন। আপত্তি ও দ্ব্যর্থতা নিরসন করেছেন। এজন্য সেখানে সন্দেহ বাকি থাকে না। পক্ষান্তরে ইতিহাসের কিতাবাদিতে সন্দেহ উদ্রেককারী এই সকল বর্ণনার কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। ঐতিহাসিকরা এ ধরনের উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন বটে; কিন্তু এর মাধ্যমে সাহাবিগণকে মন্দ ও নিন্দনীয় প্রমাণ করা তাদের আদৌ উদ্দেশ্য নয়। তারা এইজাতীয় কোনো আকিদাও পোষণ করতেন না।

আমরা শুরুতেই এ বিষয়টি স্পষ্ট করে এসেছি। আমরা সেখানে বলেছি, সাহাবিদের ব্যাপারে আমাদের আকিদা-বিশ্বাস বুঝার জন্য আকায়েদের

---

[১০] উদাহরণত, পাকিস্তানিরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ এবং তার সাথিদের কীর্তি বলে গণ্য করে থাকে। পক্ষান্তরে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষ সকল ভারতীয় এটাকে ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে থাকে।

কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে। ইতিহাসের দুর্বল বর্ণনাগুলো কেবল সাধারণ নলেজের পর্যায়ভুক্ত। আমাদের কোনো মনীষী কখনো এগুলো থেকে কোনো ধরনের আকিদা-বিশ্বাস বের করেননি আর না আজ এমনটি করা জায়েজ রয়েছে। সাহাবিদের কীর্তি এবং তাদের মুশাজারাতের আলোচনায় যদি ইতিহাসের বর্ণনা সামনে রেখে কোনো দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয় তা হলে সর্বপ্রথম বর্ণনাগুলো হাদিস যাচাইয়ের পদ্ধতির মতোই বাছাই করতে হবে। এর মধ্যে সহিহ এবং ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাগুলো পার্থক্য করতে হবে।

আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে কয়েকজন ইতিহাসের কিতাব লেখার পাশাপাশি আকায়েদের উপর কিতাব রচনা করেছেন। যেমন : হাফেজ জাহাবি, হাফেজ ইবনে কাসির, ইমাম সুয়ুতি এবং ইমাম তাবারি রহিমাহুমুল্লাহ। আকিদা বিষয়ে রচিত তাদের কিতাবের প্রতি লক্ষ করলে তাদের আকিদাকে কুরআন-সুন্নাহ এবং জমহুর মুসলমানের সঙ্গে হুবহু মিল ও সামঞ্জস্যশীল পাওয়া যাবে।[১১]

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন, ইবনে কাসির রহ. হাদিস এবং তাফসিরশাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বর্ণনা যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে তার আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে। কিন্তু তিনি ইতিহাসের উপর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লেখার ক্ষেত্রে যাচাই-বাছায়ের সেই নীতির প্রতি লক্ষ রাখেননি।

---

[১১] উদাহরণত, ইমাম তাবারি রহ. এর আকিদার উপর সরিহুস সুন্নাহ, হাফেজ জাহাবি রহ. এর আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল, ইমাম সুয়ুতি রহ. এর হাকিকাতুস সুন্নাহ ওয়াল বিদআহর প্রতি লক্ষ করুন। এসব কিতাবে কেবল কুরআন-সুন্নাহ থেকেই তারা আকিদা গ্রহণ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি ইমাম তাবারি রহ. তারিখুর রাসুল ওয়াল মুলুক, হাফেজ জাহাবি রহ. এর তারিখুল ইসলাম, ইমাম সুয়ুতি রহ. এর তারিখুল খুলাফা দেখুন, তাতে বহু দুর্বল এবং সন্দেহপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। যদি যেকোনো বর্ণনা উদ্ধৃত করাটা তাদের আকিদা-বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করত তা হলে তারা কেন আকিদার কিতাব লিখে জমহুর মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করলেন?

এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইতিহাসশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এসকল আলেম ঘটনাসংশ্লিষ্ট যত বর্ণনা রয়েছে সবই সন্নিবেশ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তারা এই সকল বর্ণনা যাচাই-বাছাই এবং তার মধ্যকার সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বিষয়াদি নির্ধারণ করাটা আলেমদের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছেন। এটা বিশেষ কোনো ব্যক্তির থেকে ঘটে যাওয়া ভুল বিষয় নয়; বরং সকল ইতিহাসবিদ এই আঙ্গিকেই ইতিহাস রচনা করেছেন। তারা ইতিহাসশাস্ত্রে দুর্বল এবং ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাগুলো কোনো ধরনের হুকুম প্রয়োগ করা ব্যতীত উল্লেখ করে দেওয়াকে দূষণীয় মনে করেন না। কেননা তারা জানতেন যে, এসব বর্ণনার মাধ্যমে কোনো আকিদা-বিশ্বাস বা শরিয়তের বিধান বের করা হবে না; বরং শিক্ষা, উপদেশ এবং বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়াই এর উদ্দেশ্য। আর তাদের অবলম্বনকৃত পদ্ধতিতেও সেটা সম্ভব। এখন যদি কোনো ব্যক্তি ইতিহাসের এসব বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস কিংবা বিধি-বিধানের উপর কোনো মাসআলার দলিল পেশ করতে চায় তা হলে যেভাবে হাদিসের বর্ণনা যাচাই-বাছাই করা হয়, যে মূলনীতির আলোকে তা বিচার করা হয়, তাকে ব্যক্তিগতভাবে সেই মূলনীতির ভিত্তিতে ইতিহাসের বর্ণনাকে যাচাই-বাছাই করতে হবে। অন্যথায় তার জন্য ইতিহাসের কোনো বর্ণনার মাধ্যমে দলিল পেশ করা বৈধ হবে না। তার জন্য এটা বলাও যথেষ্ট হবে না যে, অমুক হাদিসবেত্তার লিখিত ইতিহাসগ্রন্থে এই বর্ণনাটি রয়েছে! লেখকের রেফারেন্স টেনে এ জিম্মাদারি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি বুঝতে পারি। মুজতাহিদ ইমামগণ এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বহু ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। যেমন : ইমাম শাফিয়ি রহ.। তাদের কেউ কেউ চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর কিতাব রচনা করেছেন। যদি তারা চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত কিতাবে বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং তার উপকারিতা উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন যে, মদের এইসকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা পান করার ফলে এমনসব প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়ে থাকে। শূকরের গোশত, চামড়া এবং তার পশমের এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা রয়েছে। এরপর কেউ চিকিৎসাশাস্ত্রে তাদের এ সকল আলোচনা দেখে যদি তা বৈধ আখ্যা দিতে থাকে আর দলিল হিসেবে বলতে থাকে যে, অমুক ইমাম কিংবা

আলেম তার কিতাবে এটা লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখানে এগুলো হারাম হওয়ার কথা বলেননি, তা হলে কি তাদের এই দলিল সঠিক হবে?[১২]

মুফতি শফি রহ. এর এ মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঐতিহাসিকগণ কেন বর্ণনা বিশুদ্ধ বা দুর্বল হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি। তার পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঐতিহাসিকদের কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত করা এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, তিনি এটাকে ইসলামি আকিদার পরিপন্থি ক্ষেত্রে প্রমাণ-যোগ্য মনে করেন। এটি আমাদের বক্তব্য নয়; বরং ওইসকল মনীষী সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়টি বলে গেছেন।

উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে হাদিস এবং ইতিহাসশাস্ত্রে পারদর্শী তিন মনীষীর বক্তব্য উল্লেখ করব।

ইবনে জারির তাবারি রহ. এর বক্তব্য

ইবনে জারির তাবারি একজন বড়মাপের মুহাদ্দিস এবং ফকিহ ছিলেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে কেবল বর্ণনা সন্নিবেশ করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। আলেমগণ যাতে যাচাই-বাছাই করতে পারেন এজন্য তিনি প্রতিটি বিষয় সনদসহ উল্লেখ করেছেন। ইবনে জারির তাবারি রহ. আপন কিতাব সম্পর্কে বলেন, 'পাঠকদের জানা থাকা উচিত যে, এই কিতাবে আমি যে সকল তথ্য পরিবেশন করব কিংবা যেগুলো লিপিবদ্ধ করব সেই ক্ষেত্রে আমি কেবল সংবাদের ও বর্ণনাকারীদের সূত্রের উপর নির্ভর করেছি। এক্ষেত্রে আমি খুব কম সংখ্যক যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ পেশ করেছি। খুব কম সংখ্যক স্থানেই নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু উদ্ভাবন করেছি। কেননা অতীতের এসব ঘটনা আমরা নিজেরা প্রত্যক্ষ করিনি আর সে যুগেও আমরা বিদ্যমান ছিলাম না। কেবল বর্ণনাকারী এবং রাবিদের বর্ণনাকৃত সংবাদের মাধ্যমে আমরা সে সম্পর্কে অবগত হতে পারি; দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে নয়। তাই আমার কিতাবে উল্লিখিত কোনো বর্ণনা সহিহ বোধগম্য না হওয়ায় তা পাঠক কিংবা শ্রোতাদের নিকট আশ্চর্য এবং অপছন্দনীয় মনে হলে বুঝতে হবে, এটা আমাদের কোনো উদ্ভাবন নয়; বরং অতীতের বর্ণনাকারীদের থেকে এভাবেই এটা

---

[১২] মাকামে সাহাবা, ২৬, ২৭

আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আমাদের নিকট যেভাবে পৌঁছেছে আমরা সেভাবেই উল্লেখ করে দিয়েছি।[১৩]

ইবনে জারির রহ. এর উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে দুটি বিষয় বুঝা গেল—এক. রেওয়ায়েতসমূহ তিনি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করে থাকেন।

দুই. যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব কি না সেদিকেও নজর দেননি। তিনি সন্দেহপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে অতীতের বর্ণনাকারীদের উপর সকল দায়ভার ন্যস্ত করেছেন। তিনি নিজেকে নিছক একজন মধ্যস্থতাকারী আখ্যা দিয়েছেন। যার কাজ হলো অতীতের ঘটনাবালি পরবর্তীদের নিকট পৌঁছে দেওয়া। সঠিক বা ভুল নির্বাচন করার দায়িত্ব তিনি পাঠকদের কাঁধে ছেড়ে দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনুল আসির জাযারি রহ. এর বক্তব্য

ইবনুল আসির রহ. তার যুগশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কামিল ফিত তারিখে তাবারির বর্ণনাসমূহের সনদ এবং দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে তা একত্র করেছেন। দুর্বল বর্ণনাকারীদের বহু আপত্তিকর বিষয় তিনি এতে সন্নিবেশ করেছেন। ইবনুল আসির রহ. তার এ গ্রন্থের প্রশংসা এবং উত্তম ও ভালো দিকগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনার উৎস যাচাই এবং তার বিশুদ্ধতার জিম্মাদারির আলোচনা করেননি; বরং তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, অধিকাংশ বিষয় তিনি তাবারি থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তাকে নতুন আঙ্গিকে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল আসির রহ. নিজেই বলেন, আমি তাবারির দ্বারা শুরু করেছি। কেননা সকলেই তার রেফারেন্স দিয়ে থাকে। সকলে তা ঘেঁটে থাকে। আমি এই কিতাবের সকল বছরের ঘটনা উল্লেখ করেছি। কোনো বছরের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে কিছু বৃদ্ধি করিনি। তবে তাবারি রহ. একই ঘটনাকে কয়েকটি সূত্রে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি বর্ণনা একই ধরনের। এতে হয়তো সামান্য বেশকম রয়েছে। আমি এক্ষেত্রে সবচেয়ে দীর্ঘ বর্ণনাটি গ্রহণ করেছি এবং সেটাই উদ্ধৃত করেছি। অন্যান্য বর্ণনায় অতিরিক্ত কোনো বিষয় থাকলে আমি

---

[১৩] তারিখুত তাবারি ১/৭, ৮

সেটাকে এতে শামিল করে দিয়েছি। আমি এভাবে প্রতিটি জিনিসকে আপন আপন স্থানে রেখে দিয়েছি। এর ফলে একটি ঘটনার সকল অংশ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলেও এক্ষেত্রে তা এক ধারায় চলে এসেছে। এরপর আমি অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইতিহাসের গ্রন্থাদির সাহায্য নিয়েছি। সেগুলোতে তারিখে তাবারির অতিরিক্ত কিছু পেলে তা সন্নিবিষ্ট করেছি। প্রতিটি জিনিসই আমি এভাবে আপন স্থানে রেখেছি।[১৪]

এর মাধ্যমে বোঝা গেল যে, ইবনুল আসির রহ. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাবারির বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি একাধিক বর্ণনা এবং বর্ণনাসূত্র বাদ দিয়েছেন। ঘটনাকে তিনি বিন্যস্ত করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি বর্ণনার বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতার জিম্মাদারি আপন কাঁধে নেননি। তিনি তাবারির বর্ণনা যাচাই-বাছাই করার এবং আপত্তিকর বর্ণনা পৃথক করার দাবি করেননি। পাশাপাশি তিনি এটাও বলেছেন যে, তিনি তাবারি ছাড়া অন্যান্য কিতাব থেকেও বহু বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা ইবনুল আসির রহ. যেহেতু এই কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করেননি এজন্য তার সূত্র জানাটা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। যদি কোনো বিতর্কিত বিষয় তার বর্ণনার কোনো সূত্র দুর্বল কিংবা তার সূত্র খুঁজে না পাওয়া যায় তা হলে এটি পরিত্যক্ত বলে সাব্যস্ত হবে।

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর বক্তব্য

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. অত্যন্ত উঁচুমানের একজন আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, বর্ণনা যাচাই-বাছাইকারী এবং বড়মাপের ঐতিহাসিক ছিলেন। তবু চোখ বন্ধ করে তার বর্ণনার সনদ সহিহ মেনে নেওয়া যাবে না। হাফেজ ইবনে কাসিরও এমন দাবি করেননি। ইবনে কাসির রহ. এর রচনাপদ্ধতি আমাদের বোঝা প্রয়োজন। কেবল সহিহ বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করা তার উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তিনি মৌলিকভাবে ইবনে জারির তাবারির বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে দুর্বল এবং আপত্তিকর বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি তিনি হাদিস এবং ইতিহাসের অন্যান্য সংকলন থেকে পাওয়া গ্রহণযোগ্য বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন। যার ফলে

---

[১৪] আল কামিল ফিত তারিখ, ১/৬, ৭

উক্ত ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রায়ণ হয়ে ওঠে। পাঠক যেন ইনসাফসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এজন্য হাফেজ ইবনে কাসির অত্যন্ত আমানতদারির সঙ্গে উভয়পক্ষের দলিল উল্লেখ করে দিয়েছেন।

যদিও ইবনে কাসির রহ. সন্দেহপূর্ণ এবং মনগড়া বর্ণনার মুখোশ উন্মোচন করার কথা বলেছেন কিন্তু কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি দুর্বল সর্বক্ষেত্রে তা স্পষ্ট করেননি। উদাহরণত, কারবালার বিষয়ে তিনি কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী আবু মিখনাফের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু কোথাও তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেননি।

তবে কারবালার ঘটনার শেষে তিনি নিজেই বলেছেন, আমি যা উল্লেখ করেছি তার কিছু অংশ সন্দেহপূর্ণ। যদি ইবনে জারির তাবারির মতো হাফেজ এবং ইমাম এগুলো বর্ণনা না করতেন তা হলে আমি তা বর্ণনা করতাম না। এর অধিকাংশই আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত। আকিদার প্রশ্নে সে শিয়া মতাবলম্বী ছিল। ইমামদের নিকট হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সে দুর্বল ছিল। কিন্তু সে বিভিন্ন সংবাদ এবং অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকায় তার নিকট এমন বহু বিষয় ছিল, যা অন্যদের নিকট পাওয়া যেতো না। এই কারণে বহু লেখক এই ঘটনায় কোনোধরনের চিন্তাভাবনা ব্যতীত তার বর্ণনা গ্রহণ করে নিয়েছেন।[১৫]

মোটকথা কোনো বর্ণনা ইবনে জারির, ইবনে কাসির বা অন্য কোনো মনীষীর ইতিহাসগ্রন্থে থাকা সেটা সঠিক সূত্রবিশিষ্ট এবং দলিলযোগ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। তাই এগুলো থেকে কোনো আকিদা বের করার সুযোগ থাকে না। হ্যাঁ, তবে যদি তারা নিজেরাই বলেন যে, এই বর্ণনাটি সহিহ এবং আমাদের নিকট সেই বর্ণনার মাধ্যমে কোনো মাসআলা প্রমাণিত হয় তা হলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি তারা শুধু কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত করেন আর এর অধীনে কোনো মাসআলা আলোচনায় আসে তা হলে সেই বর্ণনাটির সনদ (সূত্রপরম্পরা) এবং মতন (মূল পাঠ) যাচাই-বাছাই করতে হবে। এরপর এটা দলিল হিসেবে উপস্থাপনের ফয়সালা করতে হবে।

---

[১৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/৩৭৫, ৩৭৬

যয়িফ বর্ণনা কবুল করার ক্ষেত্রে শিথিলতার শর্ত

কেউ কেউ মনে করে থাকে যে, পূর্ববর্তী মনীষীগণ কোনো মাজরুহ, বিদআতি এবং সন্দেহযুক্ত রাবি থেকে কোনোধরনের শর্তের প্রতি লক্ষ না রেখেই রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন; বরং তারা স্বল্পবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অভাবে এমনটি করেছেন। আসলে তারা ইসলামের শত্রু ছিলেন। এজন্যই তারা সব ধরনের বর্ণনাকারীর সকল রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন।

এটি সম্পূর্ণ বাস্তবতা পরিপন্থি এক আপত্তি। তাদের নিকট নির্ধারিত কিছু নীতি রয়েছে। তারা সেই নীতিমালা অনুযায়ী কিছু শর্তের প্রতি লক্ষ রেখে এসব বর্ণনা উদ্ধৃত করা, তা পাঠ করা এবং সতর্কতার সঙ্গে তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ রেখেছেন। উসুলবিদগণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এ সকল শর্ত বর্ণনা করেছেন।

ভ্রান্ত লোকদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মূলনীতি

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বিদআতি ও ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী রাবিদের বর্ণনা গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের নিম্নোক্ত শর্তাবলি উল্লেখ করেছেন।

গ্রহণযোগ্য বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি শরিয়তের কোনো মুতাওয়াতির বিষয়, যা ইসলামধর্মের অংশ হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তা অস্বীকার করবে কিংবা তার বিপরীত কাজ করবে অর্থাৎ শরিয়তে অকাট্যভাবে যা নিষিদ্ধ, তাকে বৈধ মনে করবে তা হলে এমন ব্যক্তির বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হবে।[১৬]

অর্থাৎ কোনো রাবি যদি কেবল বিদআতি পর্যায়ের হয় আর বিদআত তাকে কুফর পর্যন্ত না নিয়ে যায় তা হলে তার এ বর্ণনা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি শর্তের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তা হলো তার বর্ণনা বিদআতমূলক কোনো দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনকারী হতে পারবে না।

যদি কোনো রাবি বিদআত বা ভ্রান্ত আকিদায় জড়িয়ে পড়ে; পাশাপাশি তার বর্ণনায় ইসলামি আকিদা বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি কিছু থাকে তা হলে আশংকা করা হয় সেই রাবির এসব কথা নিজে থেকে বানিয়ে

---

[১৬] নুখবাতুল ফিকার, ৩

মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার চেষ্টা করবে। এমতাবস্থায় বর্ণনাটি গভীর সন্দেহপূর্ণ এবং অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে।[১৭]

যয়িফ বর্ণনা উদ্ধৃত করা এবং তার উপর আমল করার বিধান

যয়িফ বর্ণনার ব্যাপারে দুটি প্রশ্ন তৈরি হয়ে থাকে,

১. তা বর্ণনা করা কেমন?
২. তার উপর আমল করার বিধান কী?

আল্লামা সুয়ুতি তাদরিবুর রাবি কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্নে তার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো।

যয়িফ বর্ণনা যদি বানোয়াট পর্যায়ের দুর্বল না হয়, তা হলে তা বর্ণনা করা জায়েজ।

আর যয়িফ বর্ণনার উপর আমল করার দুটি শর্ত রয়েছে :

১. বর্ণনাটিতে ইসলামি আকিদা পরিপন্থি কোনো বিষয় না থাকা (অতএব যয়িফ বর্ণনা যদি আল্লাহর গুণাবলি, নবীদের নিষ্পাপ হওয়া, সাহাবায়ে কেরামের আদালত প্রভৃতির বিপরীত কোনো বিষয়ে বলা হয়ে থাকে তা হলে সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে)।

২. তাতে ইসলামের অকাট্য বিধানের (হালাল-হারামের) বিপরীত বিষয় না থাকা।

মুহাদ্দিসদের পরিভাষা বুঝতে হবে

কোনো বর্ণনাকে সহিহ বা হাসান হিসেবে উল্লেখ করাটা এক বিশাল বড় দায়িত্ব। তেমনিভাবে কোনো বর্ণনাকে যয়িফ, মাউযু অর্থাৎ তার উপর বানোয়াট, মনগড়া প্রভৃতি বিধান আরোপ করা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। বরং এটা রেওয়ায়েতশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাজ।

কিছু লোক রেওয়ায়েতের মূলনীতি না জেনেই জরাহ-তাদিলের কিতাব খুলে বসেন। যখন জরাহ-তাদিলের ইমামগণকে لا يصح (সহিহ নয়) لا يثبت (প্রমাণিত নয়) প্রভৃতি বিধান আরোপ করতে দেখেন তখন তারা মনে করেন, বর্ণনাটি মনে হয় মনগড়া। বরং ইমামগণ যখন কোনো

---

[১৭] নুখবাতুল ফিকার, ৩

রাবির ব্যাপারে ضعيف (দুর্বল), واه (নগণ্য পর্যায়ের), غير ثقة (অবিশ্বস্ত), شيعي (শিয়া), ليس بشئ (তার কোনো মূল্য নেই) বলেন তখন সেই রাবির সকল রেওয়ায়েতকে আগাগোড়া মনগড়া মনে করে বসে। কেউ কেউ আবার নিজের যোগ্যতা দেখাতে গিয়ে কোনো রাবির ব্যাপারে মাত্র দু-চারজন ইমামের জরাহ তথা নেতিবাচক মন্তব্যের ভিত্তিতে তার সকল ইলমি খেদমত কলমের এক খোঁচায় ফেলে দিতে চান। কিন্তু এর বিপরীতে সেই রাবির ব্যাপারে বড় বড় ইমামগণের ডজন ডজন তাদিল তথা প্রশংসামূলক মন্তব্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যান।[১৮]

এইসব লোক তাহকিক করতে বসলে উসুল না জানা থাকার দরুন আজেবাজে কারিশমা দেখিয়ে থাকে। কারো নিকট ফিকহে হানাফির হাজার হাজার দলিল সব যয়িফ ও বানোয়াট মনে হয়। কারো নিকট তাফসিরের বিরাট অংশ নিছক ঘটনা ও কাহিনি মনে হয়। কারো নিকট সিরাতের অধিকাংশ বর্ণনা অলীক ও ভিত্তিহীন মনে হয়। আবার কেউ ইসলামি ইতিহাসের মৌলিক উৎসগ্রন্থগুলোকে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত মনে করে। আফসোস, তারা যদি উপমহাদেশের মহান ফকিহ আল্লামা আবদুল হাই লাখনবির কথা চিন্তা করে দেখতো!

মুহাদ্দিসগণ যখন বলেন হাদিসটি যয়িফ তখন এর উদ্দেশ্য হলো আমাদের নিকট তা সহিহ হওয়ার শর্তাদি সুস্পষ্ট হয়নি। এর উদ্দেশ্য কখনোই এটা নয় যে, বর্ণনাটি মিথ্যা। কেননা কোনো রাবি চরম মিথ্যুক হলেও এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার কদাচিৎ বর্ণনা সঠিক। তেমনিভাবে অধিকাংশ সময় যারা ভুল বর্ণনা করে, তারাও মাঝেমধ্যে সঠিক বর্ণনা করতে পারে। এটাই অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য।[১৯]

---

[১৮] একশ্রেণির লোক ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ব্যাপারে এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করে থাকে। তেমনিভাবে কিছু ভদ্রলোক হাদিস-সমুদ্রের বিশাল ভাণ্ডারের অধিকারী ইমাম ইবনে শিহাব যুহরি, তাফসির এবং ইতিহাসের প্রথম সংকলক ইমাম তাবারি, সিরাতের প্রথমদিকের লেখক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং ইমাম আহমদ বিন হামবলের উসতাদ ইমাম আবদুর রাজ্জাক সানআনির মতো উঁচুমাপের মুহাদ্দিসদের ব্যাপারে এই ধরনের আচরণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উসুলে হাদিস এক বিস্তৃত এবং গভীর শাস্ত্র। কিছু পরিভাষা পড়েই নিজেকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করা এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের গবেষণার উপর অযাচিত সমালোচনা করা সম্পূর্ণ ভুল।

[১৯] আর রাফউ ওয়াত তাকমিল, ১৮৯

এরপর তিনি বলেন, মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সময় বলেন لا يصح (এটা সহিহ নয়) لا يثبت (এটা প্রমাণিত নয়)। এতে রেওয়ায়েতের মূলনীতি সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তিরা মনে করে যে, রেওয়ায়েতটি মুনকার কিংবা যয়িফ। মুহাদ্দিসদের পরিভাষা সম্পর্কে মূর্খতা এবং তাদের স্পষ্ট বর্ণনা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলেই এমনটি হয়ে থাকে। মোল্লা আলি কারি তাজকিরাতুল মাউযুয়াতে লিখেছেন, কারো বর্ণনা প্রমাণিত না হলেই সেটা মনগড়া হওয়া আবশ্যক হয়ে যায় না।

তিনি অন্যত্র বলেন, কোনো বর্ণনা সহিহ না হওয়াটা বর্ণনার অন্তর্নিহিত বক্তব্য মনগড়া হয়ে যাওয়ার প্রমাণ বহন করে না।[২০]

সাহাবি ও তাবেয়িদের যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের রচনাশৈলী সঠিক ছিল নাকি ভুল?

ঐতিহাসিক বর্ণনা উল্লেখ করার প্রাচীন রীতিকে আমরা মন্দ বলি না। আমরা পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানো সঠিক মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের উপর কোনো আপত্তি করা রেওয়ায়েতের মূলনীতি না জানার ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী মনীষীদের ব্যাপারে আমাদের বিরূপ ধারণা তৈরি হয়ে যায় তা হলে সেটা সংশোধন করে নেওয়া উচিত। তবে বর্তমান যুগে আমাদের কাঁধে যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমরা তা উপেক্ষা করতে পারি না।

পূর্ববর্তী মনীষী এবং আমাদের নিকট অতীতের আকাবিরদের কেউই ইতিহাসের গ্রন্থাদি থেকে আকিদা-বিশ্বাস নির্মাণের দাবি করেননি। তারা ইতিহাসের প্রতিটি বর্ণনাকে সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণযোগ্য বলে উল্লেখ করেননি। তারা কেউ এমন বলেননি যে, ইতিহাসে কোনো দুর্বল বা বানোয়াট বর্ণনা নেই। বরং ইতিহাসে সহিহ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বানোয়াট রেওয়ায়েত রয়েছে। কিন্তু প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকগণ মুহাদ্দিসদের মতো এই বর্ণনাগুলোকে সনদসহ উল্লেখ করেছেন। ফলে আলেমগণ চাইলে এগুলোর মধ্য থেকে কোনটি সহিহ, হাসান ও যয়িফ তা নির্ণয়

---

[২০] আর রাফউ ওয়াত তাকমিল, ১৯১

করতে পারেন। এজন্যই জরাহ-তাদিলের ইমামগণ ইতিহাসের অধিকাংশ তথ্য আস্থা-যোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

যেমনভাবে হাদিসের ক্ষেত্রে আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান এবং সুনানমূলক বিষয়াদিতে আলেমগণ যয়িফ বর্ণনাকে প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেননি তেমনিভাবে উসুলবিদগণ ইসলামি আকিদার পরিপন্থি, বিদআতের সমর্থনকারী ও সাহাবিদের উপর দোষারোপ সংক্রান্ত ইতিহাসের রেওয়ায়েতকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সর্বক্ষেত্রেই যয়িফ বিষয়কে পরিত্যাগ করতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে, যয়িফ রেওয়ায়েত সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সতর্কতামূলক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা কট্টরপন্থা। কেননা এই পন্থা অবলম্বন করলে হাদিস, সিরাত এবং ইতিহাসের এক বিরাট অংশ পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে। বিভিন্ন আমলের ফজিলত, সাহাবিদের বিজয়, তাদের ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার আমাদের ফেলে দিতে হবে। যেমনভাবে হাদিসের ক্ষেত্রে ফাজায়েল সংক্রান্ত রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হয়ে থাকে তেমনিভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রেও খুটিনাটি বিষয়ে যয়িফ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। হাফেজ ইবনে কাসির, হাফেজ জাহাবি, হাফেজ ইবনে হাজার, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, হাফেজ ইবনে কাইয়ুম রহিমাহুমুল্লাহর মতো সতর্ক ও বিচক্ষণ রাবি-বিচারকগণ এসব যয়িফ রেওয়ায়েত থেকে উপকৃত হতে বাধ্য হয়েছেন। উসুলের আলোকে যয়িফ রেওয়ায়েত থেকে উপকৃত হওয়াই সঠিক পন্থা।

কয়েকজন লেখকের একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা কি তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে?

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যয়িফ রেওয়ায়েতকে সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত পর্যায়ের মনে করতে হবে। কেউ মনে করে যে, কোনো যয়িফ রেওয়ায়েত যদি দু'এক জায়গায় বর্ণিত হয় তা হলে অবশ্যই সেটা সন্দেহযুক্ত। পক্ষান্তরে ইতিহাসের কোনো রেওয়ায়েত যদি কয়েকটি কিতাবে বর্ণিত হয় কিংবা সেটা প্রসিদ্ধ হয় তা হলে সেটা গ্রহণযোগ্য এবং নিশ্চিত পর্যায়ের হবে।

আসলে এটা ভাসা-ভাসা চিন্তা। ইতিহাসের ডজনখানেক কিতাবে কোনো বিষয় বর্ণিত হওয়া সেটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। সাধারণ খবর, সংবাদ ও রিপোর্টের মতোই ইতিহাসের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য কিংবা সন্দেহপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও মূল লক্ষণীয় হলো—ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী কতজন ছিল? কারা তাদের থেকে এটা রেওয়ায়েত করেছে? সেই রাবি তথা বর্ণনাকারী এবং লেখকদের মধ্যকার মাধ্যমগুলো শক্তিশালী ছিল নাকি কোনো মাধ্যম দুর্বল হয়ে গিয়েছিল?

আমাদেরকে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, কোনো একটি সংবাদ বর্ণনাকারীদের সূত্রপরম্পরা শেকলের কড়ার মতো। শেকলের প্রতিটি কড়াই শক্ত-মজবুত হওয়া আবশ্যক। যদি কোনো একটি কড়া দুর্বল থেকে যায় তা হলে পুরো শেকল অকার্যকর এবং বৃথা হয়ে যায়। তেমনিভাবে শুরু শেষ কিংবা মাঝখানের কোনো বর্ণনাকারী দুর্বল হয়ে গেলে পুরো সংবাদটি দুর্বল হয়ে যায়।

শুরুতে যদি কোনো দুর্বল সাক্ষী কোনো ঘটনা বর্ণনা করে এরপর তার থেকে তিন ব্যক্তি সেটা উদ্ধৃত করে নিজেদের কিতাবে লিখে দেয়, পরবর্তীতে হাজার হাজার আলেম সেটা বর্ণনা করতে থাকে, তা হলে এভাবে একের পর এক বর্ণনা করার কারণে মূল বিষয়টি শক্তিশালী হয়ে যায় না। যদি শুরুর রাবি যয়িফ হয় তা হলে পুরো ঘটনা যয়িফ বলেই আখ্যা পাবে।

মনে করুন, কেউ একটি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করল। এরপর সে বলল, অমুক উজির এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। দশ ব্যক্তি তার এই কথাটি শ্রবণ করল। এই দশজন থেকে শুনে পঞ্চাশজন সাংবাদিক এ বিষয়ে নিন্দামূলক বক্তব্য প্রদান করল। এর মাধ্যমে কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের অপরাধী হওয়াটা নিশ্চিত হয়ে যায় না। সাধারণ মানুষের নিকট এটি নিশ্চিত হলেও প্রকৃত বিচারে এটা প্রামাণ্য পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। আদালতে যদি এ বিষয়টি উত্থাপন করা হয় তা হলে মন্ত্রী মহোদয়ের বিরুদ্ধে সেই দশ ব্যক্তি এবং পঞ্চাশ সাংবাদিককে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা যাবে না। বরং সাক্ষী হিসেবে কেবল সেই প্রথম প্রত্যক্ষদর্শীকে উপস্থিত করতে হবে। যদি সে গ্রহণযোগ্য হয় এবং তার দাবির পক্ষে

কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারে তা হলে মন্ত্রী মহোদয় অপরাধী সাব্যস্ত হবেন, অন্যথায় নয়।

মূলত কোনো ঘটনা যখন অগ্রহণযোগ্য রাবি থেকে বর্ণিত হয়, তখন সেই রাবি নিজে এখানে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে দেয় কিংবা কখনো কখনো সে মূল বিষয়টি আরো বাড়িয়েচড়িয়ে বর্ণনা করে। এভাবে তার থেকে বিষয়টি বর্ণিত হতে থাকে। পরবর্তীতে অন্যান্য ঐতিহাসিক এসব রাবি থেকে সেই রেওয়ায়েতটি এভাবেই গ্রহণ করতে থাকেন। কেননা তারা অন্য কোথাও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পান না; বরং তা কেবল এই সকল রাবির নিকটই পেয়ে থাকেন। এভাবে ধীরে ধীরে ওই বিষয়টি ঐতিহাসিক বাস্তবতার রূপ লাভ করে। অথচ মৌলিকভাবে তা অত্যন্ত দুর্বল ও বানোয়াট বর্ণনা। এমনটি অহরহই ঘটে থাকে।

একজন যয়িফ রাবি কয়েকজন সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবি থেকে কোনো ঘটনা বর্ণনা করলে কি সেটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়?

যদি কোন রাবি ব্যক্তিগতভাবে যয়িফ হয়; কিন্তু তার উসতাদ সিকাহ হয় আর সে এই সিকাহ (বিশ্বস্ত) উসতাদ থেকে যদি কোনো রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তা হলে কি তার এ রেওয়ায়েত শক্তিশালী বলে গণ্য হবে?

এ প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু নেতিবাচক হবে। অর্থাৎ এ ধরনের বর্ণনা যয়িফ বলেই গণ্য হবে। যেমনভাবে শেকলের মাঝে কোনো কড়া দুর্বল হলে পুরো শেকল দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনিভাবে কোনো রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রেও কোনো রাবি দুর্বল হলে পুরো রেওয়ায়েত দুর্বল হয়ে যায়।

একটি উদাহরণ লক্ষ করুন। মনে করুন কোথাও কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো। এর কয়েক বছর পর এক ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, অমুক অমুক ব্যক্তি আমাকে বলেছে যে, তারা নিজেরা সেই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে। তারা বলেছে যে, হত্যাকারী অমুক। এক্ষেত্রে এ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদানকে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতো সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। কেননা সেও তো তাদের প্রতি মিথ্যা সম্বন্ধ করতে পারে। হ্যাঁ, তবে যদি তারা নিজেরাই এসে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করে তা হলে এটি শক্তিশালী সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা যদি মারাও যায় তা হলে ওই ব্যক্তির সাক্ষ্যকে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতো গ্রহণযোগ্য মনে করা

হবে না। তেমনিভাবে যদি যয়িফ রাবি সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবিদের নাম উল্লেখ করে কোনো রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তবু সেটা সন্দেহপূর্ণ হিসেবেই গণ্য হবে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, জাল রাবিরা বিভিন্ন সময় নিজেরা মনগড়া সনদ (বর্ণনাসূত্র) তৈরি করে থাকে। কখনো কখনো তারা একটি জাল ঘটনার কয়েকটি সনদ তৈরি করে সেখানে তারা বড় বড় কয়েকজন সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবির নাম অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। এর মাধ্যমে তারা প্রকাশ করতে চায় যে, অমুক অমুক বড় ব্যক্তি আমার নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেছে।

মুহাদ্দিসগণ এ ধরনের জাল রেওয়ায়েত চেনার পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, সেই সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবির অন্যান্য ছাত্র এই যয়িফ রাবির মতোই এটি রেওয়ায়েত করেছেন কি না? এরপর দেখতে হবে যে, তারা এটি রেওয়ায়েত করে থাকলে হুবহু শব্দে রেওয়ায়েত করেছেন নাকি অন্য কোনো শব্দে? অন্য শব্দে রেওয়ায়েত করলে দেখতে হবে যে, শব্দের পার্থক্য কি স্বাভাবিক পর্যায়ের নাকি তা অস্বাভাবিক পর্যায়ের?

যদি বিষয়টিকে সে উসতাদ থেকে তার অন্যান্য সিকাহ (বিশ্বস্ত) শাগরেদগণ হুবহু শব্দে উদ্ধৃত করে থাকেন তা হলে যয়িফ রাবির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি সনদে বড় বড় ব্যক্তির নাম থাকে কিন্তু গোটা দুনিয়ায় এই একমাত্র যয়িফ রাবি তার থেকে বিষয়টি রেওয়ায়েত করে থাকে তা হলে এটি সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে দলিল পেশ করার যাবে না।

গভীরভাবে লক্ষ করলে আপনি আবু মিখনাফ ও নাসর বিন মুযাহিমের মতো মিথ্যুক রাবির রেওয়ায়েতে জায়গায় জায়গায় এ ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষ করবেন। এজন্য মুহাদ্দিসগণ তাদের থেকে কিছুই রেওয়ায়েত করেন না।

সন্দেহযুক্ত রেওয়ায়েতের উপর হাফেজ ইবনে কাসির ও আল্লামা ইবনে খালদুন কেন নিরীক্ষণ করেননি?

একটি প্রশ্ন তৈরি হয় যে, হাফেজ ইবনে কাসির ও আল্লামা ইবনে খালদুনের মতো মহান ও বিদগ্ধ ঐতিহাসিকগণ বহু জায়গায় ইতিহাসের

রেওয়ায়েত বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তারা রেওয়ায়েত ও দিরায়াতের মূলনীতি প্রয়োগ করে বহু ক্ষেত্রেই দুর্বল স্থানগুলো (মানুষ যাকে সন্দেহাতীত ও বাস্তব বলে মনে করত) ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বহু স্থানে সন্দেহযুক্ত এবং দুর্বল স্থানগুলো উপেক্ষা করে গেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তা হলে কি তারা এ স্থানগুলো দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন না?

প্রকৃত বিষয় হলো, প্রত্যেক যুগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে। জনসাধারণের মধ্যে প্রতি যুগেই কিছু ভুল ব্যাপক আকার লাভ করে। ওই বিষয় নিয়ে তখন সেই সমাজে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে থাকে। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই একজন বিদগ্ধ গবেষক জনগণের সকল ভুলভ্রান্তি দূর করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন। আমরাও এমনটি করে থাকি। আমাদের সমাজে প্রতিদিন কত ভুলত্রুটি সংঘটিত হচ্ছে! কিন্তু আমরা সবই আমাদের বয়ান, বক্তৃতা এবং লেখালেখিতে তুলে ধরি না। বরং লোকেরা যেগুলোর মধ্যে অধিক পরিমাণে লিপ্ত আমরা সেগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকি। তেমনিভাবে হাফেজ ইবনে কাসির এবং আল্লামা ইবনে খালদুনের মতো মনীষীগণ ইতিহাসের যেসব ভুল-বিচ্যুতির ছড়াছাড়ি লক্ষ করেছেন, তারা সেগুলো নিরসন করার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। আমাদের বর্তমান যুগের অবস্থা অবশ্য কিছুটা ভিন্ন। বর্তমানে সাহাবিদের ইতিহাসে দুর্বল থেকে দুর্বলতর রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দলিল পেশ করা হয়। কিন্তু এই রেওয়ায়েতগুলো দলিল হিসেবে পেশ করার মতো কি না এ ব্যাপারে বিচার-বিশ্লেষণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

ধর্ম যখন ইতিহাসের বর্ণনার উপর ভিত্তিশীল নয় তখন এগুলোর কোনটি সহিহ আর কোনটি যয়িফ তা বিচার করার কী প্রয়োজন?

কেউ বলতে পারে যখন আমাদের দীন-ধর্ম, ঈমান-আকিদা এবং বিধি-বিধানের সাথে ইতিহাসের রেওয়ায়েতের কোনো সম্পর্ক নেই তখন আমরা কেন এগুলো বিচার-বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করতে যাব? আর এর প্রয়োজনই-বা কী?

এ ব্যাপারে আমাদের কথা হলো, ইতিহাসের ছাত্রের জন্য এখন সর্বাবস্থায় এ বিচার-বিশ্লেষণ জানা এক আবশ্যক বিষয়। বর্তমানে

ইতিহাসপাঠকের জন্য ইতিহাস কেবল বিধান নয়; বরং ঈমানের প্রশ্ন হিসেবে সামনে চলে এসেছে। কেননা সে সহিহ ও যয়িফ বর্ণনার পার্থক্যের প্রতি লক্ষ না করতে পারলে তার মনে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বিভিন্ন সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। যার ফলে সে এই মহান ব্যক্তিদের প্রতি আস্থাহীন হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উম্মতের নিকট ইসলাম পৌঁছেছে এ কারণে তাদের প্রতি অনাস্থা তৈরি হলে গোটা ধর্ম সম্পর্কে কুধারণা তৈরি হতে পারে, যা একসময় ইসলাম থেকে বিচ্যুতির কারণ হয়ে যেতে পারে। এই কারণে একশত হিজরি পর্যন্ত বিস্তৃত সাহাবিদের ইতিহাসকে হাদিসের মতো অত্যন্ত যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ করে অধ্যয়ন করা উচিত। মুহাদ্দিসগণ নিজেদের পরিভাষায় সাহাবিদের কাজকর্ম এবং বক্তব্যকে হাদিসের বা আসারের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তাদের কাজকর্ম, বক্তব্য এবং সমর্থনকে শরিয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। এজন্য সাহাবা-সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো অত্যন্ত যাচাই-বাছাই করা হয়।

হাদিসের ক্ষেত্রে যখন সাহাবা-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো এ পরিমাণ যাচাই-বাছাই করা হয় তা হলে তো অবশ্যই সাহাবিদের ব্যক্তিত্ব, তাদের আমানত, কাজকর্ম ও অবদানসমূহও পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে যাচাই-বাছাই করা হবে। যদি বর্ণনাকারীর সন্দেহপূর্ণ হওয়ার কারণে বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সাহাবিদের বক্তব্য গ্রহণ না করা হয় তা হলে সাহাবিদের আদালত এবং দিয়ানতের মধ্যে যেসব জিনিস প্রভাব সৃষ্টি করে সেসব বিষয় সংবলিত রেওয়ায়েতের কোনো রাবি যয়িফ বা সন্দেহপূর্ণ হলে কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা ছাড়াই সেই রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি বলেন, ইতিহাসের ক্ষেত্রে কোনো রাবির গ্রহণযোগ্য হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তার থেকে আকিদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের উপর প্রভাবক তার বর্ণিত ঘটনাবলিকেও কোনো ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতীতই গ্রহণ করে নেওয়া হবে। কোনো একটি বিষয় ইতিহাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হওয়াই সেটা ইতিহাস-সংক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। বরং যদি ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান সংক্রান্ত কোনো বিষয় চলে আসে তা হলে আকিদা-বিশ্বাস ও

বিধি-বিধান বের করার জন্য যে মূলনীতি প্রয়োগ করা হয় অবশ্যই ইতিহাসের রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সেই ধরনের মূলনীতি প্রয়োগ করতে হবে।

প্রকৃত বিষয় হলো, কিছু রাবির ব্যাপারে আলেমগণ বলেছেন যে, বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে আর সিরাত ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে। সিরাত ও ইতিহাসের যেসব ঘটনার প্রভাব আকিদা-বিশ্বাসের উপর পড়ে না, তাদের এ বক্তব্য দ্বারা সেসব রেওয়ায়েতই উদ্দেশ্য। কোন যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছে? তার সৈন্যসংখ্যা কত ছিল? কে তাতে নেতৃত্ব প্রদান করেছে? এতে কাদের বিজয় হয়েছে? কাদের পরাজয় হয়েছে? বলাবাহুল্য, আকিদা-বিশ্বাস এবং বিধি-বিধানের উপর এসব বিষয়ের কোনো প্রভাব পড়ে না। এজন্য এসব বিষয়ে যয়িফ রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু মুশাজারাতে সাহাবা ও আদালতে সাহাবা এ থেকে ভিন্ন। কেননা আকিদা-বিশ্বাসে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। এ সংক্রান্ত কারণে ইসলামের কয়েকটি দল-উপদলও তৈরি হয়েছে। তাই এ বিষয়ে এসব রাবির রেওয়ায়েত কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই বিষয়ে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমার শক্তিশালী দলিলের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[২১]

আকিদার উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লিখিত যত কিতাব রয়েছে, সব অধ্যয়ন করুন। দেখা যাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কিতাব একই ধরনের বক্তব্য পেশ করেছে। তারা সকলে বলেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো গুনাহ প্রকাশ পাওয়া আকিদারই একটি বিষয়। যয়িফ, মুনকাতি কিংবা ইতিহাসের সনদবিহীন কোনো বর্ণনার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হতে পারে না। বিশেষত সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত মুশাজারাতের ক্ষেত্রে এ মূলনীতির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ রাখা আবশ্যক।[২২]

---

[২১] হজরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, ১৩৫

[২২] হজরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, ১৩৯

মুশাজারাতের রেওয়ায়েত ও সাহাবিদের মর্যাদা একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ

হজরত উসমান রা. এর শাসনকালের দ্বাদশ বছর ৩৪ হিজরি থেকে মুসলিমবিশ্ব ফেতনার যুগে প্রবেশ করে, যা কমপক্ষে ছ' থেকে সাত বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। শুরু দু'বছর উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-আন্দোলন দৃশ্যপটে চলে আসে। আন্দোলনের মূল হোতারা পরিশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতাকে মদিনায় রক্তরঞ্জিত করে। এরপর চতুর্থ খলিফা হজরত আলি রা. এর সাথে হজরত তালহা, হজরত যুবাইর, উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কিছু রাজনৈতিক এবং ইজতিহাদি মতভিন্নতা দৃশ্যমান হয়, স্বল্পবুদ্ধির অধিকারী এবং ফেতনাবাজ কিছু লোকের কারণে একসময় যা যুদ্ধে রূপ নেয়।

এই যুদ্ধ তো অবশ্যই সংঘটিত হয়েছিল; কিন্তু কিছু রাবি এই ঘটনাকে ভুল রং চড়িয়ে উল্লেখ করেছে। মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বরাতে উল্লেখ করেন, হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের পর সাবায়িদের প্রোপাগান্ডার ফলে সাহাবিদের উপর ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপের সিলসিলা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই প্রোপাগান্ডার ফলে মুশাজারাতের[২৩] ইতিহাস আর নিরাপদ থাকতে পারেনি।[২৪]

সাবায়িদের প্রোপাগান্ডা প্রকৃতপক্ষে দুধারী তলোয়ারের মতো ছিল। তারা একদিকে হজরত উসমান, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা, হজরত মুয়াবিয়া, হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো প্রবীণ সাহাবিদের বিরুদ্ধে বানোয়াট

---

২৩ হযরত উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিসংবাদ

২৪ হজরত মুয়াবিয়া রা. আওর তারিখি হাকায়েক, ১৩৯

রেওয়ায়েত বর্ণনা করা শুরু করে, অপরদিকে তারা অতিরঞ্জনমূলক মিথ্যা রেওয়ায়েতের মাধ্যমে মানুষদেরকে বুঝাতে থাকে যে, যারা হজরত আলির হাতে বাইয়াত হয়েছে তাদের অধিকাংশই উসমান রা. এর হত্যায় শামিল ছিল। অর্থাৎ তারা আমাদের সাবায়িগোষ্ঠীর লোক। হজরত আলি রা. এর যাবতীয় শক্তি সাবায়িদের হাতেই সীমাবদ্ধ। হজরত আলি রা. এর নিকটবর্তী লোকজন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারীরা উসমান রা. এর হত্যায় শামিল ছিল। হজরত আলি রা. সাবায়িদের কথায় উঠবস করতেন। তারাই ছিল হজরত আলি রা. এর প্রকৃত দল এবং তারাই প্রকৃত মুমিন।

এ ধরনের বানোয়াট বিষয় প্রচার করার পেছনে সাবায়িদের বিভিন্ন কুমতলব নিহিত ছিল। তার একটা হলো, তারা নিজেদেরকে হজরত আলি রা. এর দল এবং তাদের গোষ্ঠীকে একটি হকপন্থি গোষ্ঠী বলে পরিচিত করাতে পারবে। দ্বিতীয়ত, তাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল অধিকাংশ সাহাবির উপর মিথ্যা দোষারোপ করা। মানুষদেরকে বোঝানো যে, হজরত আলি রা. একজন হক খলিফা হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ সাহাবি তার হাতে বাইয়াত হচ্ছে না। বরং কেবল সামান্য সংখ্যক সাহাবি তার হাতে বাইয়াত হয়েছে। এ ধরনের মিথ্যাচারের মাধ্যমে সাবায়িগোষ্ঠী অধিকাংশ সাহাবির উপর দুনিয়ার লোভ এবং তাদের হক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অভিযোগ আরোপ করতে চাচ্ছিল।[২৫]

সাবায়িদের প্রোপাগান্ডার মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছিল। কিছু লোক হজরত উসমান, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা, হজরত মুয়াবিয়া এবং হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো বড় বড় সাহাবির উপর উত্থাপিত আপত্তি প্রতিহত করার প্রয়াস চালায়। তারা বাস্তবিক অর্থেই মনে করতে থাকে যে, হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত-হওয়া অধিকাংশ ব্যক্তিই সাবায়ি ছিল। হজরত আলি রা. এর ক্ষমতা তাদের হাতেই ছিল। এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার শিকার হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, প্রকৃতপক্ষে হজরত আলি রা. এর খেলাফত সন্দেহপূর্ণ। তাদের কেউ কেউ এমনও বলতে থাকে যে, হজরত আলি রা. একজন দুনিয়ালোভী শাসক ছিলেন। তিনি খেলাফতের

---

[২৫] মাওলানা আবদুর রশিদ নোমানি কৃত - নাসেবিয়াত তাহকিক কি ভেস মে, ২৩৯

জিম্মাদারি পালন করার যোগ্য ছিলেন না। তার শাসনামলে সংঘটিত সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের দায়ভার তার কাঁধেই বর্তাবে।[২৬]

এই লোকগুলো সাহাবিদের উপর উত্থাপিত আপত্তি প্রতিহত করতে গিয়ে ভুল পথে চলা শুরু করেছে। সাবায়িরা তো প্রকৃতপক্ষে সাবায়িই ছিল। কিন্তু এই লোকগুলো পরোক্ষভাবে সাবায়ি হয়ে হজরত আলি এবং ধীরে ধীরে তার সাথি-সঙ্গী সাহাবিদের সমালোচনা শুরু করে; বরং তাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে অতিরঞ্জন ও কাটছাট করে। এর ফলে ইতিহাসের রেওয়ায়েতের এক বিশাল অংশ আগাছা ও জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যা অধ্যয়ন করে কোনো ব্যক্তির জন্য সঠিক ফল পর্যন্ত পৌঁছা কঠিন হয়ে যায়।

সাহাবা-যুগের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক পথনির্দেশনা না পাওয়ার কারণে মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয়ে থাকে। যার উত্তর না জানার কারণে বিভিন্ন সময় শুধু সাহাবায়ে কেরাম নয়; বরং গোটা ইসলামধর্মের উপর মানুষের আস্থা নড়বড়ে হয়ে যায়। এজন্য ফেতনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করা একটি আবশ্যক বিষয়। এজন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে ইতিহাসের সঠিক এবং ভুল তথ্যগুলো পৃথক করার এবং সাংঘর্ষিক রেওয়ায়েতগুলোর মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার মূলনীতি ভালোভাবে বুঝতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম মাহফুজ ছিলেন

ইসলামি আকিদা অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম মাসুম না হলেও অবশ্যই মাহফুজ ছিলেন। মাহফুজ থাকার অর্থ এটা নয় যে, কোনো সাহাবি থেকে

---

[২৬] এটা হলো নাসেবিদের চিন্তাধারা। তারা হজরত আলি রা. কে জালেম এবং দুনিয়ালোভী শাসক মনে করে থাকে। তারা মনে করে তিনি নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ করে খেলাফতের দাবি করেছেন। তিনি খেলাফতের পদ লাভের জন্য যুদ্ধ করেছেন। মুসলমানদের হত্যা করেছেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি অক্ষম হয়ে গেছেন। সাথিসঙ্গীরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তারা তার উপর বিজয়ী হয়েছে এবং তাকে হত্যা করে দিয়েছে। (মিনহাজুস সুন্নাহ, ২/৫৯)

নাসেবিদের ব্যাপারে জাহেয কিতাবুল মারওয়ানিয়াতে লিখেছেন, কিছু লোক মুয়াবিয়া রা. এর ব্যাপারে বানোয়াট ফজিলত বর্ণনা করেছে। এগুলো সব মিথ্যা। এক্ষেত্রে তারা বহু দলিল উল্লেখ করে থাকে। (মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪/৪০০)

কখনোই কোনো গুনাহ হতে পারে না; বরং এটা তো কেবল নবীদের বৈশিষ্ট্য। মাহফুজের অর্থ হলো,

১. সাহাবায়ে কেরাম থেকে ভুলত্রুটি হলেও আখেরাতে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবেন না। কেননা তারা সবসময় খুব দ্রুত তাওবা করে নিতেন।

২. দুনিয়াতে তারা সব ধরনের দোষ ও অপবাদের উর্ধ্বে। কেউ কোনো সাহাবিকে কোনো ভুল বা গুনাহের কারণে খারাপ বলতে পারে না। কিংবা তাকে খারাপ মনে করতে পারে না। যদি সহিহ সনদের মাধ্যমে কোনো সাহাবির ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রমাণিত হয় তা হলে আলেমগণ সেই রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করেন না। সহিহ হাদিসের মাধ্যমেই কিছু সাহাবির মদপান, চুরি কিংবা অন্য কোনো কবিরা গুনাহে জড়িত হওয়ার কথা জানা যায়। সহিহ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে কোনো কোনো সাহাবি কর্তৃক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা অবগত হওয়া যায়। এসব রেওয়ায়েত মিথ্যা প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এ ধরনের রেওয়ায়েতের ব্যাপারে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

১. খোলাফায়ে রাশেদিন, আশারায়ে মুবাশশারা, উম্মাহাতুল মুমিনিন এবং প্রথম সারির সাহাবিদের এ ধরনের কাজে জড়িত হওয়ার বিষয়টি কোনো সহিহ সনদের রেওয়ায়েত উল্লেখ নেই।

২. যদি এ ধরনের কোনো রেওয়ায়েত পাওয়া যায় তা হলে তাতে সাধারণত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পূর্ণ অবকাশ থাকে। আগ-পিছের প্রতি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যাবে যে, বাহ্যিক বিষয়টি এই রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্য নয়।

৩. পাঠকের নিকট একটি বিষয় ভুল মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ওই সাহাবির একটি ইজতিহাদ ছিল। অর্থাৎ জমহুর সাহাবি ও তাবেয়ির নিকট সেটা ভুল হলেও ওই সাহাবির জায়গা থেকে তার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী সেটা সঠিক পদক্ষেপ ছিল।

৪. কোনো কোনো বিষয় রাজনৈতিক ও পরিচালনাগত ছিল। যদি ফলের বিচারে সেটা কল্যাণকর প্রমাণিত না হয়ে থাকে তা হলে বেশির চেয়ে

বেশি একে পরিচালনাগত ত্রুটি বলা যেতে পারে। এতে কেউ গুনাহগার সাব্যস্ত হন না।

৫. কিছু সহিহ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে কয়েকজন সাহাবির ব্যাপারে কিছু ভুলত্রুটি বা তাদের গুনাহে জড়িত হওয়ার কথা জানা যায়। তবে এর সংখ্যা অতি সামান্য।

৬. কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে সংঘটিত সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারা মানুষ হিসেবে কোনো গুনাহ করে ফেললেও তারা পবিত্রতম ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালনে বেড়ে উঠেছেন। তাই কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর তাদের তাওবা করে নেওয়াই খুব স্বাভাবিক বিষয়।

৭. তাদের থেকে এসব ভুলত্রুটি সংঘটিত হওয়ার পেছনে আল্লাহর তাকবিনি হেকমত (বিশ্বজগত সংক্রান্ত ঐশ্বরিক রহস্য) সক্রিয় ছিল। একটি হেকমত ছিল মাসুম এবং মাহফুজের মধ্যে পার্থক্য করা। শরিয়তের বিধি-বিধানের প্রশিক্ষণ এবং বাস্তবিকভাবে তা প্রয়োগ করাও একটি হেকমত। কোনো সাহাবি শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ করলেই কেবল শরিয়তপ্রণীত সাজা বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রশিক্ষণ হতে পারে। শরিয়তের সকল দিকের পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং শাস্তিবিধানের বাস্তব প্রয়োগ ও প্রশিক্ষণের জন্য আল্লাহ তায়ালা সাহাবিদের মধ্যে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করেছেন।

৮. এসব ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তারা যেমন মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তেমনিভাবে এগুলো সংঘটিত হওয়ার পরও তারা মহান মর্যাদার অধিকারী এবং পবিত্রই থেকেছেন। তাওবা-ইসতেগফার এবং রোগ-শোক ও বিপদ-মুসিবতের মাধ্যমে তারা কেবল ক্ষমাই লাভ করেননি; বরং তাদের মর্যাদা পূর্বের চেয়ে আরো উঁচু হয়েছে। সহিহ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রমাণিত ভুলত্রুটির ক্ষেত্রে এ কথাগুলো প্রযোজ্য।

মোটকথা এসবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের মহান ব্যক্তিত্বে কোনো ধরনের দুর্বলতা তৈরি হয় না। ব্যক্তিগত জীবন এবং চারিত্রিকভাবে তারা সর্বাবস্থায় পরম সত্যবাদী, পরোপকারী, একনিষ্ঠ এবং পবিত্র ছিলেন। তারা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়

ব্যক্তি ছিলেন। কুরআনুল কারিমের জায়গায় জায়গায় এ বিষয়টি ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদে সাহাবিদের চিত্রায়ণ

সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের ব্যাপারে ইসলামি আকিদার মূলভিত্তি হলো কুরআন এবং সহিহ হাদিস, যা যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান, আখলাক ও চরিত্রের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে,

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

তার সাথি-সঙ্গীরা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।[২৭]

أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।[২৮]

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন।[২৯]

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

তাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে।[৩০]

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।[৩১]

অর্থাৎ তাদের সকল কর্ম-চেষ্টা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে।

এসব গুণের অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম থেকে যদি মানুষ হিসেবে কোনো ভুলত্রুটি কিংবা কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে তা হলে তারা অতি দ্রুত তাওবা-ইসতেগফার করে নিতেন।

---

[২৭] সুরা ফাতাহ, আয়াত ২৯
[২৮] সুরা হুজুরাত, আয়াত ৭
[২৯] সুরা হুজুরাত, আয়াত ৩
[৩০] সুরা মায়িদা, আয়াত ৫৪
[৩১] সুরা ফাতাহ, আয়াত ২৯

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

তারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেশুনে তাতে লিপ্ত থাকে না।[৩২]

তাওবা, ইসতেগফার, মহান সৎকর্ম ও দীনের জন্য তাদের কোরবানির কারণে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের গুনাহ ও ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

আমি অবশ্যই তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেব।[৩৩]

وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৩৪]

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।[৩৫]

এইসব আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত উঁচুমানের অধিকারী ছিলেন। তারা ঈর্ষার পাত্র ছিলেন।

কিছু হাদিস কিংবা ইতিহাসের কিছু রেওয়ায়েতে এর বিপরীতধর্মী বিষয় থাকলে তার অধিকাংশের উপযুক্ত ব্যাখ্যা রয়েছে। তাদের থেকে মানবিক কারণে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে গেছে কিংবা তাদের পক্ষ থেকে যেসব ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত এসেছে আলেমগণের মতে তা তাকবিনি বিষয় ছিল।

---

[৩২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫
[৩৩] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫
[৩৪] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৫
[৩৫] সুরা বাইয়িনা, আয়াত ৮

ইসমতে আমবিয়া ও আদালতে সাহাবার পার্থক্য

জমহুর মুসলমান নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া এবং সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার প্রবক্তা। মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. ইসমতে আমবিয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো নবীগণ আকলি-নকলি সকল গুনাহ থেকে নিষ্পাপ। চার ইমাম এবং উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহ থেকে মাসুম ও নিষ্পাপ।

তিনি সামনে আরও বলেন, তবে কুরআনুল কারিমের বহু আয়াতে বিভিন্ন নবী সম্পর্কে কিছু ঘটনা জানা যায়। যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তাদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হয়েছিল। এই কারণে আল্লাহ তাদের তিরস্কার করেছেন। হজরত আদম আ. এর ঘটনাও এই পর্যায়ের। উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, ভুলে কিংবা বিস্মৃতির কারণে এগুলো সংঘটিত হয়ে গেছে। কোনো নবী জেনে-বুঝে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেননি। আর ভুলে, বিস্মৃতির কারণে কিংবা ভুল ইজতিহাদের কারণে সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাযোগ্য। শরিয়তের পরিভাষায় এগুলোকে গুনাহ বলা হয় না। উপরন্তু ইসলামের বিধান প্রচার-প্রসার, শিক্ষাদান এবং শরিয়তের বিধানের ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা ভুলত্রুটি সংঘটিত হতে পারে না; বরং তাদের ব্যক্তিগত কাজকর্মে এই ভুলত্রুটি সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন আর বড়দের থেকে ছোট কোনো ভুল হলেও সেটা বড়ই মনে করা হয় এজন্য কুরআনুল কারিমে এ সকল বিষয়কে অবাধ্যতা এবং গুনাহ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে তিরস্কারও করা হয়েছে। যদিও প্রকৃত বিচারে এগুলো গুনাহ নয়।[৩৬]

---

[৩৬] মাআরিফুল কুরআন, ১/১৯৫

কেউ কেউ অবশ্য মনে করে থাকেন যে, নবীদের মাসুম হওয়ার অর্থ হলো তারা নবুওয়াতের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল কবিরা গুনাহ থেকে নিরাপদ। তাদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে সগিরা গুনাহও সংঘটিত হয় না। অনিচ্ছাকৃতভাবে তা সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে তৎক্ষণাৎ সতর্ক করার পর তাওবার তাওফিক প্রদান করা হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, জমহুরের মতে তাদের থেকে সগিরা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে। তবে সেই গুনাহে লিপ্ত থাকার ব্যাপারে তারা মাসুম। এরপর তিনি বলেন, কুরআন-হাদিসে জমহুরের উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ তায়ালা আদম আ. এর ব্যাপারে

সাহাবায়ে কেরাম কি মাসুম ছিলেন?

জমহুর মুসলমান সাহাবায়ে কেরামকে আদেল মনে করেন। মাসুম মনে করেন না। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কাউকে মাসুম বলে দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী।[৩৭]

তবে যদি ইসমতে সাহাবা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কোনো ভুল বিষয়ে একত্র হতে পারেন না, তা হলে তা সম্পূর্ণ সঠিক। সকল আলেমের মতে উম্মতে মুহাম্মদি বাতিলের উপর একমত হওয়া থেকে মাসুম। অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যক্তিগণ কোনো গোমরাহির উপর একমত হতে পারে না। তাই সাহাবায়ে কেরামের কোনো ভুল বিষয় অবলম্বন করা আরো বড় অসম্ভব বিষয়। এজন্য অধিকাংশ আলেমের নিকট ইজমায়ে উম্মত শরিয়তের অকাট্য দলিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের মাধ্যমেই ইজমার শরয়ি দলিল হওয়া প্রমাণিত হয়।[৩৮]

বলেছেন, সে তার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। (সুরা ত-হা, আয়াত ১২১)

তবে মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. এর মতে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উল্লিখিত বক্তব্যে নবীদের থেকে সগিরা গুনাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিদগ্ধ গবেষকদের যে অভিমত উল্লেখ করা হলো, প্রকৃতপক্ষে তা সগিরা গুনাহ নয়; বরং সেগুলোকে ইজতিহাদি ভুল কিংবা মতামত ও পরিচালনাগত বিচ্যুতি বলা যেতে পারে।

আল ফিকহুল আকবরে উল্লিখিত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর একটি ইবারত এ মতটি সমর্থন করে। তিনি বলেছেন, নবীগণ সকলেই সগিরা, কবিরা, কুফুরি ও অশ্লীলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। তাদের থেকে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে মাত্র। (আল ফিকহুল আকবর, ৭)

[৩৭] আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, ৪৭

[৩৮] إنَّ اللّٰهَ لا يجمعُ أمَّتي على ضلالةٍ ويدُ اللّٰهِ معَ الجماعةِ ومن شذَّ شذَّ إلى النّار

আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আমার উম্মতকে গোমরাহির উপর একত্র করবেন না। জামাতের উপর তার হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে সে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাহান্নামে পতিত হবে।

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, আলেমদের মতে হাদিসে উল্লিখিত জামাতের উদ্দেশ্য হলো ফকিহ, আলেম ও মুহাদ্দিসদের জামাত। (সুনানে তিরমিজি, ২১৬৭)

অধিকাংশ আলেম সাহাবিদেরকে এ অর্থেই মাসুম মনে করেন। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা করা সাহাবায়ে কেরামের সম্মানে বাড়াবাড়ির শামিল। আলেমগণ এ থেকে নিষেধ করে থাকেন।[৩৯]

সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনো সগিরা ও কবিরা গুনাহ সংঘটিত হয়নি, এমন ধারণা রাখা প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে মাকামে ইসমতে অধিষ্ঠিত করার সমতুল্য; অথচ এটা শুধু নবীদের বৈশিষ্ট্য।[৪০]

কিছু লোক অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করে থাকে যে, সাহাবিদের থেকে কখনো কোনো ধরনের ইজতিহাদি ভুল; বরং ব্যবস্থাপনাগত ভুলও সংঘটিত হতে পারে না। সহিহ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে কোনো সাহাবি কর্তৃক মানবিকপ্রবৃত্তির কারণে কিংবা একান্ত বাধ্য হয়ে ভুলত্রুটি সংঘটিত হয়ে যাওয়ার কথা যখন জানতে পারে তখন তারা নির্দ্বিধায় সেই রেওয়ায়েত অস্বীকার করে বসে। অথচ দুশ্চিন্তা, ভয়ভীতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি মানবপ্রবৃত্তি এবং বাধ্য অবস্থা থেকে স্বয়ং নবীগণও মুক্ত ছিলেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি এমন বিষয়ে নবীদের থেকে বিভিন্ন সময় ইজতিহাদি ভুল হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে ওহির মাধ্যমে তাদের সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। আলেমগণ আদালতে সাহাবার যে অর্থ করেছেন আমাদেরকে সর্বাবস্থায় সেটাই মনে রাখতে হবে।

ইমাম আহমদ অন্য এক সনদে এটি হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে 'মাআ' শব্দের পরিবর্তে 'আলা' শব্দ রয়েছে। (মুসতাদরাকে হাকিম, ৩৯৮; শারহুস সুন্নাহ, ১/২১৫)

[৩৯] আল আকিদা আত-তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা, ৮১

[৪০] ইমাম আবু বকর বাকিল্লানি রহ. এ বিষয়ে দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, খোলাফায়ে রাশেদিন স্বীকার করেছেন যে, তারা মাসুম নন। আবু বকর রা. বলেছেন, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করব ততক্ষণ তোমরা আমার কথা মেনে চলবে আর যখন আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করব তখন তোমাদের জন্য আমার কথা মানা যাবে না। এই তো উমর ফারুক রা. তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয় আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন। যদি আলি না থাকত তা হলে উমর ধ্বংস হয়ে যেত! যদি মুয়াজ না থাকত তা হলে উমর ধ্বংস হয়ে যেত! (তামহিদুল আওয়ায়িল ওয়া তালখিসুদ দালায়িল, ১/৪৭৬)

আদালতের সাহাবার অর্থ

ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় আদালত হলো হাদিসের রাবির আবশ্যক একটি গুণ। কেননা নবীদের শিক্ষা মানুষের নিকট বর্ণনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারি। যেমনভাবে কোনো মোকাদ্দমায় কাজির নিকট সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির জন্য আদেল হওয়া জরুরি তেমনি কোনো হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার রাবি বা বর্ণনাকারীর আদেল হওয়া জরুরি।[৪১]

ফাসকের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[৪২]

আদালতের অর্থ হলো রাবি বা বর্ণনাকারীর আকেল (সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী), বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) ও মুসলমান হওয়া এবং ফিসক (পাপাচার) ও ভদ্রতা পরিপন্থি কার্যাবলি থেকে মুক্ত হওয়া।[৪৩]

আদালতের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বলেন, দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য কিংবা প্রসিদ্ধির মাধ্যমে আদালত প্রমাণিত হবে। তাই আলেমদের নিকট যার আদালত প্রসিদ্ধ হবে, যার ব্যাপারে সকলেই প্রশংসা করবে সে আদেল বলে গণ্য হবে।[৪৪]

---

[৪১] আল মুকিযা ফি ইলমি মুসতালাহিল মুহাদ্দিসিন, ৬৭, ৬৮; তাদরিবুর রাবি, ১/৩৫২

[৪২] ফাতহুল মুগিস, ২/৬০, ৬১; শারহু নুখবাতিল ফিকার, ১/৫১৯

[৪৩] বদরুদ্দীন কিনানি হামাবি কৃত আল মানহালুর রওয়া, ৬৩; নুখবাতুল ফিকার, ২; হাফেয যাইনুদ্দীন আল ইরাকি বলেন, আদালতের শর্ত পাঁচটি : মুসলমান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী হওয়া, ফাসেকি থেকে বেঁচে থাকা তথা কবিরা গুনাহ না করা বা বারবার সগিরা গুনাহ না করা এবং মুরুআত তথা আত্মমর্যাদার পরিপন্থি কাজ থেকে বিরত থাকা। (আত তাকয়িদ ওয়াল ঈযাহ শারহু মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ, ১/৩২৭)

ইমাম শামসুদ্দীন সাখাবি রহ. বলেন, ফিসক হলো কোনো কবিরা গুনাহ করা বা সগিরা গুনাহে অভ্যস্ত থাকা। (আল গায়াহ ফি শারহিল হিদায়া ফি ইলমির রিওয়ায়াহ, ১/১১৯)

মোল্লা আলি কারি রহ. মুরুআতের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, রাস্তায় পেশাব করা, চরিত্রহীন লোকদের সাথে ওঠাবসা করা। মোটকথা, সামাজিকভাবে যেসব কাজ নিন্দনীয় তাতে লিপ্ত হওয়া। (শারহু নুখবাতিল ফিকার, মোল্লা আলি কারি আল হারাবি, ২৪৮)

[৪৪] ইমাম নববি কৃত আত তাকরিব ওয়াত তাইসির, ৪৮, বদরুদ্দীন কিনানি হামাবি কৃত আল মানহালুরু রওয়া, ৬৩

সাহাবিদের আমানত, দিয়ানত, পবিত্রতা, পরহেজগারি, সঠিক পথ অবলম্বন, হেদায়েত, বড়ত্ব, মহত্ত্বের ব্যাপারে কুরআনুল কারিম বিভিন্ন জায়গায় সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এজন্য তাদের আদালতের সাক্ষ্য হিসেবে অন্যকারো প্রয়োজন নেই।[৪৫]

---

[৪৫] অতএব যদি হাদিস কিংবা ইতিহাসের কোনো সহিহ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে কিছু সাহাবির ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলক্রটির কথা প্রমাণিত হয় তবু তাদের ন্যায়নিষ্ঠা এবং সততায় কোনো পরিবর্তন আসবে না। তারা এর মাধ্যমে কস্মিনকালেও ফাসেক বলে গণ্য হবে না। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ভুলের যৌক্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেসব স্থানে ভুলের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, যেমন, কিছু সাহাবির মদপান, চুরি প্রভৃতি গুনাহে জড়িয়ে পড়া, সেসব ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত এবং রাসুলের হাদিসে বর্ণিত সাহাবিদের ফজিলত ও মর্যাদার ভিত্তিতে মেনে নেওয়া হবে যে, তারা অবশ্যই তাওবা করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালাও তাদের ক্ষমা করে দিবেন। এজন্য এসব ক্রটি-বিচ্যুতি এবং গুনাহের পূর্বে তারা যেমন আদেল ছিলেন, এগুলো করার পরও তারা আদেল থাকবেন।

আল্লামা সালাহুদ্দীন দামেশকি আলাবি লেখেন, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল মনীষীর সিদ্ধান্ত হলো সকল সাহাবি আদেল ছিলেন। তাদের ক্ষেত্রে এটাই হলো মূলনীতি। তবে কেউ জেনে-বুঝে ফাসেকি সংক্রান্ত কোনো গুনাহ করলে সেটা ভিন্নকথা। তবে আলহামদু লিল্লাহ তাদের থেকে এ ধরনের কোনো গুনাহের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব যারা রাসুল সা. এর সংস্পর্শের মাধ্যমে আদেল হয়েছেন তাদের আদালতের ব্যাপারে পরবর্তীদের জন্য আলোচনা-পর্যালোচনা এবং অনুসন্ধান চালানোর প্রয়োজন নেই। (তাহকিকু মুনিফুর রুতবাহ লিমান সাবাতা লাহু শারীফুস সুহবাহ, ৬০)

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ আদালতের বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, সাহাবায়ে কেরাম মাসুম ছিলেন না। আবার তারা ফাসেকও ছিলেন না। তাদের থেকে হয়তো কোনো সময় মানুষ হিসেবে দুয়েকবার ভুলক্রটি সংঘটিত হয়ে গেছে; কিন্তু সতর্ক করার পর তারা তাওবা করে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এজন্য এই সকল ভুলের কারণে তারা ফাসেক নন। সাহাবায়ে কেরাম গুনাহকে নিজেদের পলিসি বানিয়ে নিয়েছেন, এই কারণে তাদেরকে ফাসেক আখ্যা দেওয়া হবে, এমন কথা বলা যেতে পারে না। (হজরত মুয়াবিয়া রা. আওর তারিখি হাকায়েক, ১৩০)

আদালতে সাহাবা সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নিরসন

প্রথম সন্দেহ

কেউ কেউ মনে করে যে, সাহাবিদের আদেল হওয়ার অর্থ হলো হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা সত্যবাদী ছিলেন। সাধারণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তাদের আদেল হওয়া আবশ্যক নয়; বরং এক্ষেত্রে তারা ফাসেকও হতে পারেন। কেননা তারা গুনাহ থেকে মাসুম ছিলেন না। তারা এর পক্ষে আকিদার কিতাবের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করে থাকেন।[৪৬]

---

[৪৬] পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ মনীষী সাহাবায়ে কেরামকে আদেল হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই রেওয়ায়েত ও শাহাদাতের ক্ষেত্রে তাদের আদালতের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে না। কেননা তারা ছিলেন উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তবে মানবিক প্রয়োজনে যাদের থেকে চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি আপত্তিকর গুনাহ সংঘটিত হয়েছে সেক্ষেত্রে তাদের আদেল হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তারা এসব গুনাহ থেকে মাসুম ছিলেন। বরং তাদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। তাদের আদেল হওয়ার অর্থ হলো তাদের আদালত সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হবে না। (আল্লামা আবদুর রউফ মুনাবি কৃত আল ইয়াওয়াকিত ওয়াদ দুরার, শরহু নুখবাতিল ফিকার, ২/২১৪)
কিন্তু আদালতের বিষয়ে অনেকেই ভুল ধারণা নিপতিত হয়ে থাকে। তারা মনে করে, গুনাহ না হওয়াটা হলো আদালত। কিন্তু এটা প্রকৃত বিষয় নয়; বরং আদালতের অর্থ হলো ধর্মীয় বিষয়ে বিশ্বস্ত হওয়া। আল্লাহর নিকট তাওবা করার মতো কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের গুনাহ যেমনভাবে ঈমান এবং বেলায়েতের পরিপন্থি নয় তেমনিভাবে এটা আদালতেরও পরিপন্থি নয়। (আল্লামা মাহমুদ আলুসি কৃত সাব্বুল আযাব আলা মান সাব্বাল আসহাব, ১/৩৯৪)
আল্লাহ তায়ালা সকল সাহাবির প্রশংসা করেছেন। তারা সকলেই আদেল ছিলেন। আদালতের অর্থ হলো তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে এবং হাদিস বর্ণনা ও শরিয়তের বিধান বর্ণনার প্রশ্নে আদেল ছিলেন। ইজতিহাদের কারণে তাদের থেকে যেসব বিষয় সংঘটিত হয়ে গেছে এটা আদালতের পরিপন্থি নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিঃশর্তভাবে তাদের প্রশংসা করেছেন। (শায়েখ সালেহ বিন আবদুল আজিজ, আলে শায়েখ কৃত ইতহাফুস সায়িল বিমা ফিত তাহাবিয়া মিন মাসায়িল, ১/৬২৪)
আদালতের অর্থ এটা নয় যে, তারা কেউ কোনো ধরনের ভুলক্রটি বা গুনাহে লিপ্ত হননি; বরং আদালতের বিষয়টি কেবল ধর্মীয় বিষয়াদি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (শায়েখ নাসির আবদুল করিম কৃত মুজমালু উসুলি আহলিস সুন্নাহ, ১০/১৪

মুফতি শফি রহ. এর ভাষায় এই সন্দেহ নিরসন করা হলো। তিনি বলেন, ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের বক্তব্যে আদল এবং আদালতের সারমর্ম হলো, মুসলমান, সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা, কোনো সগিরা গুনাহ বারবার না করা। অধিক পরিমাণ সগিরা গুনাহ অভ্যস্ত না হওয়া। তাকওয়ার শরয়ি অর্থ এটাই। এর বিপরীত বিষয় হলো ফিসক। যার আদালত না থাকার হুকুম দেওয়া হবে তাকে ফাসেক বলা হবে। যারা সাহাবায়ে কেরামের 'উদুল' (পরম নিষ্ঠার অধিকারী) হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের বক্তব্য দ্বারা আদল ও আদালতের এই উদ্দেশ্যই বোঝা যায়।[৪৭]

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. আরো বলেন, কেউ কেউ মাসুম না হওয়া এবং আদেল হওয়ার কথিত বৈপরীত্য থেকে বাঁচার জন্য আদালতের অর্থে কিছুটা সংশোধনী এনে বলেছেন যে, আদালত দ্বারা এখানে সকল গুণ এবং কাজে আদেল হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং শুধু রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে মিথ্যা না বলাই আদালত দ্বারা উদ্দেশ্য। আসলে তাদের এই ব্যাখ্যা অভিধান এবং শরিয়তের উপর একধরনের বাড়াবাড়ি। এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাদের নিজেদের এই সংশোধনী অনুযায়ী কস্মিনকালেও এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কোনো সাহাবি আপন কাজকর্মের ক্ষেত্রে আদালতের অধিকারী নন কিংবা তারা ফাসেক! তারা নিজেরাই অন্যত্র এমন হওয়ার কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪৮]

দ্বিতীয় সন্দেহ

আলেমদের গৃহীত অবস্থানের উপর আপত্তি এবং আক্রমণ করে কিছু ভাই বলে থাকেন যে, মুসলমানরা একদিক থেকে এই আকিদা পোষণ করে যে, সাহাবিরা মাসুম ছিলেন না, তাদের থেকে সগিরা-কবিরা সবধরনের গুনাহ সংঘটিত হতে পারে। কিছু কিছু সাহাবি থেকে তা হয়েছেও। কিন্তু এর পাশাপাশি তারা এই আকিদা রাখেন যে, সাহাবিরা সকলেই আদেল ছিলেন! আদলের অর্থ সবার নিকট এটাই যে, যে ব্যক্তি কোনো কবিরা

---

[৪৭] মাকামে সাহাবা, ৬০

[৪৮] মাকামে সাহাবা, ৫৬

গুনাহে জড়িত নয় কিংবা কোনো সগিরা গুনাহ বারবার করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কবিরা গুনাহ করবে কিংবা বারবার সগিরা গুনাহ করবে তার আদালত-গুণ শেষ হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তিকে ফাসেক বলেই গণ্য করা হবে। যেকোনো সাহাবি থেকে সগিরা-কবিরা গুনাহ সংঘটিত হওয়া তথা ফিসকের আশংকা থাকা সত্ত্বেও তাদের সকলের আদেল হওয়া স্পষ্ট বিপরীতমুখী বিষয়। উপরন্তু তাদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হওয়া প্রমাণিত বিষয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কেউ ফাসেক নন! এই বিপরীতমুখী অবস্থানকে কীভাবে সহিহ আকিদা বলা যেতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরটিও আমরা মুফতি শফি রহ. এর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি।[৪৯] তিনি বলেন, অধিকাংশ আলেম এর উত্তর দিয়েছেন যে, সাহাবিদের থেকে অবশ্যই বড়ধরনের গুনাহ সংঘটিত হওয়ার আশংকা ছিল। এবং বাস্তবে তা হয়েছেও। তবে তাদের এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে একটি পার্থক্য হলো, কবিরা সগিরা প্রভৃতি গুনাহের মাধ্যমে মানুষের আদালত শেষ হয়ে যায়। তারা ফাসেক হয়ে যায়। তাওবার মাধ্যমে এই ক্ষতি পূরণ হয়। যে ব্যক্তি তাওবা করে ফেলে কিংবা কোনোভাবে জানা যায় যে, তার উত্তম কাজের কারণে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন তাকে পুনরায় আদেল এবং মুত্তাকি বলা হবে। যে ব্যক্তি তাওবা করবে না, তাকে আদালতহীন ফাসেক আখ্যা দেওয়া হবে।

এই তাওবার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও সাধারণ মানুষের বিশেষ পার্থক্য হলো, উম্মতের অন্যান্য সদস্য তাওবা করেছে কি না তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তাদের কল্যাণকাজ তাদের মন্দকাজকে মোচন করে দিয়েছে কি না সেটাও জানা নেই। তাদের ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবার কথা জানা না যাবে কিংবা কোনো মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির জ্ঞান অর্জিত না হবে ততক্ষণ তাদেরকে আদালতহীন ফাসেক আখ্যা দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না আর অন্যান্য বিষয়ে তাদেরকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হবে না। কিন্তু

[৪৯] মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. নিজেই সন্দেহটি উল্লেখ করেছেন। আমরা এটা কিছুটা সহজ-সরলভাবে এখানে উপস্থাপন করলাম। এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অনেকেই এই কারণে পেরেশান হয়ে রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের বিষয়টি এমন নয়। তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত সকলেই গুনাহ থেকে তাদের দূরত্ব ও পরহেজগারির বিষয়টি জানেন। কখনো কদাচিৎ দুএকটি গুনাহ হয়ে গেলে কেবল মুখ পর্যন্ত তাদের তাওবা সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তারা বড় থেকে বড় শাস্তির জন্যও নিজেদের পেশ করে থাকেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভে বেঁধে ফেলেন। তাওবা কবুলের ব্যাপারে আত্মপ্রশান্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্থির হতে পারেন না। সাহাবিগণ অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। সাহাবিদের মধ্য থেকে যাদের ব্যাপারে আমরা তাওবার কথা জানি না, তাদের ব্যাপারে আমরা অবশ্যই এ ধারণা রাখবো যে, নিশ্চয় তারা তাওবা করেছেন। দ্বিতীয়ত, সৎকর্ম এবং দীনের প্রতি তাদের অগ্রগামিতার মোকাবেলায় গোটা জীবনের এ দু-একটি গুনাহ আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী মাফ হয়ে যাওয়ার কথা। আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ মোচন করে দেয়।[৫০]

প্রত্যেক মুসলমানের কোনো ধরনের সুস্পষ্ট দলিল ব্যতীত অবশ্যই এই বিশ্বাস রাখা আকল এবং ইনসাফের দাবি; কিন্তু সাহাবিদের ব্যাপারে আমরা শুধু এমন ধারণাই রাখি না; বরং কুরআনুল কারিম আমাদের এই ধারণাকে বারবার সত্যায়ন করেছে। সাহাবিদের বিশেষ বিশেষ জামাতের ব্যাপারে এ ঘোষণা করা হয়েছে। কখনো কখনো পূর্ববর্তী এবং অগ্রগামী সাহাবিদের ব্যাপারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।[৫১]

---

[৫০] সুরা হুদ, আয়াত ১১৪

[৫১] মাকামে সাহাবা, ৫৫-৫৮

কোনো রেওয়ায়েত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের মূলনীতি

রেওয়ায়েত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের মূলনীতি জানা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এ মূলনীতির প্রতি লক্ষ না রাখার কারণে বড় বড় জ্ঞানী-গুণীরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে। কোনো মূলনীতি বা কষ্টিপাথরে যাচাই ব্যতীত রেওয়ায়েত অধ্যয়নের মাধ্যমে যা বুঝা যায় তাকে সঠিক, বিশুদ্ধ এবং গবেষণা বলা হচ্ছে। কিন্তু রেওয়ায়েতের রাবি কে? সে নির্ভরযোগ্য নাকি যয়িফ পর্যায়ের? এটা সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবিদের রেওয়ায়েতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না? কুরআনুল কারিম এবং সহিহ হাদিসের সাথে তার বৈপরীত্য রয়েছে কি না? এটা আকিদার বিষয়ে দলিলযোগ্য কি না? এ ধরনের নানান বিষয় একদম উপেক্ষা করা হচ্ছে!

ফলে একশ্রেণির মানুষ সাহাবিদের দোষত্রুটি সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলো যাচাই-বাছাই ছাড়াই বর্ণনা করছে। এগুলোকে সাহাবিদের আদালতের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে পেশ করতে চাচ্ছে। আর এটার নাম দেওয়া হচ্ছে পক্ষপাতমুক্ত নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণা। এই শ্রেণির লোকেরা উসুলে রেওয়ায়েতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। উসুলে দিরায়াতের মধ্যে শুধু তারা ঘটনার সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ রেখেছে। তাদের মতে সম্ভবপর হলে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে না। একটু ভালোভাবে চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এটা আগাগোড়া মূর্খোচিত, অবৈজ্ঞানিক ও ইসলাম পরিপন্থি বিষয়। এটা মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিরই প্রতিনিধিত্ব করে। এর মাধ্যমে মন চাইলেই যেকোনো রেওয়ায়েত কবুল ও প্রত্যাখ্যান করা যায়।

বাকি রইল সম্ভাবনার পরিসীমার কথা। এক্ষেত্রে কথা হলো, বহু বিষয় সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে বিরোধ বেঁধে যায়। দেখা গেল দুটি সাংঘর্ষিক রেওয়ায়েতের উভয়টি সম্ভবপর, তখন তাদের মূলনীতি অনুযায়ী কোনটি গ্রহণ করা হবে আর কোনটি বর্জন করা হবে? কোনো ঐতিহাসিকের কি আপন খেয়াল-খুশিমতো যেকোনো একটি নির্বাচন করার অধিকার আছে?

উদাহরণত, এক রেওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা যায় যে, হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের সংবাদ পাওয়ার পর হজরত আমর ইবনুল আস রা. অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং এটাকে নিজের কীর্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্য বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, তিনি উসমান রা. এর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি শোকগাথা রচনা করেন। এক্ষেত্রে কেউ যদি দ্বিতীয় রেওয়ায়েত উপেক্ষা করে সম্ভবপর হওয়ায় শুধু প্রথম রেওয়ায়েত গ্রহণ করে তা হলে তার এই কর্মকাণ্ডকে গবেষণা বলা হবে নাকি অন্য কিছু?

মুফতি তাকি উসমানি ইতিহাসের তথ্য যাচাইয়ের যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, তা ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইতিহাসের যেসব কিতাব রয়েছে, তাতে একই ঘটনায় কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। হাদিসের ক্ষেত্রে কোনো রেওয়ায়েত যেভাবে যাচাই-বাছাই এবং বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় ইতিহাসে তেমনটি হয়নি। এর ফলে ইতিহাসের কিতাবে সহিহ-ভুল সকল ধরনের রেওয়ায়েত স্থান পেয়েছে। এতে যেমন সহিহ রেওয়ায়েত রয়েছে তেমনি ভুল রেওয়ায়েত রয়েছে। কারো জন্য কোনো বিষয়ে বাস্তবতায় উপনীত হতে হলে এখন ভালো-মন্দ নির্ণয়কারী মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সঠিক বিষয় যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি জরাহ-তাদিলের (হাদিস বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা ও অনির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাইয়ের শাস্ত্র) মূলনীতি সম্পর্কে অবগত কোনো আলেম জরাহ-তাদিলের মূলনীতির আলোকে এগুলো যাচাই-বাছাই করেন তা হলে সন্দেহ-সংশয়ের বিশাল একটি অংশ সেখানে খতম হয়ে যায়।

এর কারণ হচ্ছে হজরত উসমান রা. এর যুগের শেষদিকে আবদুল্লাহ বিন সাবা ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল। এর পেছনে তার দুটি বড় উদ্দেশ্য ছিল। এক. সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নবিদ্ধ করা। দ্বিতীয়ত মানুষের মধ্যে ভুল রেওয়ায়েত ছড়িয়ে দেওয়া। এই লক্ষ্যে সে বহু ভ্রান্তিপূর্ণ ঘটনা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মুহাদ্দিসগণ জান-প্রাণ দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সাবায়িদের এই কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তারা দুধকে

দুধের স্থানে রেখেছেন। দুধ থেকে পানি পৃথক করে ফেলেছেন। কিন্তু ইতিহাসশাস্ত্রে একাজটি হয়নি। সাবায়িদের বানোয়াট বিষয়াদি একসময় ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সতর্ক ঐতিহাসিকগণ এক্ষেত্রে প্রতিটি রেওয়ায়েতের সনদ উল্লেখ করে দিয়েছেন। ফলে গবেষণার রাস্তা সকলের সামনেই উন্মুক্ত। গবেষণায় আগ্রহীগণ রিজালশাস্ত্রের সাহায্যে এসব রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাই করতে পারেন। কোনো রেওয়ায়েতে সাবায়ি রাবির থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে সাহাবিদের বিষয়ে তার উপর নির্ভর করা যাবে না। কেননা সাহাবিদের ফজিলত, শ্রেষ্ঠত্ব এবং নবীদের পর তাদের গোটা উম্মতের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় হওয়ার বিষয়টি কুরআন এবং বহু অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত। সাবায়িদের প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে কুরআন-হাদিসের এসব সুস্পষ্ট নির্দেশনা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, মুশাজারাত বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক নয়। এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। বাস্তবতা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকার জন্য উক্ত আকিদা পোষণ করা হয় না; বরং যেহেতু ইতিহাসে সহিহ-ভুল, সত্য-মিথ্যা- সকল রেওয়ায়েতের মিশ্রণ থাকে আর যেকেউ এ বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করতে পারবে না, এজন্য জরাহ-তাদিলের মূলনীতি সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তিগণ এ সকল রেওয়ায়েত অধ্যয়ন করে কখনোই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে না। মুশাজারাতে সাহাবা সম্পর্কে বর্ণিত সকল সহিহ রেওয়ায়েত সামনে রেখে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মর্যাদাশীল আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই আকিদা পোষণ করেছেন যে, যদিও জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে হজরত আলি রা. হকপন্থি ছিলেন; কিন্তু তার বিপরীতে হজরত আয়েশা, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমের অবস্থান ভিত্তিহীন ছিল না। তাদের সামনেও শরিয়তের দলিল ছিল। তাদের থেকে সংঘটিত ভুল নিরেট ইজতিহাদি পর্যায়ের ছিল।[৫২]

---

[৫২] ফাতাওয়ায়ে উসমানি, ১/১৭৬, ১৭৭

রাবিদের নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা যাচাই করা জরুরি কেন?

কোনো ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে সংবাদদাতাদের বৈপরীত্য নিরসন করাটা প্রত্যেক যুগেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। যদি কোনো ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদদাতা বিপরীতমুখী চিত্র তুলে ধরেন তখন যেকোনো একজনের কথা কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত মেনে নেওয়া প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

কেউ এ বিষয়টি সমাধানের জন্য বর্ণনাকারীদের সংখ্যা গণনার পন্থা অবলম্বন করতে পারে। অর্থাৎ যদি দু ব্যক্তি একরকম বর্ণনা করে আর চারজন ভিন্ন রকম বর্ণনা করে তা হলে চারজনের কথা মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু এখানে অবশ্য একটি প্রশ্ন দাঁড়াবে যে, শুধু রাবি গণনাই কি যথেষ্ট? রাবিদের আমানতদারি, ব্যক্তিত্ববোধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণ কি দেখা জরুরি নয়? অথচ কোনো ঘটনা সহিহ ও সত্যরূপে পৌঁছার ক্ষেত্রে এগুলোই মূলভিত্তি। চিন্তা করে দেখুন, যদি সততা ও আমানতদারির ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকা দুজন অভিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য সাংবাদিক কোনো রিপোর্ট পেশ করে আর তাদের বিপরীতে সততা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ পাঁচ-ছ'জন সাংবাদিক ভিন্ন রিপোর্ট পেশ করে, তা হলে কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে? নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত সাংবাদিকের কথাই মেনে নেওয়া হবে। তার বিপরীতে দুর্বল গুণাবলির অধিকারী সাংবাদিকদের রিপোট অবশ্যই সন্দেহপূর্ণ মনে করা হবে। এটা যেমন আজকালের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনিভাবে অতীতের ঘটনাবলিও অবশ্যই এই কষ্টিপাথরে প্রয়োগ করতে হবে।

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি এ ব্যাপারে মূলনীতি উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি সাধারণত কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে, কোনো শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ ব্যতীত তার উপর আরোপিত কবিরা গুনাহের অপবাদ মেনে নেওয়া যাবে না। এটাই সুস্থ বিবেকের দাবি।[৫৩]

অতএব যদি কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার ব্যাপারে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী বিশ্বস্ত রাবি একধরনের সংবাদ প্রদান

---

[৫৩] হজরত মুয়াবিয়া রা. আওর তারিখি হাকায়েক, ১৩৩, ১৩৪

করে, অপরদিকে অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী তার বিপরীত চিত্র তুলে ধরে তখন নির্ভরযোগ্য রাবির সংবাদ প্রাধান্য দেওয়াই বিবেকবুদ্ধি, জ্ঞান ও বাস্তবতার দাবি। অতএব সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমাদেরকে কোন বিষয়টি নির্ভরযোগ্য রাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে আর কোনটি দুর্বল রাবি থেকে, অবশ্যই তা লক্ষ রাখতে হবে।[৫৪]

সামাজিক অবস্থান

এ বিষয়টিও চিন্তা করুন, সামাজিকভাবে অত্যন্ত সম্মানিত কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে তখন রেওয়ায়েতের পার্থক্য অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। কারণ, প্রত্যেকেরই নিজ আচার-ব্যবহার, বংশ, পূর্ববর্তী অবদান, লেনদেন, কর্ম-পেশা জীবনপ্রণালি-সহ অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে সমাজে এক বিশেষ অবস্থান তৈরি হয়। তার কল্যাণের দিকগুলো বেশি হলে তাকে ভালো মনে করা হয়।[৫৫]

এই প্রসিদ্ধি ও যশ-খ্যাতি তার বিধিবদ্ধ অধিকার হয়ে যায়, যাকে সামাজিক অবস্থান বলা হয়। পৃথিবীর আদালত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানে আঘাত করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করে থাকে।

মনে করুন, স্কুলের কোনো শিক্ষক উত্তম চরিত্র এবং আমানতদারির দিক থেকে সকলের নিকট প্রসিদ্ধ। বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনদের নিকট সে অত্যন্ত সম্মানিত। এখন যদি কেউ কোনোধরনের শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ ব্যতীত তার বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে, তা হলে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক বা স্কুল-কর্তৃপক্ষ অভিযোগ উত্থাপনকারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারে। বাদি দলিল-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হলে তাকে মানহানির দায়ে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানও সামাজিক অবস্থান সংরক্ষণের অধিকার লাভ করে থাকে। অন্যায়ভাবে কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির খ্যাতি নষ্ট করলে আদালতের পক্ষ থেকে তাকে লক্ষ লক্ষ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা জরিমানা করা হয়। ব্যক্তি মারা গেলেও তার সামাজিক অবস্থান সংরক্ষণের অধিকার বহাল থাকে। তাই কেউ কারো

---

[৫৪] ডাক্তার আকরাম জিয়া উমারি কৃত বুহুসুন ফি তারিখিস সুন্নাতিল মুশাররফা, ২১১

[৫৫] উত্তম গুণাবলির আধিক্যই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২০/৪৬)

মরহুম দাদার দুর্নাম করলে তাকে জেল খাটতে হতে পারে। বর্তমান যুগে সামাজিক মর্যাদা সংরক্ষণ করা যেমন বিবেকবুদ্ধি ও ইনসাফের দাবি, তেমনিভাবে অতীতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদেরও এই মর্যাদা ও সম্মান সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। যারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, সম্মানের পাত্র হয়েছেন, তাদের ব্যক্তিত্বকে কটাক্ষকারী বিষয়াদি একটি অবাস্তব আপত্তিকর বিষয়ের চেয়ে বেশি কিছু মনে না হওয়াই ইনসাফের দাবি। হ্যাঁ, যদি এসব আপত্তির পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকে, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ যদি তা সমর্থন করেন, তা হলে সেটা ভিন্ন বিষয়। অন্যথায় সেই রেওয়ায়েত ভিত্তিহীন আপত্তির চেয়ে বেশি কিছু নয়।

উদাহরণত, ইতিহাসের কিছু রেওয়ায়েতে প্রথম তিন খলিফাকে আত্মসাৎকারী হিসেবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। কিছু রেওয়ায়েতে হজরত আলিকে হজরত উসমান রা. এর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত দেখানো হয়েছে। কেউ হজরত মুয়াবিয়াকে মুনাফিক আখ্যা দিয়েছে। নাউজুবিল্লাহ। বিষয়গুলো সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভবপর বিধায় এগুলো কি চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়া হবে? এগুলো কি ভিত্তিহীন আপত্তি এবং সামাজিক মানহানির পর্যায়ে পড়ে না? যাদের সামাজিক মর্যাদা রয়েছে, সমাজে যারা অত্যন্ত সম্মানিত ও দীনদার বলে পরিচিত, তাদের ব্যাপারে ছড়ানো নেতিবাচক বর্ণনা কি যাচাই-বাছাই করা আবশ্যক নয়? অবশ্যই এই সব রাবির অবস্থা যাচাই করতে হবে। যাচাই-বাছাই না করা পর্যন্ত মহান ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এগুলোকে নিছক অভিযোগ মনে করা হবে। যেমনভাবে বর্তমান সমাজে কোনো সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল কথাই গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়ার মতো বোকামি আমরা করি না তেমনিভাবে অতীতের মহান মনীষীদের ব্যাপারে প্রচলিত গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য সকল রেওয়ায়েত নিশ্চিত বলে মেনে না নেওয়াই কর্তব্য। আলেমদের জন্য অবশ্যই এসব বর্ণনা যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এই মহান মনীষীদের বিরুদ্ধে রাবিদেরকে বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করতে দেখা সত্ত্বেও তাদের থেকে তথ্য পরিবেশনে ভুল হয়েছে কি না সেই তত্ত্ব-তালাশ না করা কোনোক্রমেই গবেষণাধর্মী ও ইনসাফপূর্ণ ইলমি কর্মপন্থা হতে পারে না।

পূর্ববর্তী মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বর্ণনার ক্ষেত্রে যখন উল্লিখিত যাচাই-বাছাই নীতি অবলম্বন করেননি, তবে আমরা কেন তা করতে যাব?

কেউ কেউ মনে করেন যে, অতীতের ঐতিহাসিকগণ যখন সাহাবিদের ব্যাপারে এত সতর্কতা অবলম্বন করেননি, তারা যখন সাহাবিদের দোষক্রটিসংবলিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করে দিয়েছেন তা সত্ত্বেও যখন তাদের ঈমান, আকিদা এবং সাহাবিদের প্রতি আকিদার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়নি তখন আজ আমরা কেন এত সতর্কতা অবলম্বন করব?

প্রকৃত বিষয় হলো, বর্তমান যুগে প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামের শত্রুরা সাহাবিদের বিরুদ্ধে আপন লেখনী ও মিডিয়ার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে আসছে। সাহাবায়ে কেরামের আদালত ও ন্যায়পরায়ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। এটা উপেক্ষা করার মতো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং এটা এখন ঈমান ও আকিদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গুটিকয়েক ঘটনার মাধ্যমে সাহাবিদের আদলতকে প্রশ্নবিদ্ধ না করা হলে হয়তো এ সময় আমাদেরকে এই সকল রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হতো না। বর্তমান জ্ঞানজগতে সাহাবায়ে কেরাম এক অভিযুক্ত জামাত। প্রতিপক্ষ তাদের উপর আপত্তির তির বর্ষণ করে চলেছে। আপত্তির পক্ষে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করছে। এসব আপত্তির উপর উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণের ক্রটি-বিচ্যুতি বের না করা প্রতিপক্ষের দাবি মেনে নেওয়ার নামান্তর। পাড়া-মহল্লার কোনো ঝগড়া-বিবাদে যদি কেউ কাউকে ভীরু, কাপুরুষ, আত্মসাৎকারী, ঘুষখোর বলে অপবাদ দেয়, তা হলে তার কোনো পরোয়া করা হয় না। কিন্তু যখন হুবহু এই আপত্তিগুলোই কোনো আদালতে করা হয় তখন প্রতিপক্ষ নিজেদের দাবি প্রমাণের চেষ্টা করলে তাদের প্রতিটি বাক্য ও দলিলের ক্রটি-বিচ্যুতি বের করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে গোটা বিশ্বের সামনে সাহাবায়ে কেরামের আদালতের সমালোচনা করে তাদের সামাজিক মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। তাই তাদেরকে অভিযুক্তকারী উপাদান ও বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাই করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমরা এক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়িও পছন্দ করি না, যার ফলে নিজেদের অজান্তেই আদালতে সাহাবার পরিবর্তে

আমাদের মস্তিষ্কে ইসমতে সাহাবার ধারণা তৈরি হয়ে যায়; মুহাদ্দিস, ফকিহ ও পূর্ববর্তী মনীষীদের থেকে আস্থা উঠে গিয়ে মানুষ হাদিস অস্বীকারের দিকে চলে যায়।

ইতিহাসের রেওয়ায়েত কীভাবে যাচাই-বাছাই করা হবে?

সংবাদদাতা ও রাবিদের অবস্থা যাচাই-বাছাইয়ের শাস্ত্রকে জরাহ-তাদিলশাস্ত্র, রিজালশাস্ত্র ও ইলমুল ইসনাদ বলা হয়। একটি বিষয় কত মাধ্যমে, কোন কোন ব্যক্তি হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে এগুলো এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের ইলম, আমানতদারি, তাকওয়া এবং স্মরণশক্তি যাচাই করা হয়। মাঝখান থেকে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেল কিনা সেটাও দেখা হয়। এইভাবে কয়েকটি বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো রেওয়ায়েতের শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়ার স্তর নির্ধারণ করা হয়।

যখন একটি পর্যায় পর্যন্ত হাদিস সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়ে যায় তখন রিজালশাস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। মুহাদ্দিসগণ লক্ষ করেন যে, বহু দুর্বল রেওয়ায়েত হাদিসের ভাণ্ডারে শামিল হয়ে গেছে। এজন্য কোন কোন হাদিস শক্তিশালী আর কোনগুলো দুর্বল, কোনগুলো নির্ভরযোগ্য এবং কোনগুলো অনির্ভরযোগ্য, সঠিকভাবে তা বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাবিদের অবস্থা লক্ষ করে তারা নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্যতার স্তর নির্ধারণ করেন। উঁচু পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য রাবিদেরকে তারা 'সিকাতুন' ও 'সাবাতুন', মধ্যম পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য রাবিদেরকে তারা 'সাদুক' ও 'সালেহ' আর অনির্ভরযোগ্য রাবিদেরকে 'মাতরুক', 'হালিক', 'তালিফ' প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে থাকেন। রাবি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য হলে তারা তাকে 'কাজ্জাব' এবং 'দাজ্জাল' বলেন।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নিয়ে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত রাবিদের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এসময়ে হাজার হাজার রাবির বিস্তারিত বৃত্তান্ত সংকলিত হয়। এই সকল কিতাবের সাহায্যে যেকোনো হাদিস বা ইতিহাসগ্রন্থের রেওয়ায়েতের সনদ যাচাই-বাছাই করে তার গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার ফয়সালা করা যায়।

রেওয়ায়েতের স্তর সহিহ, হাসান, যয়িফ

সহিহ : যে রেওয়ায়েতের সমস্ত রাবি সিকাহ তথা বিশ্বস্ত, আমানতদার, তীক্ষ্ম স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি তার সনদ যদি মুত্তাসিল হয় এবং তাতে কোনো ইল্লত (গোপন ত্রুটি) এবং শুজুয (কে নো রাবির আপত্তিকর ভিন্নতা) না থাকে তা হলে তাকে সহিহ বলা হবে। এটা প্রথম স্তরের বর্ণনা।

হাসান : মানদণ্ডের বিচারে যে বর্ণনা সহির চেয়ে কিছুটা নিম্নমানের এবং যয়িফের চেয়ে উঁচু মানের হবে তাকে হাসান বলা হয়।

যয়িফ : যদি রাবির মুখস্থশক্তি দুর্বল হয় কিংবা তার আমানতদারি ও সততা সন্দেহপূর্ণ হয় কিংবা সে ভ্রান্ত আকিদা ও বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি হয় তা হলে তার বর্ণিত রেওয়ায়েতকে যয়িফ বলা হবে। যদি তা একাধিকসূত্রে বর্ণিত হয় তা হলে তাকে হাসান লিগাইরিহি বলা হয় আর হাসান যদি একাধিকসূত্রে বর্ণিত হয় তা হলে তা সহিহ লিগাইরিহি বলা হয়।

যয়িফ রেওয়ায়েতের কিছু প্রকার রয়েছে। উদাহরণত, মুনকার, মুনকাতি ও মাউযু।

মতনে যদি গ্রহণযোগ্য বর্ণনার মতনের (মূলপাঠ) পরিপন্থি কোনো আশ্চর্য বিষয় স্থান পায় তা হলে এই ধরনের যয়িফ রেওয়ায়েতকে মুনকার বলা হয়।

যদি বর্ণনাকারীদের পরম্পরা পূর্ণাঙ্গ না হয়; বরং কোথাও কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায় তা হলে এমন রেওয়ায়েতকে মুরসাল বা মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন সূত্রবিশিষ্ট বর্ণনা) বলা হয়।

মাউযু : যদি সনদে কোনো মিথ্যা বা মনগড়া বিষয় বর্ণনাকারী থাকে আর তার মতন নিশ্চিত এবং অকাট্য রেওয়ায়েতের পরিপন্থি হয়, তা হলে এমন রেওয়ায়েতকে মাউযু তথা মনগড়া আখ্যা দেওয়া হবে। এই ধরনের বর্ণনা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।[৫৬]

---

[৫৬] মাওলানা জফর আহমদ উসমানি কৃত কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস, ৭৮-৮১
স্মরণ রাখতে হবে, সনদের মধ্যে মিথ্যুক রাবি থাকলেই তা বানোয়াট হয়ে যায় না। বরং এর পাশাপাশি অন্যান্য আলামত থাকতে হয়। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই

যয়িফ রেওয়ায়েতের দুর্বলতা কখন দূর হয় আর কখন তা বহাল থাকে?

যদি কোনো রেওয়ায়েত এই কারণে যয়িফ হয় যে, তার রাবির স্মৃতিশক্তি দুর্বল, সনদ বিচ্ছিন্ন কিংবা কোনো রাবি অপরিচিত; এমতাবস্থায় যদি আরেকটি যয়িফ বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায় তা হলে তার দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে। তখন তাকে হাসান লিগাইরিহি গণ্য করা হবে।

কিন্তু যদি রাবির ফাসেক বা পাপাচারী কিংবা মিথ্যুক হওয়ার কারণে সেটি যয়িফ হয়ে থাকে তা হলে অন্য একটি বর্ণনার মাধ্যমে তার সমর্থন মিললেও সেটি শক্তিশালী হয় না; বরং তার দুর্বলতা তখনো বাকি থাকে।[৫৭]

সহিহ ও যয়িফ রেওয়ায়েতের পার্থক্যের ফল কী?

মোটকথা, রাবিদের অবস্থার জ্ঞান একটি কষ্টিপাথর। এর মাধ্যমে রেওয়ায়েতের মান নির্ণয় করা যায়। এর মাধ্যমে বর্ণনার বৈপরীত্য ও মতভিন্নতার ক্ষেত্রে একটি প্রত্যাখ্যান করে অপরটি গ্রহণের রাস্তা বেরিয়ে আসে। সুস্থ বিবেকসম্পন্ন সকলে এটাই বলবে যে, উত্তম রেওয়ায়েতকে (সহিহ) গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে সাংঘর্ষিক দুর্বল (যয়িফ) রেওয়ায়েত বাদ দেওয়া হবে। এর বিপরীতে গিয়ে সহিহ রেওয়ায়েত বাদ দিয়ে যয়িফ রেওয়ায়েত গ্রহণ করা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোনো মানুষের কাজ হতে পারে না।

সহিহ এবং যয়িফ রেওয়ায়েতের পার্থক্যের মূলনীতির প্রতি লক্ষ রাখা হলে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে ইতিহাসের বর্ণনার অধিকাংশ মতভিন্নতা আপনাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কেননা সাহাবিদের ব্যাপারে আপত্তিকর বর্ণনাগুলো যাচাই করলে দেখা যাবে, তার অধিকাংশই সনদের বিচারে যয়িফ। এর মধ্যে সহিহ বা হাসানের সংখ্যা অত্যন্ত কম। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ সকল রেওয়ায়েতের কোনো না কোনো রাবি অবশ্যই অনির্ভরযোগ্য। কেউ হয়তো মিথ্যুক কিংবা জাল হাদিস

নিতান্ত যয়িফ পর্যায়ের সাব্যস্ত হবে। (আল্লামা ইরাকি কৃত শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাযকিরা, ১/৩০৭)

[৫৭] মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন কৃত মুসতালাহুল হাদিস, ৯

তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত। কিছু রাবি বিদআতি, গোমরাহ এবং রাফেজি। তখন এই ধরনের রেওয়ায়েত মতনের সমস্যা এবং সনদের দুর্বলতার কারণে দলিলের প্রশ্নে আপনাতেই অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে।

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি এ ব্যাপারে বলেন, একটি মূলনীতি হলো ইতিহাস কিংবা হাদিসের কোনো যয়িফ বর্ণনার মাধ্যমে যদি কোনো সাহাবির প্রতি দোষারোপ করা হয় তা হলে সেই বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে।[৫৮]

সহিহ সনদে বর্ণিত কোনো রেওয়ায়েতে সাহাবিদের দোষারোপ করা হলে তা গ্রহণ করা হবে কি না?

যদি সাহাবিদের দোষারোপ সম্পর্কিত রেওয়ায়েত সনদগতভাবে শক্তিশালী তথা সহিহ কিংবা হাসান হয় তা হলে সেটা মেনে নেওয়া হবে, নাকি তা প্রত্যাখ্যাত হবে, এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো :

১. এজাতীয় রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করা হবে না। বাহ্যিকভাবে তা গ্রহণ করা হবে আর অন্যান্য সহিহ রেওয়ায়েতের আলোকে তার উপযুক্ত কোনো অর্থ বের করার চেষ্টা করা হবে। অর্থাৎ তার ব্যাখ্যা করা হবে। অবশ্য কোনো রেওয়ায়েত থেকে অনর্থক কোনো উদ্দেশ্য বের করার প্রচেষ্টা চালানো হবে না। বরং রেওয়ায়েতের শব্দে যেসব অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে উপযোগী অর্থ অনুসন্ধান করা হবে।[৫৯]

---

[৫৮] হজরত মুয়াবিয়া রা. আওয়ার তারিখি হাকায়েক, ৪৩

[৫৯] আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামি রহ. লেখেন, কোনো ব্যক্তি সাহাবিদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কিছু শুনতে পেলে তার জন্য বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করা ওয়াজিব। শুধু কোনো এক কিতাবে কিংবা কোনো ব্যক্তি থেকে শুনে তাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না। বরং তার সনদ যাচাই করবে। সনদ সহিহ হলে সাহাবিদের শানের উপযোগী এবং উত্তম ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা হবে। (আস সাওয়াইকুল মুহরিকাহ, ২/৬২১)

তিনি অন্যত্র বলেন সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলির মাধ্যমে তাদের দুর্বলতার ব্যাপারে দলিল পেশ করা জায়েজ নয়। তেমনিভাবে এগুলোর মাধ্যমে কোনো সাহাবির মর্যাদার ব্যাপারে আপত্তি করা কিংবা সাধারণ মানুষকে তাদের ব্যাপারে অযাচিত মন্তব্য করতে উসকানিমূলক কিছু বলার জন্য এগুলো বর্ণনা করা যাবে না। (তাতহিরুল জিনান, ৬৫)

২. যদি এ ধরনের কোনো সহিহ রেওয়ায়েতের শব্দ থেকে কোনো সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য বের করার সুযোগ না হয় তা হলে দেখতে হবে এই সহিহ রেওয়ায়েতটি তার চেয়েও কোনো সহিহ রেওয়ায়েতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না কিংবা মুহাদ্দিসগণ সূক্ষ্ম কোনো কারণে একে আপত্তিকর মনে করেছেন কি না? এমন হলে রেওয়ায়েতটি বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তার সনদ ও মতন আরো অধিক পরিমাণে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ অনুযায়ী চিন্তাভাবনা করে দিরায়াতের মূলনীতির ভিত্তিতে এই রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করা হবে কিংবা প্রত্যাখ্যান করা হবে (দিরায়াতের মূলনীতির বিষয়টি সামনে ব্যাখ্যা করা হবে)।

৩. যদি এ ধরনের সহিহ রেওয়ায়েতের শব্দের কোনো অর্থ ও উদ্দেশ্য বের করার সুযোগ না থাকে আবার অন্য কোনো সহিহ রেওয়ায়েতের সাথেও তা সাংঘর্ষিক না হয়, উপরন্তু এটা যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত হয় তা হলে এক্ষেত্রে সাহাবিদের ভুল মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু অন্য সাহাবিদের মর্যাদা সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলের কারণে না জবানে সাহাবিদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হবে আর না অন্তরে তাদের মর্যাদার সামান্য ঘাটতি হবে। যথাসম্ভব তাদের ভুলকে বিচ্যুতি ও ইজতিহাদি ভুল মানা হবে। যদি এটা সুস্পষ্ট গুনাহ হয়ে থাকে তা হলে একে মানবিকপ্রবৃত্তিবশত সংঘটিত বিচ্যুতি মনে করা হবে।[৬০] যেমন কিছু সহিহ রেওয়ায়েতে কোনো কোনো সাহাবির চুরি করা, মদ পান করা কিংবা ইমামুল মুসলিমিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আলোচনা এসেছে। এই রেওয়ায়েতগুলো বৈপরীত্যমুক্ত। তাই এগুলো অস্বীকার করা যাবে না। কেননা ইসলামি আকিদা অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম মাসুম নন। তাদের দ্বারা ভুলত্রুটি সংঘটিত হতে পারে। তবে এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতির পেছনে তাকবিনি হেকমতের বিষয়টিও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। উদাহরণত, কিছু হেকমত হলো :

- এর মাধ্যমে সাহাবা এবং নবীদের মর্যাদার পার্থক্য করা। অর্থাৎ নবীগণ মাসুম আর সাহাবিগণ মাসুম নন।

---

[৬০] আবদুল করিম বিন খালেদ আল হারাবি কৃত কাইফা নাকরাউ তারিখাল আলি ওয়াল আসহাব, ৩৫

- কিছু মাসআলা-মাসায়েল, যেমন কিসাস, মদপান, চুরি, ব্যভিচার, বিদ্রোহ প্রভৃতি অপরাধের শাস্তি বাস্তবে প্রয়োগ করাও এসব ঘটনা সংঘটনের উদ্দেশ্য।

যাই হোক, গোটা উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত জামাত। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, عفا الله عنهم আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আরো সুসংবাদ শুনিয়েছেন,

رضي الله عنهم ورضوا عنه

আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

দিরায়াতের মূলনীতির উদ্দেশ্য

দিরায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঘটনার যৌক্তিকতা যাচাই করা। কোনো অতিরঞ্জন বা কল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে কি না তার প্রতি লক্ষ করা। দিরায়াতের মাধ্যমে কোনো রেওয়ায়েত শক্তিশালী হলে সেটা তার সমমানের সনদবিশিষ্ট রেওয়ায়েতের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

দিরায়াতের মূলনীতি ফকিহদের কিয়াসের (ইমামগণ কর্তৃক নির্ধারিত যৌক্তিক বিধিবদ্ধ কিছু মূলনীতি) মূলনীতির মতো। আলেমগণ অবগত আছেন যে, কখনো কখনো বিধান সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে বিরোধ ঘটে থাকে। যেমন কিছু সহিহ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কিছু রেওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা যায়, এক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজু করাকে আবশ্যক বলেননি। ফকিহদের কিয়াসের মাধ্যমে এই বৈপরীত্যের সমাধান করে থাকেন। কিয়াস করে তারা একটি রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যেহেতু আগুনে তৈরি খাবার গ্রহণের কারণে অজু ভেঙ্গে যাওয়া কিয়াসবিরোধী; তাই ফকিহগণ অন্য রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তেমনিভাবে দিরায়াতের ক্ষেত্রেও বিপরীতমুখী বর্ণনা

যৌক্তিকভাবে যাচাই করে কোনো একটি রেওয়ায়েত প্রাধান্য দেওয়া হয়।

মনে করুন সনদের বিচারে উভয় রেওয়ায়েত এক সমান; কিন্তু মতন (মূলপাঠ) পরস্পরবিরোধী। যেমন :

১. তাবারির এক রেওয়ায়েতে এসেছে, হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের কারণে হজরত আমর ইবনুল আস রা. আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি গর্ব করে বলেছিলেন, আমি আল্লাহর এমন এক বান্দা, যে সিবা উপত্যকায় থেকেই উসমানকে হত্যা করে ফেলেছে। তিনি এও বলেছেন যে, আমি যখন কোনো যখমকে টার্গেট করি তখন তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলি।

২ তাবারির অপর রেওয়ায়েতে আছে, হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের ফলে হজরত আমর ইবনুল আস রা. অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি শোকগাথাও রচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, সর্বাবস্থায় যুদ্ধ হবে, যে ব্যক্তি তাকে আহত করেছে, আমি অবশ্যই তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলব।

দিরায়াতের মাধ্যমে এই বৈপরীত্যের সমাধান করা হবে। প্রথম রেওয়ায়েতটি সম্পূর্ণ মনগড়া হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা যদি হজরত আমর ইবনুল আস রা. হজরত উসমান রা. কে হত্যার পরিকল্পনা করে থাকেন তা হলে তিনি নিজেই কী করে আপন গোপন ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দিলেন? ষড়যন্ত্রকারীরা তো যথাসম্ভব সংবাদপত্র গোপন করে থাকে। তারা আহাম্মক নয় যে, অন্যের সামনে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক। কেননা, যে ঘটনায় সকল মুসলমান ব্যথিত হয়েছেন, যে ঘটনা অধ্যয়ন করে আজও পর্যন্ত মুসলমানরা ব্যথিত হয়ে থাকেন সেই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় একজন সাহাবি অবশ্যই ব্যথিত হবেন।

এইভাবে আমরা দিরায়াতের মূলনীতির আলোকে একই পর্যায়ের সহিহ বা যয়িফ বিপরীতমুখী দুটি রেওয়ায়েতের কোনো একটি প্রাধান্য দিতে পারি। এক্ষেত্রে অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত রেওয়ায়েতকে রাবির সংশয় কিংবা অন্য কোনো সমস্যাযুক্ত মনে করতে পারি।

দিরায়াতের মূলনীতি প্রণেতা ইবনে খালদুন রহ. ব্যাখ্যা করে বলেন, যদি কোনো সম্প্রদায়ের সংবাদের ক্ষেত্রে নিছক বর্ণনার উপর নির্ভর করা হয় আর তাদের কৃষ্টি-কালচার, রাজনীতি, সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক অবস্থাকে কষ্টিপাথর হিসেবে গ্রহণ না করা হয়, এর পাশাপাশি যদি উপস্থিত বিষয়কে অনুপস্থিত বিষয়ের উপর তুলনা করা হয় তা হলে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি এমনকি সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[৬১]

যয়িফ রেওয়ায়েতের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা

আমরা বলেছি যে, সহিহ কিংবা যয়িফ হওয়াটা মুহাদ্দিসদের একটি পরিভাষা। দুর্বলতার কারণে কোনো যয়িফ রেওয়ায়েত কয়েক প্রকার হতে পারে। কোনোটি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য, আবার কোনোটি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। যয়িফ রেওয়ায়েতের এই শাস্ত্রীয় নীতি বোঝা ব্যতীত ইতিহাসের বর্ণনাসমূহ ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আরজ করা হলো :

১. যখন কোন যয়িফ রেওয়ায়েতে আল্লাহ তায়ালার কোন গুণাবলি, ইসমতে আম্বিয়া, আদালতে সাহাবা বা শরিয়ত গর্হিত কোন বিষয় উল্লেখ থাকবে তখন সেটা প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক।[৬২]

২. যদি যয়িফ রেওয়ায়েতে উল্লিখিত সমস্যা নাও থাকে তবু যৌক্তিক কারণ এবং অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক থাকে না। বরং ইলমের ভিত্তিতে একমাত্র গবেষকগণ সেটা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ আকিদা ও বিধান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে যয়িফ রেওয়ায়েত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে বলেন, কোনো রেওয়ায়েত গ্রহণের অর্থ এটা নয় যে, সেটা অধ্যয়নের সময় বিচার-বিবেচনার সকল নীতির উপর তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে। বরং উদ্দেশ্য হলো, কেবল এই রাবির দুর্বলতার কারণে তার বর্ণনাগুলো প্রত্যাখ্যান করা হবে না। তবে যদি এর বিপরীতে অন্য

---

[৬১] তারিখে ইবনে খালদুন মুকাদ্দামা ১/১৩

[৬২] কাফিজি কৃত আল মুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ, ৭১

কোনো দলিল পাওয়া যায় তা হলে সেগুলো মেনে নেওয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করা হবে না।[৬৩]

৩. যদি যয়িফ রেওয়ায়েতে কোনো মহান ব্যক্তির ইজতিহাদি ভুল, পরিচালনাগত বিচ্যুতি বা মানবিক বোধের জায়গা থেকে কোনো ত্রুটি সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা থাকে তা হলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা জরুরি নয়। ঐতিহাসিকগণ যদি ঘটনার মিল রক্ষা করার জন্য কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে এ ধরনের রেওয়ায়েত গ্রহণ করতে চান, তা হলে সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেটা নেওয়ার অবকাশ রয়েছে।

৪. যয়িফ বর্ণনার উৎসমূল সর্বদা মিথ্যা হওয়া আবশ্যক নয়। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া গেলে তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৬৪]

৫. যদি সহিহ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সামান্য কিছু অংশ প্রমাণিত হয় আর যয়িফ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে সেটা বিস্তারিতভাবে জানা যায়, তা হলে একটি প্রমাণিত মতনের ব্যাখ্যা হিসেবে সেই যয়িফ রেওয়ায়েতকে কবুল করা হবে। যেমন জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফিন কিংবা কারবালার ব্যাপারে কিছু বিষয় সহিহ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে আবার কিছু যয়িফ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, যা ধর্ম এবং সহিহ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তা হলে এক্ষেত্রে সেটা কবুল করতে কোনো সমস্যা নেই।

৬. কোনো উৎসমূল সনদগতভাবে দুর্বল হওয়া এক বিষয় আর সেটা আপত্তিকর হওয়া ভিন্ন বিষয়। হাদিস এবং ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে বহু দুর্বল বিষয় রয়েছে; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সবই অগ্রহণযোগ্য কিংবা আপত্তিকর।

একই পর্যায়ের সাংঘর্ষিক রেওয়ায়েতের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার সর্বোত্তম পন্থা

আমরা পূর্বে এটি স্পষ্ট করে এসেছি যে, সহিহ রেওয়ায়েতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যয়িফ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে দলিল দেওয়া যাবে না। এখন

---

[৬৩] হজরত মুয়াবিয়া রা. আওয়ার তারিখি হাকায়েক, ১৩৫ পৃষ্ঠার টীকা

[৬৪] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ২/৫০১

একটি প্রশ্ন হলো, কোনো কোনো সময় একই বিষয়ে দুটি বিপরীতমুখী রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যা শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়ার বিচারে সমপর্যায়ের। উভয়টির সনদ হয়তো সহিহ হয়ে থাকে কিংবা যয়িফ। সনদের বিচারে এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া যায় না। যখন একই ঘটনায় একই পর্যায়ের কিছু রেওয়ায়েতে সাহাবিদেরকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় আবার অন্যত্র হুবহু ওই ধরনের রেওয়ায়েতে তাদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে পেশ করা হয় তখন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। মোটকথা, একই বিষয়ে সমপর্যায়ের বিপরীতমুখী বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা কোনটি গ্রহণ করব এবং কোনটি বাদ দেব?

এ বিরোধ সমাধানের সম্ভাব্য চারটি পদ্ধতি হতে পারে।

১. ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ একই ঘটনায় একই সঙ্গে বিপরীতমুখী দুটি বর্ণনা গ্রহণ করা হবে। বলাবাহুল্য, এটা অযৌক্তিক পদ্ধতি। বিবেকবুদ্ধির অধিকারী কেউ কখনো কোনো বিষয়ে এমনটা করতে পারে না।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, উভয় রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু এটা ইলমি পদ্ধতি নয়। কেননা দুই বিপরীতমুখী বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই যেকোনো একটি সঠিক হবে এবং অপরটি ভুল হবে। উভয়টি প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া একটি জটিল বিষয় থেকে কোনোমতে জান বাঁচিয়ে পালানোর নামান্তর।

৩. তৃতীয় পদ্ধতি, কুরআন মাজিদে সাহাবিদের যেভাবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে তার বিপরীত হবে; অর্থাৎ যাতে সাহাবিদের নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেটা গ্রহণ করা হবে এবং যাতে কুরআন অনুযায়ী সাহাবিদের বিষয়ে উত্তম কোনো বর্ণনা পেশ করা হয়েছে সেটা প্রত্যাখ্যান করা হবে। বলাবাহুল্য, একজন মুসলমান কখনোই এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে না। কেননা তারা কুরআনের উপর ঈমান রেখে থাকে। এমনকি সুস্থ বিবেকের অধিকারী কোনো অমুসলিমও এই পন্থা অবলম্বন করা পছন্দ করবে না। কেননা তারাও কুরআনের জ্ঞানবিজ্ঞানের অকাট্যতা মান্য করে থাকে। বিশেষ কোনো কারণে সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তিই কেবল এ পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

৪. চতুর্থ পদ্ধতি হলো, যে রেওয়ায়েতটি কুরআনুল কারিমে সাহাবায়ে কেরামের চিত্রায়ণের প্রতিনিধিত্ব করবে তা গ্রহণ করা হবে আর এর বিপরীতটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে এই চতুর্থ পদ্ধতি সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও নিরাপদ। কেননা এর মাধ্যমে সকল বিষয়ের সমাধান হতে পারে। আর অন্যান্য সকল পদ্ধতি দলান্ধতা ও মূর্খতা। এর মাধ্যমে কোনো সমাধানে পৌঁছার পরিবর্তে বিষয়টি আরো ঘোলাটে হয়ে যাবে।

এই চতুর্থ পদ্ধতি কুরআনুল কারিম দ্বারা সমর্থিত। কুরআনুল কারিমের সততার ব্যাপারে অমুসলিমরা পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। হাজার হাজার বড় বড় অমুসলিম গবেষক কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়া স্বীকার না করলেও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে একে সবচেয়ে নিখুঁত ও নিরাপদ প্রমাণ মনে করে থাকে। কেননা এর কোনো অক্ষরে আজ পর্যন্ত বেশকম হয়নি। এ কারণে ইতিহাসের যেই তথ্য কুরআন দ্বারা সমর্থিত হবে তা অবশ্যই অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত হবে।

শিয়া ও নাসেবিদের বর্ণনার মান

কিছু কিছু শিয়া ও নাসেবির ব্যাপারে কট্টর দলান্ধ, রাফেজি, কাজ্জাব, দাজ্জাল প্রভৃতি সুস্পষ্ট হুকুম লাগানো হয়নি। আবার তাদের ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক মন্তব্যও করা হয়নি। হতে পারে শুধু হজরত উসমান রা. কে হজরত আলি রা. এর উপর শ্রেষ্ঠত্বদানের কারণে কিংবা ফজিলত প্রদান ও প্রীতির কারণে তাদেরকে শিয়া বলা হয়েছে। আবার হতে পারে যে, তারা মূলত রাফেজি এবং কাজ্জাব। এমনও হতে পারে যে, তারা হজরত আলিকে গালিগালাজকারী নাসেবি। আবার এটা অসম্ভব নয় যে, শুধু রাজনৈতিক বিষয়ে তারা শামের অধিবাসীদের মতো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে। রেওয়ায়েত ও ঘটনা যাচাই-বাছাইয়ের মূলনীতির আলোকে লক্ষ করলে মুশাজারাতে সাহাবার ক্ষেত্রে তাদের রেওয়ায়েতগুলো অবশ্যই সন্দেহযুক্ত হবে। বিশেষত শিয়া হওয়া ছাড়াও যখন রাবির সন্দেহযুক্ত হওয়ার পক্ষে অন্যান্য আরো দলিল পাওয়া যাবে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য রেওয়ায়েত বা দলিলের মাধ্যমে তার বর্ণিত বিষয়টি সত্য প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ এই রেওয়ায়েতকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া হবে না।

ইতিপূর্বে আমরা মুহাদ্দিসদের একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছি যে, বিদআতির রেওয়ায়েত তার বিদআতের সমর্থন যোগালে তা কবুল করা হবে না। কেননা, দার দলান্ধতার ভিত্তিতে কোনো দুর্বল বিষয়কে যাচাই-বাছাই ব্যতীত বর্ণনা করা কিংবা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলা এবং সহিহ কোনো রেওয়ায়েতে নিজের পক্ষ থেকে মিশ্রণ করার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এই সকল সন্দেহ এক্ষেত্রেও বিদ্যমান। যখন কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি অন্য দলের মনীষীদের বিপরীত কোনো নেতিবাচক এবং আশ্চর্যজনক রেওয়ায়েত বর্ণনা করে তখন সেটা সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। এই মূলনীতির ভিত্তিতে রাজনীতি এবং চিন্তাদর্শনের ক্ষেত্রে হজরত আলির প্রতিপক্ষ দল মারওয়ানি বা নাসেবি রাবিদের রেওয়ায়েত- যাতে হজরত আলি, সাহাবায়ে কেরাম কিংবা বনু উমাইয়ার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী সাহাবায়ে কেরামকে (যেমন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর) দোষারোপের বিষয় পাওয়া যাবে, সেটা সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে। বিশেষত যখন তা সন্দেহযুক্ত হওয়ার পেছনে আরও দলিল বিদ্যমান থাকবে তখন সেটা অবশ্যই সন্দেহ ও প্রশ্নবিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাইয়ের এই নিষ্ঠাপূর্ণ মূলনীতি মানা সকলের জন্য অপরিহার্য

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, এ মূলনীতি বিশেষ কোনো চিন্তাধারার অধিকারীদের জন্য নাকি দলমত নির্বিশেষ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? আমাদের বক্তব্য হলো, এটি একটি নিষ্ঠাপূর্ণ মূলনীতি, প্রকৃতপক্ষে যা প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মানুষের উপকারে আসতে পারে। শিয়া-নাসেবিই নয়; বরং অমুসলিমরাও এই মূলনীতির যৌক্তিকতা বুঝতে পারবে। সকল নিষ্ঠাবান ব্যক্তিই স্বীকার করবে যে, ইতিহাসের রেওয়ায়েত চোখ বন্ধ করে কবুল করা উচিত নয়। যদি ঐতিহাসিকদের এসব রেওয়ায়েত কোনোধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই ব্যতীত সনদগতভাবে যয়িফ কিংবা তাতে সাহাবিদের সমালোচনা থাকলেও গ্রহণযোগ্য মেনে নেওয়া হয় তা হলে ইতিহাসের রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে হজরত আলি, হজরত হাসান, হজরত হুসাইনসহ অন্যান্য সম্মানিত সাহাবির ব্যাপারে যেসব আশ্চর্য আশ্চর্য, অবাঞ্ছনীয়; বরং অবমাননাকর রেওয়ায়েত সামনে আসবে সেগুলোর আগাগোড়া সবই কি মেনে নেওয়া হবে?

কিছু প্রসিদ্ধ যয়িফ ও সিকাহ রাবি একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

যয়িফ (দুর্বল) ও সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবির সংখ্যা হাজার হাজার। নাকিদগণ (রাবিদের অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণকারী উঁচুমাপের শাস্ত্রজ্ঞ আলেম) তাদের সম্পর্কে ভালো জানেন। তবু আমরা রিজালশাস্ত্রের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক তৈরি করার জন্য সাহাবা-সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের বর্ণনার বিশাল ভাণ্ডার যে এগারোজন রাবির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, আমরা তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

১. লুত বিন ইয়াহইয়া আবু মিখনাফ (মৃত্যু : ১৫৭ হিজরি)

২. মুহাম্মদ বিন সায়েব আল কালবি (মৃত্যু : ১৪৬ হিজরি)

৩. হিশাম বিন মুহাম্মদ বিন সায়েব কালবি (মৃত্যু : ২০৪ হিজরি)

৪. মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকিদি (মৃত্যু : ২০৭ হিজরি)

৫. উমর ইবনে শাব্বা (মৃত্যু : ২৬২ হিজরি)

৬. ইবনে শিহাব যুহরি (মৃত্যু : ১২৪ হিজরি)

৭. আবুল হাসান মাদায়েনি (মৃত্যু : ২২৫ হিজরি)

৮. মুহাম্মদ বিন সা'দ (মৃত্যু : ২৩০ হিজরি)

৯. খলিফা বিন খাইয়াত (মৃত্যু : ২৪০ হিজরি)

১০. মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃত্যু : ১৫১ হিজরি)

১১. সাইফ বিন উমর (মৃত্যু : ১৮০ হিজরি)

নিতান্ত দুর্বল চার রাবি

এদের মধ্যে প্রথম চারজন রাবি- আবু মিখনাফ, ইবনে সায়েব কালবি, হিশাম কালবি ও ওয়াকিদি নিতান্ত দুর্বল। তাদের বর্ণনাগুলো বানোয়াট, মনগড়া এবং মিথ্যা মিশ্রিত। পাশাপাশি এদের মধ্যে আবু মিখনাফ, মুহাম্মদ বিন সায়েব কালবি এবং হিশাম কালবি এই তিনজন জরাহ-তাদিলের ইমামদের নিকট নিরেট শিয়া ও রাফেজি। আর ওয়াকিদিকে

জরাহ-তাদিলের অধিকাংশ ইমাম হাদিসের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য এবং ইতিহাসের এক বড় অংশ পর্যন্ত তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে থাকেন। তদুপরি ওয়াকিদির বহু রেওয়ায়েতে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে, যেগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড় করানো কঠিন বিষয়। তার কিছু রেওয়ায়েত ইতিহাসের সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের বিপরীত। এখন আমরা এই চারজন রাবির ব্যাপারে জরাহ-তাদিলের ইমামগণের বক্তব্য উল্লেখ করব।

১. লুত বিন ইয়াহইয়া আবু মিখনাফ

ইবনে আদি তার ব্যাপারে বলেছেন,

شيعي محترق صاحب اخبارهم

সুস্পষ্ট শিয়া। সে শিয়াদের হাদিস বর্ণনা করে থাকে।

হাফেজ জাহাবি বলেছেন,

لا يوثق به

তার উপর আস্থা রাখা যায় না।

ইবনে মাইন বলেছেন,

ليس بشئ

তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।[৬৫]

২. মুহাম্মদ বিন সায়েব আল কালবি

তার ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার বলেন,

متهم بالكذب ورمي بالرفض

মিথ্যা বলায় অভিযুক্ত এবং তাকে রাফেজি বলা হয়েছে।[৬৬]

৩. হিশাম বিন মুহাম্মদ বিন সায়েব কালবি

তার ব্যাপারে ইবনুল আসাকির বলেন,

رافضي ليس بثقة

সে একটা রাফেজি এবং অনির্ভরযোগ্য।

---

[৬৫] মিযানুল ইতিদাল, ৩/৪১৯

[৬৬] তাকরিবুত তাহযিব, জীবনী নং ৫৯০১

আল্লামা জাহাবি বলেন,

لا يوثق به

তার উপর আস্থা রাখা যায় না।[৬৭]

৪. মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকিদি

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর ইতিহাসের রাবিদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকিদি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার কিতাব এবং লিখিত পুস্তিকাসমূহে গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী বিষয় রয়েছে। কিন্তু তিনি রেওয়ায়েত জমা করার ক্ষেত্রে মূলনীতি অনুসরণ করেননি। এজন্য তার সংকলিত তথ্যে বহু অদ্ভুত, অলীক ও বানোয়াট বিষয় শামিল হয়ে গেছে।[৬৮]

এই অগ্রহণযোগ্য বিষয়ের আধিক্যের কারণে জরাহ-তাদিলের ইমামগণ ওয়াকিদির ব্যাপারে কঠোর মত ব্যক্ত করেছেন।[৬৯]

---

[৬৭] মিযানুল ইতিদাল, ৪/৩০৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৪৬২

[৬৮] ওয়াকিদির কিতাবগুলো বিভিন্ন মানের। যেমন আলমাগাজি কিতাবটি বড় বড় তিন খণ্ডে রচিত হয়েছে। এর অধিকাংশ বিষয় হাদিস, সিরাতের অন্যান্য উৎস; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের রেওয়ায়েতের অনুকূল। পক্ষান্তরে তার অন্যান্য কিতাব আল জামাল, কিতাবুস সিফফিন (যা মুশাজারাত সংক্রান্ত) সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির। অধিকাংশ বিষয়ই সন্দেহপূর্ণ। এজন্য কিছু কিছু গবেষক, যেমন, আল্লামা যিরিকলি রহ. এর মতে, ওয়াকিদির দিকে এই কিতাবের সম্বন্ধ করাটাই ভুল। তবে কিতাবুল মাগাজি এবং তাবাকাতে ইবনে সাদে উল্লিখিত রেওয়ায়েতগুলো তার প্রতি সম্বন্ধ করা নিঃসন্দেহে ঠিক আছে।

[৬৯] ইমাম আহমদ বিন হামবল বলেছেন, সে মিথ্যুক। হাদিস ওলটপালট করে। ইবনে মাঈন বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। তার রেওয়ায়েত লেখা হবে না। ইমাম নাসায়ি বলেছেন, সে হাদিস বানিয়ে থাকে। ইমাম বুখারি বলেছেন, সে পরিত্যাজ্য। ইমাম দারাকুতনি বলেছেন, তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনে আদি বলেছেন, তার রেওয়ায়েত সংরক্ষিত নয়। ইমাম শাফেয়ি বলেছেন, ওয়াকিদির কিতাবগুলো মিথ্যা। (মিযানুল ইতিদাল, ৩/৬৬২-৬৬৩)

কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, ওয়াকিদির সকল রেওয়ায়েত চোখ বন্ধ করে মিথ্যা বলে দেওয়া ইনসাফপূর্ণ কথা নয়। সিরাত ও সাহাবিদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার রেওয়ায়েত বড় বড় ইমামগণ গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ির মুসনাদে সিয়ার ও মাগাজি সংক্রান্ত একটি পূর্ণ অধ্যায় ওয়াকিদির রেওয়ায়েত দিয়ে পূর্ণ। শুধু এটাই নয়; বরং ইমাম শাফেয়ি বিধানের ক্ষেত্রেও ওয়াকিদির কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। (মুসনাদুশ শাফি, ৩৫৩)

এই সমস্ত মতের ভিত্তিতে ইমাম জাহাবি রহ. ফল বের করেছেন যে,

استقر الاجماع على وهن الواقدي

ওয়াকিদির দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।[৭০]

স্মরণ রাখতে হবে যে, তারিখে তাবারি, তাবাকাতে ইবনে সা'দ এবং আনসাবুল আশরাফের মতো ইতিহাস বিশ্বকোষে মুহাম্মদ কালবি, হিশাম কালবি, আবু মিখনাফ ও ওয়াকিদি থেকে হাজার হাজার বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে। যার অনেকগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। শিয়া, নাসেবি, খারেজি এবং প্রাচ্যবিদরা এসব রেওয়ায়েত বিশেষ এজেন্ডা নিয়ে জনসম্মুখে পেশ করে থাকে। বর্তমানে ইতিহাসের ছাত্ররা গবেষণার পরিবর্তে ভাসা ভাসা অধ্যয়ন করার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এই চারজনের রেওয়ায়েত দ্বারা সাহাবিদের ব্যাপারে বিরূপ ধারণা ও মন্তব্য করতে থাকে। অথচ মূলনীতির আলোকে আদালতে সাহাবার বিপরীতে এসব রেওয়ায়েত দলিলযোগ্য হতে পারে না।

অবশিষ্ট সাতজন রাবির অবস্থা

এখন অবশিষ্ট সাত রাবির ব্যাপারে জরাহ-তাদিলের ইমামদের অভিমত উল্লেখ করা হচ্ছে।

৫. উমর বিন শাব্বাহ

১৭৩ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৯০ বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। ২৬২ হিজরিতে ইনতেকাল করেন। আমাদের উল্লিখিত

তেমনিভাবে ইমাম তাহাবি হাদিস এবং ফিকহের কিছু সূক্ষ্ম বিষয় সমাধানের জন্য ওয়াকিদির বক্তব্য সহায়ক হিসেবে এনেছেন। (শরহে মাআনিল আসার, হাদিস ৬; শরহে মুশকিলুল আসার, হাদিস ৩২, ১৪৮৭, ২১৯৮, ২৩৭৮)

ওয়াকিদির ব্যাপারে যেমন নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে তেমন ইতিবাচক মন্তব্যও রয়েছে। হাফেজ জাহাবি রহ. তার ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, তা সত্ত্বেও সাহাবিদের ইতিহাস ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে অবশ্যই ওয়াকিদির প্রয়োজন রয়েছে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৪৫৫)

মোটকথা, ওয়াকিদি রাবি হিসেবে যয়িফ। তার রেওয়ায়েত দ্বারা শর্তসাপেক্ষে উপকৃত হওয়া যায়। কোন কোন শর্তে যয়িফ রাবিদের রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হবে আর কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে-যথাস্থানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

[৭০] তাহযিবুত তাহযিব, ৭/৪৬০, আল জারহু ওয়াত তাদিল, নং, ২৪; তাহযিবুল কামাল, ২১/৩৯০

এগারোজন রাবির মধ্যে তিনি সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে মাজাহর উসতাদদের একজন। ইমাম দারাকুতনি তার ব্যাপারে বলেন, সে সিকাহ ও নির্ভরযোগ্য। খতিব বাগদাদি তার ব্যাপারে এই মন্তব্যই করেছেন।

ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইবনে আবি হাতেম তার ব্যাপারে বলেছেন, সুদুক (পরম সত্যবাদী)।[৭১]

৬. ইমাম ইবনে শিহাব যুহরি

ইমাম ইবনে শিহাব যুহরি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করেছেন। ৫৮ হিজরিতে তার জন্ম হয়েছে। তিনি হাদিসের বড় ইমাম এবং সিরাত ও ইতিহাসের বড় হাফেজ ছিলেন। তার থেকে হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি এবং ইমাম মুসলিমও তার রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ তাকে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম তাকে সিকাহ মেনেছেন।[৭২]

তা সত্ত্বেও তার কিছু রেওয়ায়েত চিন্তাভাবনা করার মতো। তিনি আপন জন্মের (৫৮ হিজরি) পূর্বে সংঘটিত বহু ঘটনা সরাসরি বর্ণনা করে থাকেন। যেমন: তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, খেলাফতে রাশেদার অবস্থা, জঙ্গে জামাল এবং জঙ্গে সিফফিনের ঘটনা প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরি বহু ক্ষেত্রে যার থেকে রেওয়ায়েতটি শুনেছেন, তার কথা উল্লেখ করেন না। মুহাদ্দিসদের মূলনীতি অনুযায়ী এটাকে মুরসাল বা মুনকাতি (সূত্রবিচ্ছিন্ন) বলা হয়। এইজাতীয় সনদের মান দুর্বল হয়ে যায়।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইতিহাসের খুটিনাটি বিষয়ে বহু যয়িফ রেওয়ায়েতও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে; কিন্তু যদি কোনো রেওয়ায়েতে আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক বিষয় উল্লেখ থাকে তা হলে চিন্তাভাবনা ছাড়াই নির্দ্বিধায় তা বিশ্বাস করা যাবে না। ইমাম যুহরির কিছু

---

[৭১] তাহযিবুত তাহযিব, ৭/৪৬০; আল জারহু ওয়াত তাদিল, নং, ২৪; তাহযিবুল কামাল, ২১/৩৯০

[৭২] জাহাবি বলেছেন, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, জামানার ইমাম। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৩২৬)

কিছু রেওয়ায়েতে সাহাবিদের ব্যাপারে কিছু আজব বিষয় উল্লেখ হয়েছে। ইমাম যুহরি যখন নিজে এগুলো প্রত্যক্ষ করেননি তখন তিনি কীভাবে কার থেকে শ্রবণ করে এ বিষয়গুলো বর্ণনা করলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তিনি যার থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, নিজেই তার কথা উল্লেখ করেননি। এই কারণে পরবর্তীদের জন্য রাবি যাচাই-বাছাই করার সুযোগ নেই। ফলে সনদটি মুরসাল বা মুনকাতি হয়ে গিয়ে এর মধ্যে অবশ্যই এক ধরনের দুর্বলতা চলে আসে। এজন্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান রহ. বলেন, যুহরির মুরসাল রেওয়ায়েত বাতাসের মতো।[৭৩]

৭. আবুল হাসান মাদানি আলি বিন মুহাম্মদ

---

[৭৩] আল জারহু ওয়াত তাদিল, ১/২৪৬

এখানে আমাদের একটি বিষয় বুঝতে হবে যে সুনান ও আহকাম সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের ন্যায় ইবনে শিহাব যুহরি থেকে বর্ণিত ইতিহাসের অধিকাংশ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য। যদিও সেটা মুরসাল হয়; তবু তা গ্রহণ করা হবে। শুধু যেসব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিরূপ ধারণার কোনো বিষয়ে চলে আসবে, তা আমরা আপত্তিকর মনে করছি। সনদের দুর্বলতা এবং সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে তখন বিষয়টি যাচাই-বাছাই করতে হয়।

এমনকি নির্ভরযোগ্য রাবিদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইমাম যুহরির কিছু মুত্তাসিল সনদের রেওয়ায়েতকে আমাদের মনীষীগণ নিছক ধারণা বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন : হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর নিকট বাইয়াত হওয়ার ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. এর ছয় মাস বিলম্ব করাটা সহিহ বুখারিতে (৪২৪০) ইমাম যুহরি থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। গবেষক আলেমগণ এটাকে বর্ণনাকারীর ধারণা বলে উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারি, ৭/৪৯৫)

কেননা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবির থেকে বর্ণিত আছে, হজরত আলি রা. তৎক্ষণাৎ আবু বকর রা. এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। (মুসতাদরাকে হাকিম, ৪৪৫৭, বাইহাকি কৃত সুনানুল কুবরা, ১৬৫৩৮)

মোটকথা, সাধারণভাবে ইবনে শিহাব যুহরি রহ. এর বর্ণনাগুলো, বিশেষত যখন সেটা মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হবে, তা সন্দেহযুক্ত নয়। কেউ কেউ এক্ষেত্রে খুব কঠোরতা করেছেন। তারা ইবনে শিহাব যুহরিকে পরিচয় গোপনকারী তাকিয়াবাজ রাফেজি বলেছেন। এর মাধ্যমে তারা যুহরির এমন কিছু রেওয়ায়েতও বানোয়াট আখ্যা দিয়েছেন, ইমাম বুখারিও যা গ্রহণ করেছেন। যেমন হাদিসুল কিরতাসের বিষয়টি। (রাসুল সা. এর মৃত্যুশয্যায় খাতা-কলম নিয়ে আসতে বলার হাদিস) যাতে হজরত উমর রা. বলেছেন, আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব যথেষ্ট। (সহিহ বুখারি, ১১৪)
তাদের এজাতীয় গবেষণাকে হাদিস অস্বীকারের প্রথম পদক্ষেপ মনে করা উচিত।

ইবনে মাইন রহ. তাকে সিকাহ বলেছেন। হাফেজ জাহাবি বলেছেন, তিনি হাফেজ, সা'দেক, সদুক (পরম সত্যবাদী)।[৭৪]

ইতিহাসের উপর তার ডজন ডজন পুস্তিকা রয়েছে। কিন্তু প্রায় সবই এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে।

৮. মুহাম্মদ বিন সা'দ

তিনি একজন সিকাহ রাবি। হাফেজ জাহাবি তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

الحافظ العلامة، الحجة

ইবনে আবি হাতিমের সূত্রে তিনি তাকে সাদুক বলেছেন।[৭৫]

সিরাতে নববি ও সাহাবিদের ইতিহাসের উপর তার জগদ্বিখ্যাত রচনা রয়েছে, যা তাবাকাতুল কুবরা নামে প্রসিদ্ধ। এটা ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন উৎসগ্রন্থ। পরবর্তী সকল ইতিহাস লেখক এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। যদিও বলা হয় যে, তার অধিকাংশ রেওয়ায়েতই ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত। এটা অবশ্য বাস্তবতা পরিপন্থি মন্তব্য। কেননা তিনি ষাটজন মনীষী থেকে রেওয়ায়েত নকল করেছেন। তাই ওয়াকিদিকে বাদ দিয়ে অন্য সকল মনীষী থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা নেই। তবে ওয়াকিদি থেকে গৃহীত রেওয়ায়েতগুলো সনদগত দুর্বলতার কারণে অবশ্যই আপত্তির মুখে পড়ে।

৯. খলিফা বিন খাইয়াত

তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক। অত্যন্ত আস্থাভাজন রাবি। খুব যাচাই-বাছাই করে সহিহ বা হাসান সনদের রেওয়ায়েত গ্রহণ করেন। ইবনে আদি তার ব্যাপারে বলেন,

صدوق متيقظ الرواة

পরম সত্যবাদী এবং রাবিদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ব্যক্তি।

---

[৭৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৪০১
নোট : আবুল হাসান মাদানি আলি বিন হাফস (মৃত্যু : ২০১) তিনি ইমাম আহমদ বিন হামবল এবং আবু বকর ইবনে আবি শাইবার উসতাদ। তিনি এবং আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি দুজন এক নন।

[৭৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৬৬৫

হাফেজ জাহাবি বলেন, ইমাম বুখারি তার থেকে সহিহ বুখারিতে রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। তিনি পরম সত্যবাদী। সিরাত, ইতিহাস এবং রিজালশাস্ত্রের ইমাম।[৭৬]

১০. মুহাম্মদ বিন ইসহাক

ইমাম মালেক এবং ইমাম দারাকুতনি তাকে কঠোরভাবে জরাহ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে সিরাত ও ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার তাকে সাদুক (পরম সত্যবাদী) এবং জাহাবি তাকে সালিহুল হাদিস (তার থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করা যায়) বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৭]

১১. সাইফ বিন উমর

ইবনে আদি তার হাদিসকে মুনকার বলেছেন। আবু হাতেম তাকে মাতরুক (পরিত্যাজ্য) বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার রেওয়ায়েত মুনকার (আপত্তিকর) এবং সাহাবিদের উপর দোষারোপমুক্ত হলে গ্রহণযোগ্য।[৭৮]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. সাইফ বিন উমরের ব্যাপারে জরাহ-তাদিলের ইমামদের আলোচনার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করে বলেন,

ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ

হাদিসের ক্ষেত্রে দুর্বল আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য।[৭৯]

এজন্য ইবনুল আসাকির, আল্লামা জাহাবি, ইবনে খালদুনের মতো গবেষকগণ সাইফ বিন উমরের অধিকাংশ রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। যদিও তার কিছু রেওয়ায়েতের কোনো কোনো অংশে আদালতে সাহাবার

---

[৭৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/৪৭৩

[৭৭] তাকরিবুত তাহযিব, নং, ৫৭২৫ মিযানুল ইতিদাল, ৩/৪৬৯

[৭৮] মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং সাইফ বিন উমর উভয়ে অভিযুক্ত রাবি। তবে দুর্বলতা সত্ত্বেও তার অধিকাংশ রেওয়ায়েত সহিহ হাদিস এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদদের বর্ণনার সমপর্যায়ের। এজন্য ইতিহাসের দিক থেকে তিনি গ্রহণযোগ্য। তবে তার কোনো রেওয়ায়েত ইসমতে আমবিয়া (নবীদের নিষ্পাপতা), আদালতে সাহাবা বা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে।

[৭৯] তাকরিবুত তাহযিব, নং, ২৭২৪

পরিপন্থি বিষয় থাকার কারণে মুনকার। তবু তার অধিকাংশ রেওয়ায়েত মুশাজারাতের অধ্যায়ে শুধু সাহাবিদের উপর উত্থাপিত আপত্তির উত্তরই প্রদান করে না; বরং জাল ও বানোয়াট রাবিদের রেওয়ায়েতের মুখোশও উন্মোচন করে দেয়। তার রেওয়ায়েতগুলো আবদুল্লাহ বিন সাবার গোমর ফাঁস করে মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়।

শিয়া ও প্রাচ্যবিদরা সাঈদ বিন উমরের বর্ণনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, হজরত উসমানের শাসনকাল থেকে নিয়ে মুশাজারাতের সময়কালে অধিকাংশ স্থানে উমর বাস্তবসম্মত রেওয়ায়েতের হক আদায় করেছেন।

ওয়াকিদি ও সাইফের রেওয়ায়েতগুলো বিভিন্ন জায়গায় সাংঘর্ষিক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সাইফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী হজরত উসমান রা. এর যুগে যেসব বিশৃঙ্খলা হয়েছিল তার পেছনে আবদুল্লাহ বিন সাবার হাত ছিল। পক্ষান্তরে ওয়াকিদির বর্ণনা অনুযায়ী এর পেছনে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর, হজরত মুয়াবিয়া এবং হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের হাত ছিল। এই দুই রাবির দুই বর্ণনার মধ্যে নিশ্চয় একটি সত্য এবং অপরটি মিথ্যা হবে। এখন হয়তো সাইফকে সত্য মানতে হবে কিংবা ওয়াকিদিকে সত্য মানতে হবে। আকাশ থেকে আমাদের নিকট সত্যের মাপকাঠি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এই দুই রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনটি কুরআনে উল্লিখিত সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল আমাদেরকে তার প্রতি লক্ষ করতে হবে।

হাদিস লেখকদের ইতিহাস সংক্রান্ত রেওয়ায়েত

সিরাতে নববি এবং সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসের বিশাল ভাণ্ডার মুহাদ্দিসদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এদের মধ্যে ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ বিন হামবল রহিমাহুমুল্লাহর মতো মনীষীগণ আছেন। তাদের হাদিসভাণ্ডারে ইতিহাস ও সিরাতেরও বড় ভাণ্ডার রয়েছে। তাদের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে গোটা উম্মত একমত। তাদের ছাড়াও আবু বকর ইবনে আবি শাইবা, আবদুর রাজ্জাক সানাআনি, হাকিম নিশাপুরি রহিমাহুমুল্লাহর মতো তিনজন মুহাদ্দিসের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা হাদিস ও আসারে সাহাবার বিশাল

ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। আলেমগণ প্রতিযুগেই এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবা রহ.

হাফেজ জাহাবি রহ. তার ব্যাপারে বলেন, তিনি হলেন ইমাম। উঁচু মাপের ব্যক্তি। হাফেজদের সরদার। অনেক আজিমুশশান কিতাবের রচয়িতা। জন্ম, বয়স ও স্মরণশক্তির দিক থেকে তিনি আহমদ বিন হামবল ও আলি ইবনে মাদিনির সমপর্যায়ের ছিলেন।[৮০]

ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবা, আবদুল্লাহ বিন মোবারক, ওয়াকি বিন জাররাহ, সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহিমাহুমুল্লাহর মতো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ তার থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিমের মতো ইলমের পাহাড় রয়েছেন। ইমাম আহমদ বিন হামবল তাকে সাদুক (পরম সত্যবাদী) বলেছেন। আল্লামা ইজলি তাকে সিকাহ (বিশ্বস্ত) এবং হাফেজে হাদিস বলেছেন। আল্লামা আবু উবায়েদ রহ. বলেন, চার ব্যক্তির মধ্যে হাদিস সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাবি হলেন আবু বকর ইবনে আবি শাইবা। সবচেয়ে বড় ফকিহ হলেন আহমদ বিন হামবল। সবচেয়ে বেশি রেওয়ায়েত সমৃদ্ধকারী হলেন ইয়াহইয়া বিন মাইন এবং সবচেয়ে বড় আলেম হলেন আলি বিন মাদিনি।[৮১]

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা তার সংকলিত হাদিসভাণ্ডার। এটা হাদিসের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এতে প্রায় ৩৮ হাজার রেওয়ায়েত রয়েছে। সুন্নাতে নববি এবং আসারে সাহাবার এ সমুদ্রভাণ্ডারে প্রত্যেক বিষয়ে বহুল পরিমাণ রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে।[৮২]

---

[৮০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/১২২

[৮১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/১২৪

[৮২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার সর্বশেষ খণ্ডে জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফিন এবং খারেজিদের ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। আমি এখান থেকে বহুল পরিমাণে উপকৃত হয়েছি। আমি আমার এ কিতাবে আলোচ্য মুসান্নাফের রেওয়ায়েত নম্বর দিয়েছি। কিন্তু কপি ভিন্নতার কারণে খুঁজে পেতে সমস্যা হলে অধিকাংশ রেওয়ায়েত সর্বশেষ খণ্ডের সর্বশেষ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

২. ইমাম আবদুর রাজ্জাক বিন হুমাম সানাআনি রহ.

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের রচয়িতা হলেন ইমাম আবদুর রাজ্জাক বিন হুমাম রহ.। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইয়ামানে তিনি সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস এবং সিকাহ রাবি ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হামবল, ইয়াহইয়া বিন মাহিন, আলি বিন মাদিনি রহিমাহুমুল্লাহর মতো ইমামগণ তার ছাত্র ছিলেন। তারা ফিকহের ক্ষেত্রেও তার উপর নির্ভর করতেন।[৮৩]

হাফেজ জাহাবির বক্তব্য অনুযায়ী তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বড় আলেম। হাফেজ ইবনে হাজারের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি বড় হাফেজ ও ইমামদের একজন ছিলেন।[৮৪]

৩. ইমাম হাকিম নিশাপুরি রহ.

মুসতাদরাকে হাকিমের রচয়িতা ইমাম হাকিম নিশাপুরি চতুর্থ শতাব্দীর একজন মহান ইমাম। দারাকুতনি রহ. তার উসতাদ হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। আবুল কাশেম কুশাইরি ও ইমাম বাইহাকি তার ছাত্র ছিলেন।[৮৫]

ইমাম হাকিম এবং ইমাম সানাআনির উপর রাফেজি হওয়ার অপবাদ

একটা বিষয় আমাদের নিকট স্পষ্ট থাকা জরুরি যে, আজকালের কিছু ব্যক্তি ইমাম হাকিম ও ইমাম আবদুর রাজ্জাক রহ. কে শিয়া; বরং রাফেজি পর্যন্ত বলে ফেলেছে। এমনকি তারা বলেছে এটা নাকি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত! তারা এমনও মিথ্যা দাবি করে যে, হাফেজ জাহাবি এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাদেরকে রাফেজি বলেছেন। নিশাপুরির ব্যাপারে তো বলে ফেলা হয়েছে যে, তিনি নাকি رافضي خبيث (খবিস রাফেজি)। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবি। হাফেজ জাহাবি এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই

---

[৮৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৫৬৪

[৮৪] মিযানুল ইতিদাল, ২/৬০৯; লিসানুল মিযান, ৭/২৮৭

[৮৫] জাহাবি কৃত তারিখুল ইসলাম, ২৮/১২৩; স্মরণ রাখতে হবে যে, হুবহু তার নামে নিশাপুরে আরেক ব্যক্তি ছিলেন, যার নাম আবু আহমদ হাকেম নিশাপুরি। তাকে হাকিমে কাবির বলা হয়। তার কিতাবাদির মধ্যে 'সিয়ারু আসহাবিল হাদিস', 'আওয়ালি মালেক' এবং 'ফাওয়ায়েদে আবু আহমদ আল হাকিম' প্রসিদ্ধ। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬/৩৭০)

দুই মহান মনীষীর কারো উপর কখনো এই ধরনের আপত্তি উত্থাপন করেননি। বরং অন্যরা তাদেরকে যেসব অপবাদ দিয়েছে তারা সেটা খণ্ডন করেছেন। তারা সিকাহ হওয়াকে উম্মতের ইজমায়ি (সর্বসম্মত) সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

হাফেজ জাহাবি রহ. ইমাম হাকিম নিশাপুরির আলোচনা শুরুই করেছেন এভাবে,

الامام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين

ইমাম, হাফেজ, রাবিদের বিচারক, মহান আলেম, মুহাদ্দিসদের শায়েখ।[৮৬]

এরপর হাফেজ জাহাবি তাজকিরাতুল হুফফাজে হাকিম নিশাপুরির সিকাহ হওয়ার ব্যাপারে জরাহ-তাদিলের ইমামদের বক্তব্য উল্লেখ করার পর খতিব আবু বকরের মত উল্লেখ করেন যে, তিনি শিয়ামুখী ছিলেন। এরপর তিনি জরাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খবিস রাফেজি ছিলেন। এরপর তিনি ইবনে তাহেরের মত উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ভেতরে ভেতরে শিয়াপ্রীতি লালন করতেন, মুখে হাদিস বলে বেড়াতেন। তিনি এগুলো উল্লেখ করেছেন ঠিকই; কিন্তু কখনো তিনি এসব আপত্তি কবুল করেননি; বরং এটাকে তাদের কট্টর অবস্থানের উপর গ্রহণ করে তিনি বলেন, আলি রা. এর প্রতিপক্ষের ব্যাপারে তার অসন্তুষ্টি স্পষ্ট। হজরত আবু বকর ও হজরত উমরকে তিনি সম্মান করতেন। তাই তিনি শিয়া ছিলেন; রাফেজি ছিলেন না।[৮৭]

সিয়ারু আলামিন নুবালায় বলা হয়েছে, কস্মিনকালেও তিনি রাফেজি নন; বরং তিনি শিয়া ছিলেন।

আবু সা'দ মালিনি নামক একজন আলেম দাবি করেছেন যে, মুসতাদরাকে হাকিমের কোনো রেওয়ায়েতই বুখারি মুসলিমের শর্তানুযায়ী নয়। হাফেজ জাহাবি আবু সা'দের আপত্তি খণ্ডন করে বলেন, এটা হটকারিতা ও বাড়াবাড়ি। আবু সা'দ মুসতাদরাকের ব্যাপারে ফয়সালা করার যোগ্যতা রাখে না।

---

[৮৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/১৬৩

[৮৭] তাযকিরাতুল হুফফাজ, ৩/১৬৫, ১৬৬

এরপর তিনি মুসতাদরাকে হাকিমের ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণ সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে বলেন, এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বুখারি-মুসলিম কিংবা যেকোনো একটির শর্তানুযায়ী উত্তীর্ণ। যদিও সনদে সূক্ষ্ম সমস্যা রয়েছে। এর এক-চতুর্থাংশ হাসান এবং তার সনদ উত্তম মানের। অবশিষ্টগুলো মুনকার ও আজিব রেওয়ায়েত, যার মধ্যে প্রায় ১০০টি মাওযু। আমি এক আলাদা পুস্তিকায় এগুলো একত্র করেছি। মোটকথা, মুসতাদরাকে হাকিম একটি উপকারী কিতাব। আমি এর একটি সারাংশ লিপিবদ্ধ করেছি।[৮৮]

হাফেজ জাহাবি রহ. অত্যন্ত জোরালোভাবে এ আপত্তি খণ্ডন করে বলেন, আল্লাহর কসম, আব্বাস মিথ্যা কসম করেছে। সে অত্যন্ত জঘন্য কথা বলেছে। সে শাইখুল ইসলাম এবং জমানার মুহাদ্দিসের উপর অপবাদ আরোপ করেছে। আপনি হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর অভিমত লক্ষ করুন, তিনি হাকিমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

إمام صدوق

একজন পরম সত্যবাদী ইমাম।

এরপর তিনি এসব আপত্তি খণ্ডন করে বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইনসাফ পছন্দ করেন। তিনি রাফেজি নন; বরং শিয়া ছিলেন।[৮৯]

এরপর তিনি বলেন, হাকিমকে যয়িফ রাবিদের মধ্যে গণ্য করা হবে দূরের বিষয়; বরং তিনি উঁচুমাপের এক মহান ব্যক্তি ছিলেন।[৯০]

তেমনিভাবে ইমাম আবদুর রাজ্জাকের উপনাম আবু বকর হওয়াই প্রমাণ করে যে, তিনি সহিহ আকিদার লোক ছিলেন। তাকে রাফেজি মনে করা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। ইমাম আবদুর রাজ্জাক সানাআনি অনেক উঁচুমাপের ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হামবল, ইয়াহইয়া বিন মাইন ও আলি ইবনে মাদিনি রহিমাহুমুল্লাহর মতো রাবি বিচারকগণ হাদিসশাস্ত্রে তার ছাত্র ছিলেন। হাফেজ জাহাবি তাকে কেবল শিয়া বলেছেন। তিনি তার উপর উত্থাপিত আপত্তির জবাবও দিয়েছেন।

---

[৮৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/১৭৪, ১৭৫
[৮৯] লিসানুল মিযান, ৫/২৩৩
[৯০] লিসানুল মিযান, ৫/২৩৩

আব্বাস বিন আবদুল আজিজ নামক এক আলেম ইমাম আবদুর রাজ্জাক রহ. এর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিল, আল্লাহর কসম, আবদুর রাজ্জাক একজন মিথ্যুক এবং ওয়াকিদি তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী।

হাফেজ জাহাবি এই আপত্তিকে জোরালোভাবে খণ্ডন করে বলেন, আল্লাহর কসম, আব্বাস মিথ্যা শপথ করেছে। সে জঘন্য কথা বলেছে। সিহাহের সকল লেখক যার মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন, সে তার ব্যাপারে এবং শাইখুল ইসলাম ও জমানার মুহাদ্দিসের উপর অপবাদ আরোপ করেছে। যদিও আবদুর রাজ্জাকের কিছু ভুলত্রুটি রয়েছে এবং অন্যরা হাদিসের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক বিশেষজ্ঞ; কিন্তু যে ব্যক্তি তার উপর মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ আরোপ করে এবং ওয়াকিদির মতো একজন রাবিকে—সকল হুফফাজ যাকে পরিত্যাজ্য হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন—হাকিমের উপর প্রাধান্য দেয়, সে নিঃসন্দেহে একটি সুনিশ্চিত ইজমার বিরোধিতা করেছে।[৯১]

আবদুর রাজ্জাক বিন হুমাম রহ. এর রাফেজি হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ দলিল পেশ করে থাকে যে, তিনি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর আলোচনা শুনতে পারতেন না। তিনি বলতেন,

لا تقذر مجلسنا بذكر ولد ابي سفيان

> আবু সুফিয়ানের ছেলের আলোচনা করে আমাদের মজলিস গান্ধা করো না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবদুর রাজ্জাক বিন হুমামারে ব্যাপারে শুধু মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াজিদ বাসরি নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ এটা বর্ণনা করেননি। আর সে একজন মাজহুল রাবি। এই রেওয়ায়েত ব্যতীত কোথাও তার নাম-পরিচয় পাওয়া যায় না।[৯২]

---

[৯১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/৫৭১, ৫৭২

[৯২] এই লোকটি মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াজিদ সিনি (মৃত্যু : ২৩৬ হিজরি) হতে পারে। সে একজন যয়িফ রাবি। জরাহ-তাদিলের কিছু ইমাম তাকে কাজ্জাব বলেছেন (তারিখে বাগদাদ ১/২৫৪)। সিন বসরার নিকটবর্তী শহর ওয়াসেতের এক প্রত্যন্ত গ্রাম (তাওযিহুল মুশতাবা, ৫/৪৪৬)। সীন-এর প্রতি লক্ষ করে তাকে বসরিও বলা হতে পারে।

ইমাম আবদুর রাজ্জাক নিজেই আপন মুসান্নাফে হজরত মুয়াবিয়া রা. হতে বহু হাদিস নকল করেছেন। এর দ্বারা তিনি আপন ছাত্রদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর নিকট হজরত মুয়াবিয়া রা. এর এই খেদমত পৌঁছে দিচ্ছেন। এজন্য একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াজিদের এই বর্ণনা নিরেট মিথ্যাচার। ইমাম আহমদ বিন হামবল আবদুর রাজ্জাককে কট্টর শিয়া হওয়ার ব্যাপারে নির্দোষ সাব্যস্ত করেছেন। তার ছেলে জিজ্ঞেস করেছিল, আবদুর রাজ্জাক কি শিয়াবাদে বাড়াবাড়ি করতেন?

ইমাম আহমদ রহ. তখন উত্তর দিয়েছেন, তার থেকে আমি এ ব্যাপারে কিছু শুনিনি; তবে তিনি খবর ও ঘটনাবলি পছন্দ করতেন।[৯৩]

শিয়া এবং রাফেজির পার্থক্য

শিয়া হলো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সমর্থক এবং তাদের প্রশংসাকারী লোকজন।

পক্ষান্তরে রাফেজি হলো, যেসব শিয়া হজরত আবু বকর রা. ও হজরত উমর রা. এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে।[৯৪]

হাফেজ ইবনে হাজার শিয়ার পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়েছেন যে,

التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وان عليا كان مصيبا في حروبه وان مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين و تفضيلهما

---

[৯৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/১৬৪, ১৬৫

[৯৪] আভিধানিকভাবে শিয়া বলা হয়–

قوم يهوون هوى عترة النبي و يوالونهم

যারা রাসুল সা. এর সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং তাদের সাহায্য করে। (লিসানুল আরব, ৮/১৮৯)

যারা হজরত আলি রা. এবং আহলে বাইতের সমর্থক, তাদের ক্ষেত্রে এ শব্দটি প্রয়োগ হতে থাকে। এমনকি এটা তাদের এক বিশেষ নাম হয়ে যায়। (ড. নাসের বিন আবদুল্লাহ আল কাফারি কৃত উসুলু মাজহাবিশ শিয়া আল ইমামিয়া আল ইসনা আশারিয়া, আরয ওয়া নাকদ, ১/৩১)

হজরত আলি রা. কে হজরত উসমান রা. এর উপর প্রাধান্য দেওয়া। মুশাজারাতের ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. কে সঠিক এবং তার বিরোধীদলকে ভুল মনে করা। পাশাপাশি হজরত আবু বকর রা. ও উমর রা. কে সকল সাহাবির উপর প্রাধান্য দেওয়া। তাদের সর্বোত্তম হওয়ার বিশ্বাস রাখাকে মুতাকাদ্দিমিনের পরিভাষায় শিয়া বলা হয়।[৯৫]

---

[৯৫] তাহযিবুত তাহযিব, ১/৯৪

একটি চমৎকার ঘটনা

এক শ্রেণির লোক মুশাজারাতের ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. কে ভুলপন্থি আর তার সাথি-সঙ্গীদের বিদ্রোহী মনে করে। তারা শামবাসীদের সঠিক মনে করে। পাশাপাশি তারা নিজেদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধি হওয়ার দাবি করে থাকে। এই শ্রেণির এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, মুশাজারাতের ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. কে হকপন্থি মানা আর হজরত মুয়াবিয়া রা. কে ভুলপন্থি মানা শিয়াদের আকিদা; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা নয়। আমি তাকে দলিল পেশ করতে বললে সে বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলল, তাহযিবুত তাহযিবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এটি লিখেছেন, হজরত আলি রা. কে হজরত উসমান রা. এর উপর প্রাধান্য দেওয়া, মুশাজারাতের ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. কে হকপন্থি এবং তার বিরোধী দলকে ভুল বিশ্বাস রাখাকে মুতাকাদ্দিমিনের পরিভাষায় শিয়া বলা হয়।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই সংজ্ঞার প্রতিটি অংশই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার বিরোধী নাকি তার কিছু অংশ?

সে বলল, শিয়াদের আকিদা কীভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হতে পারে? এজন্য এর প্রতিটি অংশই আমাদের আকিদাবিরোধী।

আমি তাহযিবুত তাহযিব দেখিয়ে তাকে বলি, আপনার গুরুজনেরা হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর ইবারতের শেষ অংশটি বাদ দিয়েছেন। লক্ষ করুন, শেষে রয়েছে, 'হজরত আবু বকর রা. ও উমর রা. কে সকল সাহাবির উপর প্রাধান্য দেওয়া।'

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কি এই অংশের ব্যাপারে মতবিরোধ করবে? যদি কেউ পাঠ করে যে, لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله و وصى رسول الله তা হলে কি আমরা নাউযুবিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অংশটি অস্বীকার করব?

লোকটি তখন নীরব হয়ে যায়। আমি তাকে বলি, যেমনভাবে আবু বকর রা. ও উমর রা. এর সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া অংশটি সকলের নিকট আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং মুতাকাদ্দিমিন শিয়া সকলের সর্বসম্মত বিষয় তেমনিভাবে সকলের নিকট হজরত আলি রা. যুদ্ধক্ষেত্রে হকপন্থি হওয়া এবং তার বিপরীত লোকজনের ভুলপন্থি হওয়াটা সর্বসম্মত বিষয়। এর পক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামদের ডজন ডজন ইবারত দলিল হিসেবে পেশ করা যাবে। হজরত আলি রা. কে হজরত উসমান রা. এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। এরপর আমি তাকে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর একটি ইবারত দেখাই, হাদিসে এসেছে, বিদ্রোহী দল

বড় বড় সকল আলেম এটাই লিখেছেন। সবচেয়ে বড় নাকিদ (রাবি বিচারক) আলেম ইমাম ইবনে তাইমিয়া মিনহাজুস সুন্নাহয় লিখেছেন, শিয়া হলো হজরত আলি রা. এর ওইসব সাথি-সঙ্গী, যারা হজরত আবু বকর রা. ও হজরত উমর রা. কে আলি রা. এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। (জমহুর মুসলিমদের সাথে) তাদের মতানৈক্যের জায়গা হলো, তারা হজরত আলি রা. কে হজরত উসমান রা. এর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ওই সময় ইমামি বা রাফেজি বলতে কেউ ছিল না।[৯৬]

রাফেজি ও শিয়ার মধ্যকার পার্থক্য : শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবির ব্যাখ্যা

শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. অত্যন্ত চমৎকারভাবে শিয়া ও রাফেজির পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তার সারসংক্ষেপ হলো, যারা অক্ষরে অক্ষরে হজরত আলি রা. এর অনুসরণ করত তারা শিয়া। তাদেরকে শিয়া আওলা বলা হয়। জমহুর মুসলমানদের সাথে তাদের মাত্র একটি বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। সেটা হলো জমহুরের নিকট হজরত উসমান রা. হজরত আলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পক্ষান্তরে তাফজিলিয়া শিয়াদের নিকট হজরত আলি রা. হজরত উসমান রা. এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটা একটা শাখাগত বিরোধ। এই কারণে তাদেরকে পথভ্রষ্ট

আম্মারকে হত্যা করবে। ইবনে হাজার রহ. এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এটা সুস্পষ্ট দলিল যে, আলি এবং তার সাথি-সঙ্গীরা হকের উপর ছিলেন আর যারা তাদের সাথে লড়াই করেছে তারা আপন ব্যাখ্যায় ভুলপন্থি ছিলেন (ফাতহুল বারি, ৬/৬১৯)। আপনি যে আকিদার প্রতিনিধিত্ব করছেন স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার সেটা নাসেবিদের আকিদা বলেছেন। এটা বলে আমি তাকে হাফেজ ইবনে হাজার এই ইবারতটি দেখাই,

وفي هذا الحديث علم من اعلام النبوة و فضيلة ظاهرة لعلي و عمار و رد على النواصب الزاعمين ان عليا لم يكن مصيبا في حروبه

এই হাদিসে নবুওয়াতের নিদর্শন এবং আলি ও আম্মারের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা রয়েছে। এতে নাসেবিদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত আলি রা. কে হকপন্থি মনে করে না। (ফাতহুল বারি, ১/৫৪৩)

লোকটি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে এই বলে চলে যায় যে, আজ আমি বুঝতে পারলাম হাফেজ ইবনে হাজারও ভেতরে ভেতরে তাকিয়াবাজ শিয়া ছিলেন।

[৯৬] মিনহাজুস সুন্নাহ, ২/৯৬

বা বিদআতি আখ্যা দেওয়া হয়নি; বরং তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অংশ মনে করা হয়।[৯৭]

এই সময়ে কিছু শিয়া হজরত আলি রা. কে সকল সাহাবির উপর শ্রেষ্ঠ মনে করত। কিন্তু তারা তিন খলিফাসহ সকলকে সম্মান করত। কোনো সাহাবির উপর তারা দোষারোপ করা বৈধ মনে করত না। তাদেরকে তাফজিলিয়া শিয়া বলা হয়। হজরত আলি রা. কে শ্রেষ্ঠ মনে করার বিষয় ব্যতীত শিয়া আওলার সাথে তাদের কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু রাফেজিরা যখন নিজেদেরকে শিয়া বলা শুরু করে দেয় তখন মানুষ যাতে ধোঁকা না খায়; তাই শিয়া আওলা ও শিয়া তাফযিলিয়ারাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত উপাধি গ্রহণ করে নেয়।

শাহ সাহেব বলেন, ইতিহাসের প্রাচীন কিতাবগুলোতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তিনি শিয়া ছিলেন। এই শব্দ আপন জায়গাতে ঠিক আছে। কেননা প্রথমদিকে তারা তাফজিলিয়া শিয়া ছিলেন। ... এর মাধ্যমে যেন কেউ প্রতারিত না হয়। তারা কখনো উল্লিখিত শিয়াদের মতো ছিলেন না। হজরত আলির সঙ্গে থাকার কারণে তাদেরকে শিয়ানে আলি বলা হতো।[৯৮]

অন্য ভাষায় আমরা বলতে পারি যে, শিয়া একটি ব্যাপক শব্দ আর রাফেজি এক বিশেষ পরিভাষা। প্রত্যেক রাফেজি শিয়া; কিন্তু প্রত্যেক শিয়া রাফেজি নয়। বর্তমান শিয়াদের মধ্যে রাফেজির সংখ্যা বেশি। পক্ষান্তরে প্রথম শতাব্দীতে সম্পূর্ণ উলটো চিত্র ছিল। তখন রাফেজি কম ছিল, শিয়া বেশি ছিল। অতএব জরাহ-তাদিলের ইমামগণ হাকিম নিশাপুরি ও আবদুর রাজ্জাককে শিয়া বললেও এর দ্বারা আজকালের ইসনা আশারিয়া বা ইসমাইলিয়া শিয়া উদ্দেশ্য নয়। ওই সময় একটি

---

[৯৭] ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, উসমান রা. ও আলি রা. এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি এমন মৌলিক কোনো বিষয় নয়, যার কারণে বিরোধী দলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে গোমরাহ আখ্যা দেওয়া হবে। (আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ, ১১৭)

[৯৮] তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া, উর্দু ৩৯, ৪০

বিশাল অংশ হজরত আলি রা. কে হজরত উসমান রা. এর চেয়ে উত্তম মনে করার কারণে তাদেরকে শিয়া বলা হতো। হজরত ইমাম আবদুর রাজ্জাক ও ইমাম হাকিম এ ধরনের শিয়া ছিলেন, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এই কারণে জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট ইমাম হাকিম ও ইমাম আবদুর রাজ্জাক শিয়া হওয়া সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে সিকাহ ছিলেন। সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এ ধরনের বহু রাবি পাওয়া যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।[৯৯]

---

[৯৯] উদাহরণত, সহিহ বুখারিতে মাসলামা বিন কুহাইল থেকে দশটি, আওফ বিন আবু জামিলা থেকে ১২৬টি, উবায়দুল্লাহ বিন মুসা রহিমাহুমুল্লাহ থেকে ৪৩টি রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ইমাম বুখারি রহ. আবদুল আজিজ বিন সিয়াহ, ইয়াহইয়া বিন ইয়ালা কুফি ও আবদুল মালিক বিন আয়ুন রহিমাহুমুল্লাহ থেকেও দুয়েকটি রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। তারা সকলেই শিয়া ছিলেন।
তেমনিভাবে ইমাম মুসলিম রহ. মাসলামা বিন কুহাইল থেকে ১৯টি, হিশাম বিন সা'দ থেকে ৮টি, জাফর বিন সুলায়মান থেকে ১৩টি, উবায়দুল্লাহ বিন মুসা রহিমাহুমুল্লাহ থেকে ২৪টি রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও ইমাম মুসলিম সুলাইমান বিন কারম, আলি বিন যায়েদ বিন জুদআন, আওফ বিন আবু জামিলা, আবদুল আজিজ বিন সিয়াহ এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়ালা কুফি রহিমাহুমুল্লাহ থেকে মাঝেমধ্যে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। তারা সকলেই শিয়া রাবি ছিলেন কিংবা তাদের উপর শিয়া হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। মুওয়াত্তা মালেক ব্যতীত অন্যান্য হাদিসের কিতাবে শিয়া রাবিদের অনুপাত এর চেয়েও বেশি।

মুশাজারাতে সাহাবা অধ্যায়
কেন বাদ দেওয়া সম্ভব হলো না?

জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন আমাদের ইতিহাসের দুটি নাজুকতম অধ্যায়। ইতিহাসের এই অধ্যায় কাটাদার ঘন জঙ্গলের ন্যায়। জানা নেই কত লোক এতে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। কিছুলোক নসর বিন মুযাহিম ও আবু মিখনাফের মতো অগ্রহণযোগ্য রাবির বর্ণনাকে নিশ্চিত মনে করে সাহাবা-বিদ্বেষী হয়ে গেছে। আরেক শ্রেণির লোক শেষ পর্যন্ত মুশাজারাতকেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসেছে। অথচ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এবং হাদিসের মাধ্যমে মূল ঘটনাটি প্রমাণিত। এ ঘটনা সংক্রান্ত সহিহ রেওয়ায়েত থেকেই ফকিহগণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির বিধান বের করেছেন।

তা সত্ত্বেও জনগণের সামনে মুশাজারাতে সাহাবা উল্লেখ না করাই উত্তম। সম্ভব হলে আমিও এই অধ্যায়টি চোখ বুজে অতিক্রম করে যেতাম। কিন্তু কয়েকটি কারণে এখানে এর সুযোগ নেই।

১. ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা ইতিহাসের বিষয়গুলো শেকলের কড়ার মতো। একটি অপরটির সাথে যুক্ত। একটি প্যারা ছুটে গেলেই তা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। এই কারণে হাফেজ জাহাবি ও হাফেজ ইবনে কাসিরের মতো সতর্ক আলেম মুশাজারাতের ঘটনাবলি নিজেদের ইতিহাসগ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

২. বর্তমান যুগে এসব ঘটনা মিডিয়া বিশেষত ইন্টারনেটে ধারাবাহিক আলোচনার লক্ষবস্তু বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় যদি আমরা ইতিহাস গবেষণা করতে গিয়ে মুশাজারাতের অধ্যায় বাদ দিয়ে দিই তা হলে যে অসংখ্য লোক এ বিষয়ে সংশয়-সন্দেহে নিপতিত হয়েছিল, তারা মনে করে বসবে যে, এই ঘটনাগুলো এতই জঘন্য যে, তা উল্লেখ করার মতো নয়! ফলে ইতিহাস লিপিবদ্ধ

করতে গিয়ে এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়াটা তাদের সন্দেহ-সংশয়কে আরও পাকাপোক্ত করে দেবে।

৩. ইতিহাসের রেওয়ায়েতগুলো যাচাই-বাছাইয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো, সাহাবায়ে কেরামের উপর উত্থাপিত আপত্তি নিরসন করা। তাদের ব্যাপারে প্রচলিত সন্দেহ নিরসন করা, ইতিহাসের ভুল বিষয়গুলো খণ্ডন করা, সন্দেহযুক্ত বিষয়ে সঠিক চিত্র ফুটিয়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বাদ না দিয়ে যাচাই-বাছাই করে বাস্তবতা ফুটিয়ে তুললেই এ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব। এই কারণে মুশাজারাতের আলোচনা করা অপরিহার্য ছিল।

মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে নীরবতা এবং আলোচনার বিধান

মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা শরিয়তের বিধান। আমাদের মনীষীগণও এমন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ বিষয়গুলো অধমের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে।

কিন্তু হায়! যদি এই আলোচনা থেকে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ পেয়ে যেতাম! কিন্তু যে মহান ব্যক্তিদের নির্দেশে আমি এই জিম্মাদারি গ্রহণ করেছি তাদের মতে বর্তমান সময়ে এ কাজ করা অপরিহার্য। যদিও এ বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. বিষয়টির বৈধতা ও নাজুকতা উভয় দিকে ইঙ্গিত করে লেখেন, কেউ কেউ রাফেজি, খারেজি ও মুনাফিকদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া রেওয়ায়েতের কারণে জনগণের মধ্যে সৃষ্ট ভুল ধারণা দূর করার জন্য মুশাজারাতে সাহাবা বিষয়ে আলোচনা করছেন। এটি আপন জায়গায় ঠিক আছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি পদস্খলনের এক জায়গা। এটা থেকে সুস্থ ও নিরাপদে বের হয়ে আসা সহজ কাজ নয়।

কিছু পৃষ্ঠা পর তিনি এ বিষয়ে আলোচনার সঠিক পদ্ধতি উল্লেখ করে বলেন, যদি আজও আকল, ইনসাফ কোনো জিনিসের নাম হয়ে থাকে তা হলে একটি কাজ করুন, মুশাজারাতে সাহাবা এবং সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত পারস্পরিক যুদ্ধে যারা অগ্রগামী ছিলেন অর্থাৎ হজরত আলি, হজরত মুয়াবিয়া, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর, হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের অবস্থা, তাদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ও বর্ণনার কিছু অংশ হাদিসের কিতাবে রেওয়ায়েতে হাদিসের মূলনীতি

অনুযায়ী সংকলিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। আবার তাদের কিছু অবস্থা ও বক্তব্য ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এই উভয় প্রকারের বর্ণনা ভিন্ন ভিন্নভাবে অধ্যয়ন করে আপন মেধা ও মস্তিষ্কের বিচার করুন। লক্ষ করুন, হাদিসশাস্ত্রে উল্লিখিত রেওয়ায়েতের মাধ্যমে কেমন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় আর তার বিপরীতে ইতিহাসে উল্লিখিত রেওয়ায়েতের মাধ্যমে কেমন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এই দুটির মধ্যে সামান্য তুলনা করুন। সন্দেহ নেই হাদিসে সংকলিত রেওয়ায়েতের মাধ্যমে যদি কোনো সাহাবির ব্যাপারে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা ক্রটি-বিচ্যুতির কথা জানাও যায় তবু সামষ্টিকভাবে কখনোই তাদের ব্যক্তিত্ব ক্রটিযুক্ত এবং অনির্ভরযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে ইতিহাসের রেওয়ায়েতসমূহ অধ্যয়ন করলে মানুষ উভয় দল কিংবা কমপক্ষে যেকোনো এক দলকে বিভ্রান্ত, ক্ষমতালোভী, ক্ষমতার জন্য লড়াইকারী বলে আখ্যা দেবে।[১০০]

রেওয়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপন্থা

মনীষীদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী মুশাজারাতের এই নাজুক ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপন্থা হচ্ছে, প্রথমত আমরা হাদিসভাণ্ডার থেকে সাহায্য গ্রহণ করব।

দ্বিতীয়ত হাদিসভাণ্ডারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইতিহাসের সহিহ ও হাসান রেওয়ায়েত গ্রহণ করব।

তৃতীয় পর্যায়ে এগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল যয়িফ রেওয়ায়েত গ্রহণ করব, যাতে ইতিহাসের খুটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। হাদিসে কিংবা ইতিহাসের সহিহ রেওয়ায়েতে যা বিদ্যমান নেই, যা কেবল ইতিহাসের যয়িফ রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, আমরা সেগুলো কোনো কোনো স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করব। সে ক্ষেত্রে আমরা সেই বিষয়টি কুরআন-হাদিসের সামষ্টিক বিষয় এবং অন্যান্য সহিহ রেওয়ায়েতের বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তের প্রতি লক্ষ রাখব। আমরা কুরআন-হাদিস এবং ইতিহাসের সহিহ রেওয়ায়েতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইতিহাসের যয়িফ রেওয়ায়েতকে পুরোপুরি পরিত্যাগ

---

[১০০] মাকামে সাহাবা, ৯৭, ১০৪

করব। কেবল ঈমানি কারণেই আমরা এমনটি করবো না; বরং গবেষণা ও নিষ্ঠার দাবি এটাই।

আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিরোধপূর্ণ রেওয়ায়েত সমাধানের একটি পদ্ধতি হলো, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় উল্লিখিত বিষয়গুলো মেনে নেওয়া আর রেওয়ায়েতের ভিন্নতা থেকে বেঁচে থাকা। তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহর হাওয়ালা করে দেওয়া। অর্থাৎ এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা, পড়াশোনা ও গবেষণা থেকে নিরাপদ দূরত্ব অবলম্বন করা। নিঃসন্দেহে একজন সাধারণ মানুষের জন্য এই পদ্ধতি প্রায় নিরাপদ।

বলাবাহুল্য, আলেমগণ বিশেষত ইতিহাসের শিক্ষার্থীরা এতটুকুতেই শান্ত হয়ে যেতে পারে না। অতএব আলেমদের জন্য বিরোধপূর্ণ রেওয়ায়েতকে কুরআন-হাদিসের অনুকূল মেনে নেওয়াই প্রকৃত সমাধান।

ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিয়ে সাহাবা-যুগের বিজয় পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে রেওয়ায়েত নকলে শিথিলতা অবলম্বন করেছি। তাবারি, আল কামিল ফিত তারিখ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এবং হাতের নাগালে থাকা সকল কিতাব থেকেই যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করেছি। কেননা এ বিষয়গুলো অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এর মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের এক বিশাল অংশে মুসলমানরা আবাদ হয়েছেন। এর খুটিনাটি বিবরণ যয়িফ রাবি থেকেও নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন আমরা ফেতনা এবং মুশাজারাতে সাহাবার যুগের পৃষ্ঠা উলটাবো। এতে জায়গায় জায়গায় মুনাফিক ও সাবায়িদের চক্রান্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আমি অত্যন্ত ইনসাফ, আমানতদারি ও সহিহ দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে এই চক্রান্তের গোমর ফাঁস করার চেষ্টা করেছি। বিরোধপূর্ণ বিষয়ে অবশ্যই সহিহ রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছি। খুঁটিনাটি ঘটনায় যয়িফ রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছি।

হাফেজ জাহাবি মুসতাদরাকে হাকিমের টীকা লিখেছেন। তিনি এতে বহু রেওয়ায়েত সহিহ, যয়িফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমরা হাফেজ জাহাবির টীকা অনুসরণ করেই মুসতাদরাক থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ

করেছি। কোথাও সন্দেহ হলে আমরা উসুলে রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে সনদ যাচাই-বাছাই করেছি।[১০১]

বর্ণনাকারীগণ যেসব রেওয়ায়েতের ব্যাপারে সহিহ, হাসান, যয়িফ প্রভৃতি বিধান আরোপ করেননি, আমরা সেগুলোর সর্বক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করব।

মুশাজারাত এবং ফিকহি দৃষ্টিকোণ

মুশাজারাতে সাহাবার নাজুকতম বিষয়টির প্রতি সাধারণত ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকেই লক্ষ করা হয়। এ বিষয়টি মৌলিকভাবে যেখানে আকিদা, শরিয়ত এবং বিচার-ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, তাকে ইসলামি ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়নি। অথচ যদি ফিকাহভাণ্ডার এবং ফকিহদের বক্তব্য সামনে রেখে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ করা হয় তা হলে দুটি উপকারিতা পাওয়া যায়।

১. কিছু মতবিরোধপূর্ণ প্যাঁচালো বিষয় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এতে ভিন্ন কোনো মতপ্রকাশের সুযোগ থাকে না।

২. কিছু খলিফা এবং সাহাবির নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, এমন যয়িফ রেওয়ায়েতের অতিরঞ্জন এবং পক্ষপাতদুষ্টতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যদিও প্রতিনিয়ত ফিকহের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে তবু হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতেই ফিকহের প্রাথমিক ও মৌলিক ভিত্তি সংকলিত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত ইমাম আবু

---

[১০১] জফর আহমদ থানবি রহ. 'কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস' কিতাবে ইবনুস সালাহ রহ. থেকে নকল করেন, হাকিম যদি কোনো রেওয়ায়েত সহিহ আখ্যা দেন আর আমরা যদি অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য মনীষীর পক্ষ থেকে সেটাকে সহিহ বা হাসান প্রভৃতি বিধান আরোপ করতে না দেখি তা হলে আমরা তাকে হাসান সাব্যস্ত করব। তবে যদি তাতে কোনো দুর্বলতামূলক ত্রুটি পাওয়া যায় সেটা ভিন্ন কথা.. সংক্ষেপিত.. আমি বলব ইমাম জাহাবি এ কাজটি করে দিয়েছেন। তিনি যেটা সহিহ বলবেন সেটা সহিহ হবে। আর তিনি যে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করবেন, তাতে কোনো ধরনের হুকুম আরোপ করবেন না, ইবনুস সালাহ রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী তার হুকুম হবে। পৃষ্ঠা ৭১

হানিফা রহ. ফিকহে হানাফির যে মৌলিক কাজ শুরু করেছিলেন হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা পূর্ণতায় পৌঁছেছিল। এই সকল মুজতাহিদ ইমাম বড় বড় তাবেয়ি থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন। তাদের নিকট মুশাজারাতের যেসব রেওয়ায়েত পৌঁছেছিল তারা ইলমি আমানত হিসেবে সেগুলো পরবর্তীদের নিকট বর্ণনা করেছেন। আর তারাই হলেন সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

এই বিষয়ে আমরা ইমাম আবু হানিফার আলফিকহুল আবসাত, আলফিকহুল আকবার ও কিতাবুল আসার এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান রহ. এর সিয়ারে সগির, শামসুল আইম্মা সারাখসির আলমাবসুত বিশেষভাবে সামনে রেখেছি।

মুশাজারাতের কিছু স্থান খুব জটিল ছিল। সেখানে হয়তো ইসলামি ফিকাহকে সহিহ সাব্যস্ত করতে হবে; নয়তো ইতিহাসের বর্ণনাকে সহিহ মানতে হবে। আমরা এমন ক্ষেত্রে চার কারণে ফিকহি রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছি,

১. ফিকহে ইসলামি অস্বীকার করা শরিয়ত অস্বীকারের নামান্তর। পক্ষান্তরে ইতিহাসের রেওয়ায়েত বিশেষত যয়িফ রেওয়ায়েত অস্বীকার করার ফলে পার্থিব ও ধর্মীয় কোনো ক্ষতি হয় না।

২. ইতিহাসগ্রন্থ তাবারি প্রভৃতি সংকলনের পূর্বেই ফিকহশাস্ত্র সংকলিত হয়ে গিয়েছিল। এজন্য ফিকহি রেওয়ায়েতের সনদ উঁচুমানের।

৩. ফিকহি ফয়সালার ভিত্তি হলো কুরআন, হাদিস ও আসারে সাহাবা, যার সনদ মুত্তাসিল ও মজবুত। পক্ষান্তরে ইতিহাসের বহু যয়িফ ও মুনকাতি রেওয়ায়েত রয়েছে।

৪. ইতিহাসের তুলনায় ফিকহে ইসলামি গবেষণার পদ্ধতি অত্যন্ত উঁচুমানের।

এই কারণে ইতিহাস গবেষণায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাকার জন্য সংকলিত ফিকহের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইতিহাসের রেওয়ায়েতকে বিবেচনা করতে হবে। সম্ভব হলে তার ব্যাখ্যা করা হবে অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবির গুরুত্বপূর্ণ অভিমত

মহান ঐতিহাসিক মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ সংঘটিত হয়েছে, যার কারণে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, অনুসন্ধানী মনমস্তিষ্ক নিয়ে তা অধ্যয়ন করতে হবে। যাদেরকে এই বিষয়ের জিম্মাদার মনে করা হয় তাদের উপর কোনো হুকুম প্রয়োগের ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করা, ঢালাওভাবে তাদেরকে দুনিয়াপাগল, ধনসম্পদ ও ক্ষমতালোভী, মতলববাজ বলে দেওয়া উচিত নয়। এটা ইতিহাসের ঘটনাবলিরই দাবি। নিরেট ইলমি তরিকায় ইতিবাচকভাবে এই ঘটনা বিচার করতে হবে। যারা সরাসরি এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যাদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহের মুখোমুখি হতে হয়েছে, তাদের আশপাশের অবস্থা কেমন ছিল? তারা কোন সমাজে বসবাস করতেন? তখন কেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল? এ বিষয়গুলো অধ্যয়ন করা ব্যতীত জজবাবশত তড়িঘড়ি করে কারো ব্যাপারে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। দূরের বিষয় বাদ থাক, নিকট অতীতের ঘটনাবলি বোঝার ক্ষেত্রেই তো আমাদের ভুলত্রুটি হয়ে যায়![১০২]

কেননা আমরা পরিবেশ, পরিস্থিতির সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অনুমান করতে পারি না। সেই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর বহু জমানা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সেই জমানা আমাদের জমানা থেকে বহু ভিন্ন ছিল। তখন আসলে কী সমস্যা তৈরি হয়েছিল? যারা এতে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তারা কেন, কী কারণে এতে জড়িয়ে পড়লেন? তাদের উদ্দেশ্য, অবস্থান, সঠিক প্রেক্ষাপট এবং তাদের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি, তাদের পূর্বের খেদমত

---

[১০২] নিকট-অতীতের কিছু বিষয় আজ পর্যন্ত সন্দেহজনক। তাতে সাংঘর্ষিক বিষয়ও বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণত, তুরস্কের মুস্তফা কামাল পাশা, মিশরের জামাল আবদুন নাসের, পাকিস্তানের জুলফিকার আলি ভুট্টো, জেনারেল জিয়াউল হক, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন, লিবিয়ার কর্নেল গাদ্দাফি প্রমুখের কিছু সাপোর্টার ও সমালোচক রয়েছে। কারো নিকট তারা ফেরেশতাতুল্য আবার কারো নিকট তারা কাফেরদের এজেন্ট। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধ, পূর্বপাকিস্তান হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, নাইন ইলেভেনের ঘটনা, জেনারেল জিয়াউল হকের বিমান ট্রাজেডি, বেনজির ভুট্টোর হত্যাকাণ্ড, অ্যাবোটাবাদ অপারেশন এবং উসামা বিন লাদেন... আমাদের সামনেই সংশয়পূর্ণ এমন কত বিষয় রয়েছে, কিন্তু তার বাস্তবতা সবসময় সন্দেহপূর্ণই রয়ে গেছে।

এসব বিষয় একসঙ্গে করে একটিকে অপরটির সঙ্গে যুক্ত করে অধ্যয়ন না করলে ইনসাফ ও নিষ্ঠার রাস্তা পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।[১০৩]

আমি যথাসাধ্য সমস্ত দিক সামনে রেখে ইতিহাস অধ্যয়ন এবং তা বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। পূর্ণ সতর্কতার সাথে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে সকলের বোধগম্য করে বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের অন্ধ অনুসরণ করিনি; বরং প্রতিটি বিষয়কে উসুলে রেওয়ায়েত ও দিরায়াতের আলোকে যাচাই করেছি।

এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে আমি কয়েকটি স্থানে পূর্বসূরি আলেমদের বিবরণের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে বাধ্য হয়েছি। কয়েকটি স্থানে ঐতিহাসিকদের বর্ণনার প্রতি সামান্যও আস্থাশীল হতে পারিনি। অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণের স্বভাবগত তাড়না আমাকে অধিক বিচার-বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই আমি সম্ভাব্য সকল দিক এবং ইলমি উৎসের মাধ্যমে বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করে দেখেছি। যার ফলে পরিশেষে এক মজবুত ও সুস্পষ্ট বাস্তবতা সামনে এসেছে। কোনো কোনো সময় আমার মাথায় সম্পূর্ণ নতুন একটি দিক এসেছে। ইতিহাস, হাদিস ও ফিকহের রেওয়ায়েতসমূহ আরও অধিক অধ্যয়নের ফলে তার সমর্থন পেয়েছি। অবশেষে সেটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে আমার মনস্থির হয়েছে।

আমি নিজেকে একজন নগণ্য পর্যায়ের ছাত্র মনে করি। মনীষীদের আমলের সামনে আমি সহায়-সম্বলহীন ফকির বৈ কিছু নই। তবু এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্বের কথা আমি ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি। এজন্য আমি একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। সর্বক্ষেত্রেই আমি বাধ্য ও অনুগত ব্যক্তির মতো তা মান্য করেছি। এই কারণে অবশ্য আমাকে কিছু স্পর্ধামূলক পদক্ষেপ নিতে হয়েছে, যা হয়তো কিছু বন্ধুবান্ধবের নিকট অপছন্দনীয় মনে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে অপারগ মনে করতে হবে।

কিছু কিছু বিষয়ের গবেষণা করতে গিয়ে শুরুতে মনীষীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে সন্দেহপূর্ণ মনে হয়েছে; পরবর্তীতে রেওয়ায়েত বিচার-

---

[১০৩] আল মুরতাযা, ২৪৩, ২৪৪

বিশ্লেষণ ও গবেষণা করতে করতে মনীষীদের সঙ্গে এই চরম মতানৈক্য আরো দীর্ঘ হয়। পূর্বসূরি মনীষীদের বিপরীতে গিয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানকারী আধুনিক গবেষকদের কিতাবাদিতেও কয়েক জায়গায় নতুন নতুন বিষয় পরিবেশন করা হয়েছে। আমি এক্ষেত্রে মাহমুদ আব্বাসি, মাওলানা মওদুদি, মাওলানা ইসহাক সাম্ভলি থেকে শুরু করে মাওলানা আতিকুর রহমান সাম্ভলি, মাওলানা বশির আহমদ হামেদ হাসারি পর্যন্ত ডজন ডজন লেখকের কিতাব অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেছি। আরববিশ্বে বিগত পঞ্চাশ ষাট বছরে এ বিষয়ে যা লেখা হয়েছে, তা এককেটি কুতুবখানার মতো। আমি যথাসম্ভব সেগুলো যাচাই-বাছাই করেছি। বিশেষত হজরত উসমান রা. এর কিসাস, আম্মার রা. কে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হত্যার হাদিস, কারবালার ঘটনা, ইয়াজিদের কর্মকাণ্ড, খেলাফতে রাশেদা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থাকা প্রভৃতি বিষয়ে আমার মরুভূমির পথচলা বহু দীর্ঘ ছিল।

শিয়াদের ইতিহাস, সাবায়ি ফেতনার বাস্তবতা, হাদিস ও ইতিহাসে শিয়াবাদের প্রভাব, বিভিন্ন পথভ্রষ্ট দল তৈরি হওয়ার বিভিন্ন দিক অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে। শিয়াদের বিরুদ্ধে লিখিত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু অনুসরণ করার মতো কিছু পাইনি। আমি সকল চিন্তাধারার মানুষের দলিল-প্রমাণ সামনে রেখে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছি। কিন্তু কোথাও আমি সর্বশেষ তাঁবু স্থাপন করতে পারিনি। বিশেষত যে ক্ষেত্রে আমি পূর্ববর্তী মনীষীদের সিদ্ধান্ত থেকে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে আমার মাথায় অবশ্যই এ বিষয়টি ছিল যে, হতে পারে মনীষীদের সমর্থনে কোনো মজবুত দলিল রয়েছে। আমি সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারছি না। মোটকথা, গবেষণামূলক অধ্যয়নের সফর অব্যাহত থাকে। এই সফর যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে এই কিতাব সূচনা হয়েছে।

সম্ভাব্য সকল সতর্কতা সত্ত্বেও আমি এই দাবি করছি না যে, এটি পূর্ণাঙ্গ কাজ এবং এটাই এ বিষয়ের সর্বশেষ। আমি জেনে-বুঝে কোথাও খেয়ানতের মতো স্পর্ধামূলক কাজ করিনি। কিন্তু যেমনভাবে আমি মানুষ হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ তেমনিভাবে এই কাজটিও ত্রুটিমুক্ত নয়। এই কারণে সবসময় আলেমদের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে।

আকিদার কিতাবে উল্লিখিত জমহুর মুসলমানদের সর্বসম্মত আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত আমি এর কোনো বিষয়কে সুনিশ্চিত বলছি না। কোনো বিষয়ে অযথা সমালোচনা ব্যতীত আলেমগণ যেকোনো ইবারত, যেকোনো অভিমত, যেকোনো বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমার সাথে মতবিরোধের অধিকার রাখেন। আমার উপস্থাপনা-শৈলী সংশোধন ও পরিমার্জনেরও অবকাশ রয়েছে। কখনো কম্পোজ, প্রুফরিডিংজনিত ভুলও আপত্তি তৈরি করতে পারে। এ ধরনের কোনো সংশোধনীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পাঠকগণ বিশেষত আলেদের মতামতকে সাধুবাদ জানানো হবে। যদি সংশোধন এবং কল্যাণের জন্য ইলমি নীতিমালা অনুযায়ী কেউ আমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন কিংবা পরামর্শ প্রদান করেন তা হলে অবশ্যই তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা হবে। কিন্তু যদি কেউ নিছক আলোচনার জন্য আলোচনা করতে চান তা হলে আমরা এ ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকব।

আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং বান্দার গুনাহ আবৃতকারী। তার নিকট আশাবাদী তিনি আমার অজান্তে সংঘটিত হওয়া ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। সাময়িকের এ জীবনেই তিনি ভুলত্রুটি সংশোধনের তাওফিক প্রদান করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে চিন্তা-চেতনায় বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে নিরাপদ রাখুন। মুসলমানদের অবস্থান অনুযায়ী ঈমান ও আকিদার উপর দৃঢ় রাখুন। আমিন।

استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

وصل الله تعالى على حبيبه واصحابه واهل بيته اجمعين

ইসমাইল রেহান
rehanbhai@gmail.com
জুমাবার, ২৪ মহররম, ১৪৩৭

খেলাফতে রাশেদার
পারস্পরিক মতানৈক্য ও মতবিরোধের যুগ

৩৪ থেকে ৪০ হিজরি পর্যন্ত

آشکارا ہیں مری آنکھو پہ اسرار حیات
کر نہیں سکتے مجھے نومید پیکار حیات
জীবনের রহস্য নয়নে মম হইয়াছে উদ্ভাস,
জীবনের জঞ্জাল পারিবে না মোরে করিতে নিরাশ।
***

کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے
ہے بھروسا اپنی ملت کے مقدر پر مجھے
দুঃখের খণ্ড-চিত্র কী করিয়া মোরে দেখাইবে ভয়,
জাতির ভাগ্যে রহিয়াছে যবে মোর পূর্ণ অভয়।
***

یاس کے عنصر سے ہے آزاد میرا روزگار
فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کارزار
নিরাশার গ্রাস হইতে মুক্ত-স্বাধীন আমার জীবন,
কর্মের প্রেরণা দিতেছে সংবাদ পূর্ণ বিজয়-আগমন।

ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল রহ.

ষড়যন্ত্রের সূচনা

২৮-৩৩ হিজরি পর্যন্ত

ইতিপূর্বে মুসলিম উম্মাহর বিজয়যাত্রা ও গৌরবময় ক্রমবিকাশের যে ঈর্ষণীয় পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে, সেটি হজরত আবু বকর সিদ্দিক ও হজরত উমর রা. এর যুগ থেকে শুরু করে হজরত উসমান গনি রা. এর শাসনামলের একাদশতম বর্ষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মূলত এ চব্বিশটি বছরই ছিল মুসলমানদের উত্থানকাল। চারদিকে ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা। সেই সাথে বিজয়যাত্রাও ছিল অব্যাহত। সাধারণ জনগণ সচ্ছল ছিল এবং শাসকরা ছিলেন অতুলনীয় ও বিশ্বস্ত। গোটা উম্মাহ ছিল একতার বন্ধনে আবদ্ধ। কোথাও কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা বিশৃঙ্খলা কিছুই ছিল না।

স্বয়ং হজরত উসমান রা. শেষ পর্যন্ত একজন শ্রেষ্ঠ আদর্শ শাসকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। অবশ্য শেষের বছরগুলোতে কিছু দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ তার শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। অবশেষে সেটাই হজরত উসমান রা. এর নির্মম শাহাদাতের কারণ হয়েছিল। মূলত এটা ছিল সেই দুর্যোগ, যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল আল্লাহর নবীর হাদিসে। একই সাথে এটাই ছিল সেই ঘূর্ণিপাক, যেখান থেকে মুসলিম উম্মাহ প্রবেশ করেছিল অভ্যন্তরীণ দুর্যোগের ভয়াবহ যুগে।

কিন্তু তার আগ পর্যন্ত একত্ববাদের সর্বব্যাপী স্লোগান, পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন এবং আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন ও ইসলামের ধারাবাহিক বিজয়যাত্রা শয়তানি শক্তিকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিচ্ছিল না। হাজার বছর যাবৎ শয়তান মানবজাতির ইহ ও পরকাল ধ্বংসের জন্য যে শ্রম-সাধনা ব্যয় করেছিল, তা সব একে একে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে সে ছটফট করছিল নিদারুণ গাত্রদাহে। সে তো চেয়েছিল, ইসলামের ফুলবাগিচাকে চিরতরে বিরান করে দিতে। কিন্তু তার উপায় কী? একদিকে মুসলিম জাহানের সীমানায় মানুষ ইবলিসের দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এক

আল্লাহর বন্দেগিতে আত্মসমর্পিত ছিল, অন্যদিকে মুসলিম জাহানের বাইরের তাগুতি শক্তিগুলো তাওহিদের কৃতি সন্তানদের হাতে এক এক করে পরাস্ত হচ্ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে শয়তানের কী-ইবা করার ছিল। সে নিজে তো সম্মুখে এসে লড়াই করতে পারে না। চিরকাল অন্যকে ব্যবহার করাই তার চাল। কিন্তু এ অবস্থায় এমন কিছু মানুষ শয়তানের হাতের ক্রীড়নক হলো, যারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম শাসনের অধীনস্থ থাকলেও, কঠোর গোত্রীয় পক্ষপাত থেকে তাদের অন্তর মুক্ত ছিল না। ইসলামের প্রভাব-বিস্তার দেখে তারা যদিও দমে গিয়েছিল এবং মুখে কালিমাও পড়ে নিয়েছিল; কিন্তু মুহাজির ও আনসার এবং কুরাইশদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সীমাহীন যন্ত্রণাবোধ করত। ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে তারা খোদায়ি শাসনব্যবস্থা নয়; বরং দেখত কুরাইশদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা রূপে। সুতরাং কোনোভাবে যদি এ শাসন দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হতো, এবং তদস্থলে তাদের দোসরদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হতো, তবেই তারা বেশি খুশি হতো। এদের মধ্যে একদলের অন্তরে ঈমানের কিছুই প্রবেশ করেনি, যাদের মধ্যে আরব, অগ্নিপূজক, ইহুদি ও খ্রিষ্টান সব মিশ্রিত ছিল। মূলত এরাই ছিল পরবর্তী যুগে ইসলামের শেকড় কাটতে সচেষ্ট এবং এ লক্ষে শয়তানের এজেন্ডদের টার্গেট বাস্তবায়নে আগ্রহী।

মাটির গভীরে রোপিত বীজ কখন মাথা গজাবে, তা যেমন জানা যায় না, তেমনি ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনের সূচনা ঠিক কবে হয়েছিল, তাও পুরোপুরি নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে আমরা ধারণা করতে পারি, ৩৪ হিজরিতে যে আন্দোলনটি একটি কণ্টকময় ঝোঁপের মতো ঘনীভূত হয়েছিল, তার বীজ মূলত হজরত উসমান রা. এর যুগেরও পূর্বে বপন করা হয়েছিল। আজকের পৃথিবীতে যোগাযোগ-ব্যবস্থার দ্রুততম উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের একটি ষড়যন্ত্র সবার চোখে উন্মুক্ত হতে ৮-১০ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। তা হলে সেই প্রাচীন যুগে দেশবিরোধী কোনো ষড়যন্ত্র পরিপক্ব হতে ২০-২৫ বছর লেগে যাওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়।

পক্ষান্তরে একথা সম্পূর্ণ অমূলক যে, দুর্যোগ সৃষ্টিকারী দলটি হজরত উসমান রা. এর শাসনামলের শেষ কয়েক বছরে হঠাৎ করেই জন্ম নিয়েছে। রাতারাতি দূরদূরান্ত পর্যন্ত শেকড় ছড়িয়ে এত দ্রুত উপরের

দিকে উঠে গেছে যে, শুধু খলিফাকে শহিদ করেই সফল হয়নি, বরং এরপরও কয়েক দশক পর্যন্ত মুসলিম খলিফাদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে রয়েছে।

***

যেহেতু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যেকোনো দলের মূল হোতারা সব সময় পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করে, সে কারণে এই ষড়যন্ত্রকারী দলের আসল নেতৃত্বও অজ্ঞাত ও অজানা থেকে গেছে। আমরা এ আলোচনায় এই অদৃশ্য ব্যক্তিদেরকে 'ষড়যন্ত্রের মূল উপাদান' বলে ব্যক্ত করব। আর অন্যান্য শহর ও গ্রামের যেসব বাসিন্দা এ ষড়যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাদেরকে ব্যক্ত করব 'বিদ্রোহী', 'বিশৃঙ্খলা ও দুর্যোগ সৃষ্টিকারী' ও 'ডাকাত' বলে। তবে এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, মূল উপাদান বলে যা বুঝানো হচ্ছে, তা কোনো অবাস্তব কল্পনা নয়। বরং প্রকৃত অর্থেই এ ধরনের মানুষের অস্তিত্ব ছিল। এ কারণেই অত্যন্ত নির্ভরশীলতার সঙ্গে এক্ষেত্রে একটি নাম উচ্চারিত হয়—'আবদুল্লাহ বিন সাবা'।[১০৪]

আবদুল্লাহ বিন সাবা

হজরত উসমান গনি রা. খলিফা নির্বাচিত হওয়ার কয়েক বছর পর ইয়েমেনের রাজধানী সানআর এক কৃষ্ণকায় ইহুদি ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দিল। মানুষের মুখে মুখে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল- আবদুল্লাহ বিন সাবা। ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দিয়ে সে কোনো সাহাবির সান্নিধ্যে সময় কাটাল না। বরং ইয়েমেন থেকে সে তার মিশন শুরু করে কয়েক বছরের মধ্যে হিজাজ, কুফা, বসরা ও শাম পর্যন্ত চষে ফেলল। দরবেশির চাদর মুড়ি দিয়েই সে মানুষের মধ্যে পরিচিত হলো। ধীরে ধীরে সে মানুষের মধ্যে একজন সংশোধনকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করল, যে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে।[১০৫]

যেমনিভাবে সেন্ট পল হজরত ঈসা আ. সম্পর্কে অতিমাত্রায় ভক্তি মিশ্রিত আকিদা প্রকাশ করে খ্রিষ্টানদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন

---

[১০৪] তারিখে দিমাশক : ২৯/৫-৯

[১০৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/২৬৩

করেছিল, সেভাবেই ইবনে সাবা অজ্ঞ লোকদের মধ্যে ধর্মীয় গুরুর মর্যাদা কুড়িয়ে নিয়েছিল। বহু সরলমনা মুসলমান তাকেই মনে করতে লাগল ইসলামের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত এবং রাহবার।

ইহুদিদের এ এজেন্ট ভালো করেই জানত, মুসলমানদের উত্থানের মূল রহস্য তাদের একতার মধ্যেই নিহিত। আর এ একতা গড়ে উঠেছে সাহাবিদের প্রতি উম্মাহর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা, সাহাবিগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি এবং ইসলামের খলিফাদের প্রতি তাদের অকৃত্রিম আস্থা ও ভালোবাসার সমন্বয়ে। এ রহস্য অনুধাবন করে ইবনে সাবা সাহাবিদের সম্পর্কে মানুষের অন্তরে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি ও খেলাফতের পদকেই বিতর্কিত করার চেষ্টা শুরু করল।

নব্য আকিদার প্রসার

ইবনে সাবা তার মতবাদের প্রচার শুরু করল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে। সে বলতে লাগল, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই হজরত ঈসা আ. এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি (রাসুল সা.) অবশ্যই পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসবেন।'[১০৬]

এই মনগড়া আকিদা প্রমাণ করার জন্য সে এ আয়াত তেলাওয়াত করল-

إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ إِلٰى مَعَادٍ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যে মহান সত্তা আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে আপনার বাসস্থানে ফিরিয়ে আনবেন।[১০৭]

অথচ এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময়। ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সসম্মানে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু এ তাফসির সম্পর্কে যাদের ধারণা ছিল না, তারা আবদুল্লাহ ইবনে সাবার প্রচারিত ওই মর্মই বিশ্বাস করে নিত।[১০৮]

---

[১০৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২৬৩

[১০৭] সুরা কাসাস, আয়াত ৮৫

[১০৮] তারিখে তাবারি : ৪/৩৪০

ইবনে সাবার পরবর্তী পাঠ ছিল 'প্রত্যেক নবীর একজন স্থলাভিষিক্ত থাকে। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হলেন হজরত আলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, আর হজরত আলি রা. সর্বশেষ স্থলাভিষিক্ত'।[১০৯]

এরপর ইবনে সাবা তার ভক্তদেরকে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য উসকে দিয়ে বলত, যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত বাস্তবায়ন করতে দেয় না, নবীজির অসিয়তকৃত ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকার ছিনিয়ে নেয় এবং নিজে উম্মতের যাবতীয় বিষয়ের বড় কর্তা বনে যায়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

একথা শুনে তার অবুঝ ভক্তরা যখন হজরত উসমান রা. কে খেলাফতের দখলদার বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে, তখন তাদেরকে আরো উত্তেজিত করার জন্য সে বলে বেড়ায়, নবীজির স্থলাভিষিক্তের উপস্থিতিতে উসমান অন্যায়ভাবে খেলাফত দখল করে রেখেছে। সুতরাং তোমরা এর প্রতিবাদে বেরিয়ে পড়ো এবং সংগ্রাম শুরু করো।[১১০]

বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রসমূহ

ইবনে সাবার ফেতনাই ছিল ইসলামি জনপদে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক প্রথম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। এই ফেতনার প্রধান ও প্রকাশ্য ঘাঁটি ছিল তিনটি। যথা: কুফা, বসরা এবং মিসরের প্রধান শহর ফুসতাত। এ শহরগুলো আবাদ হওয়ার বয়স হয়েছিল প্রায় বিশ বছর। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মানুষ এতে বসবাস শুরু করেছিল। নানা বর্ণের মানুষের সমাগমে সৃষ্টি হয়েছিল এক মিশ্র পরিবেশ। তা ছাড়া শহরগুলো বাণিজ্যিক-কেন্দ্ররূপেও ব্যবহৃত হতো। তাই প্রতিমুহূর্তে এখানে হরেক রকম মানুষের আনাগোনা চলতে থাকত। মূলত বাণিজ্যের সুবাদেই এ তিনটি শহর দ্রুত জনবহুল এলাকায় পরিণত হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, নতুন কোনো শহর যখন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাগমস্থল এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগের

---

[১০৯] তারিখে তাবারি : ৪/৩৪০

[১১০] তারিখে তাবারি : ৪/৩৪১

কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তখন সেখানে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হয়। অশান্তি সৃষ্টিকারী চালবাজ ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের এজেন্ডরা সেখানে এসে গা ঢাকা দেওয়ার সুযোগ পায় এবং তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনাও সহজ হয়ে যায়। এই সুযোগে তাদের জন্য সেখানে এসে বসবাস গড়ে তোলাও সহজ হয়। কুফা, বসরা, ফুসতাত, মূলত এমনই নতুন শহর ছিল। ফলে দাঙ্গাবাজদের জন্য এতে ঘাঁটি গড়ে তোলা সহজ ছিল।

কুফা ও বসরা সম্পর্কে সম্মানিত পাঠকবর্গের এ বিষয়টি মনে রাখা ভালো হবে যে, এ শহর-দুটি আবাদ হয়েছিল হজরত উমর রা. এর শাসনামলে। কিন্তু আবাদ হওয়ার প্রাথমিক স্তরটি অতিক্রম করার সময় থেকেই এখানকার লোকদের মধ্যে শাসকদের আনুগত্য বর্জন করার ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছিল।

হজরত উমর রা. এ অবস্থা আঁচ করেই হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করার সময় বলেছিলেন, আপনাকে আমি এমন জায়গার দায়িত্বশীল বানিয়ে পাঠাচ্ছি, যেখানে শয়তান ডিমও দিয়েছে এবং ছানাও ফুটতে শুরু করেছে।[১১১]

একই অবস্থা ছিল কুফানগরীরও, যেখানকার অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু তারা ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন করত। এ কারণে হজরত উমর রা. তার শাসনামলে খুব চিন্তিত ছিলেন যে, এ এক লক্ষ মানুষ কোনো শাসকের প্রতিই সন্তুষ্ট থাকছে না।[১১২]

হজরত উমরা রা. এর শাসনামলে হজরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা.-ও কিছুদিন কুফার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির একজন। কিন্তু তাকেও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। কিছু মানুষ হজরত উমর রা. এর কাছে অভিযোগ করে বলেছিল, তিনি সঠিকভাবে নামাজ আদায় করান না।[১১৩]

---

[১১১] তারিখে তাবারি : ৪/৭০-৭১

[১১২] তারিখে তাবারি : ২২ হি., ৪/১৬৩-১৬৬

[১১৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৫৫,

এমনকি এক ব্যক্তি এ পর্যন্ত বলেছিল যে, 'আপনি ইনসাফ করেন না, সম্পদ ন্যায্যভাবে বণ্টন করেন না এবং জিহাদও করেন না।'[১১৪]

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে হজরত উমর রা. হজরত সা'দ রা. এর স্থলে নম্র স্বভাবের হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। কিন্তু কুফার মানুষ রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় দুর্বল আখ্যায়িত করে তাকেও ফেরত পাঠিয়ে দেয়। হজরত উমর রা. তখন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'এদের জন্য কঠোর শাসক নিযুক্ত করলে তার দোষ ধরে। আবার নরম শাসক নিযুক্ত করলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।'[১১৫]

এই তিনটি শহর ছাড়া চতুর্থ একটি শহরও সবার অলক্ষে বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেটি ছিল দামেশক। পরিবেশ ও গঠন উভয় দিক থেকেই এটি ছিল পূর্বের তিন শহর থেকে ভিন্ন এবং প্রাচীন। মূলত এটি ছিল এক ক্ষমতাশীল বংশ বনু উমাইয়ার রাজনৈতিক কেন্দ্র ও সেনাঘাঁটি। এখানকার বাসিন্দাদের চলাফেরা ছিল পরিপাটি এবং তারা শাসকদের প্রতি আস্থাশীলও ছিল। তাদের মধ্য থেকে কারো জন্য স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা সম্ভব ছিল না। তাই দামেশকের জন্য ইবনে সাবার পলিসিও ছিল ভিন্ন। অত্যন্ত সঙ্গোপনে এবং ধীরগতিতে কাজ চালাতে হয়েছিল। তাই হজরত উসমান রা. এর শাসনামলের শেষপর্যন্ত এখানে কিছুই হয়নি।

যাই হোক, এসব রহস্য বলে দেয়, অবাধ্য ও কেন্দ্র থেকে পলাতক ব্যক্তি-গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র হজরত উসমানের পূর্ববর্তী খলিফাদের যুগেই দৃষ্টির অন্তরালে কাজ শুরু করেছিল। তখন থেকেই কুফা ও বসরায় এর ফল প্রকাশ পেতেও শুরু করেছিল।

হজরত উমর ও হজরত উসমান রা. এর কৌশলগত ভিন্নতা ও তার ফল

সাধারণত ঐতিহাসিকগণ লিখে থাকেন, হজরত উসমান রা. তার খেলাফতের প্রথম ছ' বছর হজরত আবু বকর ও উমর রা. এর আদর্শ

---

[১১৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৫৫,

[১১৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা : ২৭৪;
এরপর হজরত উমর রা. কুফার জন্য হজরত মুগিরা বিন শুবাহ রা. কে নিযুক্ত করেন। তিনি হজরত উমরের মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

অনুযায়ী চলেছেন। কিন্তু এরপর তিনি পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। আর এ পরিবর্তনকে একটি দল এই অর্থে নিয়েছে যে, ছয় বছর পর তিনি—আল্লাহ পানাহ—জুলুম-নির্যাতন এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যপহরণের অপরাধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ফলে উম্মাহ তার বিরুদ্ধে ফুসে উঠেছিল।

অন্যদিকে কিছু ঐতিহাসিকের দাবি, হজরত উসমান বিন্দুপরিমাণ পরিবর্তিত হননি।

এ উভয় মত থেকে প্রথমটি তো সম্পূর্ণ ভুল এবং নির্জলা মিথ্যাচার ও অপবাদ। আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে কথা হলো, এটা এ অর্থে সঠিক যে, হজরত উসমান শেষ ছ' বছরেও ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, দেশ ও জাতির কল্যাণকামী এবং রাষ্ট্রের একজন যোগ্য শাসকরূপে চলেছেন। শরয়ি বিধানের বাস্তবায়ন এবং জাতীয় কল্যাণ রক্ষা করাই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল।

তবে এও আরেক বাস্তবতা যে, ২৭-২৯ হিজরি পর্যন্ত মুসলিমবিশ্বের ক্যানভাসে এক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, যার ব্যাখ্যা হলো, এ সময়টাতে মুসলিমবিশ্বের আটটি অংশ ছিল। যথা :

জাযিরাতুল আরবে- মক্কা, মদিনা, ইয়েমেন ও বাহরাইন।
পূর্বে কুফা ও বসরা।
পশ্চিমে দামেশক ও মিসর।

মদিনা ও তার আশপাশে জাযিরাতুল আরবের কোনো অংশে, অর্থাৎ মক্কা, ইয়েমেন, বাহরাইনের কোথাও কোনো সেনাছাউনি ছিল না। এসব এলাকার গভর্নরদের হাতে ছিল কেবল সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব। সেনাছাউনি ছিল দামেশক, মিশর, কুফা ও বসরায়। যোগাযোগ ও বসবাসের দিক থেকেও সবচেয়ে বড় শহর ছিল এগুলো। দেশের সামরিক শক্তিও ছিল এ চার শহরের গভর্নরদের হাতে।

২৭ হিজরি পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই ছিল। এই চার বড় শহরের দুটির গভর্নর ছিল হজরত উসমান রা. এর আত্মীয়। অর্থাৎ শামে হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং কুফায় হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা.। অন্যদিকে অপর দুই শহরের গভর্নর ছিল ভিন্ন গোত্রের। বসরায় ছিলেন হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এবং মিসরে হজরত আমর ইবনুল আস রা.।

কিন্তু ২৭ হিজরিতে হজরত উসমান রা. মিসর থেকে হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে সরিয়ে তদস্থলে তার দুধভাই আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. কে এবং ২৯ হিজরিতে বসরা থেকে হজরত আবু মুসা আশআরি রা.কে সরিয়ে তদস্থলে আপন মামাতো ভাই হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. কে নিযুক্ত করেন।

এই রদবদলের পেছনে আসলে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা গোত্রীয় স্বার্থ ছিল না। তবে বলা হয়, হজরত উসমান রা. এর স্বভাবে নম্রতা, উদারতা ও মানবতাবোধ অনেক বেশি ছিল। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও তিনি অন্যদের চেয়ে অধিক যত্নবান ছিলেন। আর আত্মীয়তার বন্ধন জুড়ে রাখার প্রেরণা থেকেই তিনি এর আগেও দু'একটি এমন কাজ করেছিলেন, যা নিঃসন্দেহে জায়েজ; বরং এক হিসেবে উত্তমও ছিল। কিন্তু তারপরও সাধারণ মানুষ তাকে দেখেছিল অন্যরকম দৃষ্টিতে।[১১৬]

---

[১১৬] যেমন হজরত উসমান রা. এর দুধসম্পর্কীয় ভাই হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখকও ছিলেন। তিনি যখন মুরতাদ হয়ে মক্কার মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন, তখন এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু সাহাবিগণই নয়; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রাগান্বিত হয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় সাধারণ ক্ষমা থেকে নবীজি আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. কে বাদ দিয়েছিলেন এবং তাকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু হজরত উসমান রা. তাকে নিরাপত্তা দান করেন। তারপর একদিন তাকে নিয়ে আল্লাহর নবীর দরবারে উপস্থিত হন। বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আবদুল্লাহকে বাইয়াত করে নিন। পরপর তিন বার বলার পরও নবীজি তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে বাইয়াত করে নিয়েছেন। কিন্তু সেই সাথে সাহাবিগণকে একথাও বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে কি একজনও এমন বুদ্ধিমান ছিল না যে, আমাকে তার বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত রাখত এবং তাকে হত্যা করে ফেলত? সাহাবিগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা তো আপনার মনের ইচ্ছার কথা বুঝতে পারিনি। আপনি যদি একটিবার চোখে ইশারা করতেন! নবীজি ইরশাদ করলেন, চোখ দিয়ে প্রতারণার ইঙ্গিত করা কোনো নবীর আদর্শ হতে পারে না। (-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩৫৯) অবশেষে পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। (-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩৫৮)
দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণের পর হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. বড় উত্তম মুসলমান প্রমাণিত হয়েছিলেন। (-সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৩৩)
একইভাবে হজরত উসমান রা. এর চাচা হাকাম ইবনে আস রা.কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাম কোনো কারণে দেশান্তর করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হজরত উসমান

এ ছাড়া হজরত উসমান রা. তার বংশ ও গোত্রের গরিব লোকদের নিজের পকেট থেকে মন উজাড় করে প্রচুর পরিমাণে দান করতেন। আর্থিকভাবে তাদেরকে সচ্ছল করে তোলার পাশাপাশি সামাজিকভাবেও তাদেরকে উন্নত ও মর্যাদাশীল করে তোলার চেষ্টা করতেন। এদের থেকে উপযুক্ত ও আস্থাভাজন যুবকদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে তাদের থেকে উম্মতের খেদমত গ্রহণ করতে চাইতেন।

মূলত এ চিন্তাভাবনার কারণেই তিনি আত্মীয়স্বজনকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিতেন। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা পরিকল্পনা ছিল না। আর এভাবে রদবদল করতে করতে মুসলিমবিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর যে চিত্র তৈরি হয়েছিল, তা এই:

১. মদিনা : মদিনা ছিল খেলাফতের প্রধানকেন্দ্র। এখান থেকেই পুরো মুসলিম জাহানে আদেশ-নিষেধ জারি করা হতো। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এখান থেকেই নেওয়া হতো। আর এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে খেলাফতের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে ছিল উমাইয়া বংশের যুবক, হজরত উসমান রা. এর চাচাতো ভাই মারওয়ান বিন হাকাম।[১১৭]

২. দামেশক : এখান থেকে পুরো শাম, লেবানন, ফিলিস্তিন, জর্দান ও এশিয়া মাইনরকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। আর হজরত উসমান রা. এর

রা. তার শাসনামলে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনেন এবং সেই সাথে এক লক্ষ (দিরহাম বা দিনার)ও দান করেন। (-সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১০৮) তারপর আত্মীয়তার সম্পর্কের টানে আরো যা করলেন তা হলো, চাচা হাকামের পুত্র মারওয়ানকে নিজের লিপিকার ও একান্ত সহযোগীরূপে গ্রহণ করে নেন। (-সিয়ারু আলামিন নুবালাা : ৩/৪৭৭)

যেহেতু কোনো কোনো মুসলমানের দৃষ্টিতে সে এখনো বিকৃত ছিল, তাই এ বিষয়টিকে হজরত উসমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অংশ করে নেওয়া হয়। নিজের পক্ষ থেকে আত্মীয়তার ভিত্তিতে তিনি যে আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন, তাকে মানুষ ভাবল তিনি সরকারি সম্পদ দিয়ে দানশীলতা দেখাচ্ছেন।

হজরত উসমানের বিরুদ্ধে চালানো এসব অপপ্রচারের বিস্তারিত জবাব সামনে আসছে।

[১১৭] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, খলিফা বিন খাইয়াত : পৃষ্ঠা : ১৭৯

আগ থেকেই এ এলাকার গভর্নর ছিলেন উমাইয়া বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি হজরত মুয়াবিয়া রা.।[১১৮]

৩. মিশর : এখান থেকে গোটা আফ্রিকা অঞ্চল পরিচালনা করা হতো। ২৭ হিজরিতে এখানে আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. কে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়, যিনি ছিলেন হজরত উসমান রা. এর দুধভাই।[১১৯]

৪. বসরা : এখান থেকে গোটা ইরান, পারস্য উপসাগরের উপকূল এবং খোরাসান নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ২৯ হিজরিতে এখানে হজরত উসমান রা. এর মামাতো ভাই হজরত আবদুল্লাহ বিন আমেল রা. কে শাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[১২০]

৫. কুফা : এখান থেকে ইরাক ও আলজাযিরা শাসন করা হতো। ২৯ হিজরি পর্যন্ত হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. গভর্নর ছিলেন।[১২১] ২৯ হিজরিতে তার স্থলে হজরত সাঈদ ইবনে আস রা. কে নিয়োগ করা হয়। তিনি ৩৪ হিজরি পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। আর এরা উভয়ে ছিলেন উমাইয়া বংশের সন্তান।[১২২]

এভাবে দেশের বড় বড় চার শহরেরই গভর্নরের পদ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একটি বংশের লোকদের হাতে এসে পড়েছিল। তা ছাড়া যেহেতু হজরত উসমান রা. নিজেও উমাইয়া বংশের ছিলেন, তাই অজ্ঞ লোকদের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হতে লাগল যে, হজরত উসমান জাতীয় কল্যাণের ভিত্তিতে

---

[১১৮] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত : পৃষ্ঠা : ১৭৮

[১১৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত : পৃষ্ঠা : ১৭৮... হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. এর পূর্বে মিসরের গভর্নরের কর্মকর্তা ছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৩৪)

[১২০] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত : পৃষ্ঠা : ১৭৮। এর পূর্বে পারস্য ও বসরায় ভিন্ন ভিন্ন গভর্নর ছিল। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের একই সাথে উভয় অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত হন।

[১২১] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত : পৃষ্ঠা : ১৭৮। এর পূর্বে ওয়ালিদ বিন উকবা আল জাযিরার আরব অঞ্চলে, যেখানে বনু তাগলাবের বসবাস ছিল, সে এলাকায় সদকা সংগ্রহের প্রধান দায়িত্বশীল ছিল। (-তাহযিবুত তাহযিব, ১১/১৪২)

[১২২] রাসুল সা. এর ইনতেকালের সময় হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. ছিলেন মাত্র ৯ বছরের বালক। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/৩১) কিন্তু এতটা সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান এবং উপযুক্ত ছিলেন যে, কারো কারো মতে খলিফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪৪৫)

নয়; বরং নিজের বংশের মান-মর্যাদা উঁচু করার লক্ষ্যে আত্মীয়স্বজনকে পদের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন।

মানুষের এ ধারণা যদিও সম্পূর্ণ ভুল ও অমূলক ছিল, তবু মানুষকে এর থেকে ফেরানো যাচ্ছিল না। হজরত উসমানের শেষ ছয় বছরে সত্যিই যদি কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকে, তা হলে তা এগুলোই এবং এটুকুই ছিল। আর যেহেতু এটা জায়েজ পরিমাণের ভেতরেই ছিল, তাই বড় বড় সাহাবিগণও এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন। যদি জায়েজের সীমা অতিক্রম করত, তা হলে নিশ্চয়ই তারা সর্বাত্মকভাবে এর সংশোধনের চেষ্টা করতেন।

এ ছিল ঘটনার একটি নিশ্চিন্ত দিক এবং এতে উদ্বেগের কিছুই ছিল না। কিন্তু এর সাথে অপর যে দিকটি ছিল, তা ছিল নিঃসন্দেহে সংশয় উদ্রেককারী। তা এই যে, যে সাবায়ি দলটি এতদিন পর্যন্ত দৃষ্টির আড়ালে ছিল, তাদের জন্য এই এক-আধটি কথার সাথে আরো একশটা বানোয়াট মিলিয়ে মুসলমানদের পরস্পর বিবাদে লাগিয়ে দেওয়ার এবং রীতিমতো এক গৃহযুদ্ধ জাগিয়ে তোলার সুযোগ হাতে এসে পড়ল। সর্বময় কল্যাণের সেই সোনালিযুগে কোনো শোরগোলই সম্পূর্ণ উড়োকথার ভিত্তিতে রটতে পারত না। বরং এটা তো সৃষ্টিগতভাবে এক বাস্তবতা যে, সরকারবিরোধী যেকোনো আন্দোলনের জন্যই কিছু না কিছু ছুতার প্রয়োজন হয়, যেগুলোকে তালগোল পাকিয়ে তারা মানুষকে উসকে দিতে পারে।

হজরত উসমান রা. এর শাসনামলের ষষ্ঠ বছরে সাবায়িদের হাতে এ রকম একটি কথা এমন মিলে গেল, যাকে তারা তাদের উপাখ্যানের প্রারম্ভিকা বানিয়ে নিল। এখানে এসে আমাদের ধারণা হয় হজরত আবু বকর এবং হজরত উমর রা. কতটা দূরদর্শী ও পরিণামদর্শী ছিলেন। তারা দুজন সমস্ত মর্যাদা ও ফজিলতের ক্ষেত্রে হজরত উসমান-সহ অন্য সকল সাহাবির চেয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তেমনি শাসনকার্য ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও অগ্রগামী ছিলেন।

হজরত আবু বকর ও উমর রা. এর কর্মকৌশলের একটি সূক্ষ্ম দিক এই ছিল যে, আপনজন ও আত্মীয়স্বজন এবং নিজ গোত্রের

লোকদেরকে যথাসাধ্য বড় বড় পদ থেকে দূরে রাখতেন, যেন কোনো দুষ্ট লোকের এমন বাজে ধারণা করার সুযোগই না হয় যে, ইসলামের খেলাফতের উপর এক বংশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হজরত উমর রা. মৃত্যুর পূর্বে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত উসমান ও হজরত আলি রা. কে বিশেষভাবে এ উপদেশ দিয়েছিলেন যে, কখনো যদি তোমাদেরকে শাসক নিযুক্ত করা হয়, তা হলে আপনজন ও আত্মীয়স্বজনকে মানুষের উপর শাসক রূপে নিয়োগ দিয়ো না।[১২৩]

কিন্তু হজরত উসমান মনে করতেন, নিজের আত্মীয়স্বজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসালে যদি দেশ ও জাতির কল্যাণকর হয়, তা হলে তাতে দোষের কিছু নেই। হজরত উমর রা. এর উপদেশ শরয়ি কোনো বিধান ছিল না যে, সর্বাবস্থায় তা মানতে হবে। তাই হজরত উসমান পরিচালনাগত প্রয়োজনের খাতিরে তার কিছু আত্মীয়কে বড় বড় পদে নিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং কখনোই এই ধারণা করা যায় না যে, তিনি তার দায়িত্বে উদাসীন হয়ে এবং উম্মতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এমনটা করেছেন। তিনি যা করেছেন, একজন শাসক হিসেবে সেটিকেই তিনি জাতির জন্য কল্যাণকর মনে করেছেন। তা ছাড়া এসব পদের অধিকারী

১২৩

روى عبد الرزاق فى مصنفه بسند صحيح متصل فيه : وان كنت يا عثمان على شيئ فا تق الله ولا تحمل بنى ابى معيت على رقاب الناس، (ح : ٩٧٧٢) ورواه ابو محمد الحارث ابن ابى اسامة (م ٢٨٢هـ) باسناد متصل رجاله ثقات. (مسند الحارث مع بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : ٦٢٢/٢) ورواه ابن ابى شيبة فى مصنفه (ح : ٣٧٠٧١ بسند صحيح الى حسن بن محمد بن الحنفية)

وفى رواية الطحاوى : وان كنت يا عثمان على شيئ من امر الناس فلا تحملن بنى ابى معيت على رقاب الناس، وان كنت يا على على شيئ من امر الناس فلا تحملن بنى هاشم على رقاب الناس، (شرح مشكل الآثار، ح : ٤٩٥٥، ط الرسالة)

তহাবি শরিফের ইবারতের অনুবাদ :
হে উসমান, তোমাকে যদি মানুষের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আবি মুঈতের বংশধরকে মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ো না। এবং হে আলি, তোমাকে যদি মানুষের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে হাশেমের বংশধরকে মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ো না।

লোকদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোনো অভিযোগও ছিল না। সাধারণ অবস্থায় কারো এমন সুযোগ হতো না যে, এদের বংশ বা গোত্র নিয়ে কোনো বিতর্কের সৃষ্টি করবে।

কিন্তু দাঙ্গাবাজ লোকেরা আগে থেকেই গণ্ডগোল বাধানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। তাই তারা উপরোক্ত প্রেক্ষাপটের সাথেই মিথ্যার মিশেল দিয়ে মুসলমানদেরকে বিপথগামী করার জন্য যা করেছিল, তার বিবরণই সামনে আসছে।[১২৪]

---

[১২৪] হজরত উসমান রা. এর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ফলে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আপনজনকে ক্ষমতায় বসানোর বৈধতা স্পষ্ট হয়ে গেছে। যদি তিনি যেকোনো মূল্যে হজরত উমরের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতেন, যেটি চূড়ান্ত পর্যায়ের তাকওয়া ও খোদাভীতির উপর নির্ভরশীল ছিল, তাহলে হয়তো এটি পৃথক একটি নিয়ম হয়ে যেত। যার ফলে কোনো খোদাভীরু শাসকও নিরুপায় অবস্থায় আপনজনের যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারত না।

সাবায়ি ফেতনা ও মুসলিম শাসকদের কাজের সমালোচনা

দাঙ্গাবাজ সাবায়ি-সংঘ ততদিনে বেশ ভালোই শেকড় ছড়িয়ে ছিল। ইসলামি শাসনব্যবস্থা দুর্বল; বরং টুকরো টুকরো করা এবং মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ উসকে দেওয়া ছিল এদের একমাত্র টার্গেট। আর হজরত উসমান রা. এর সাথে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের আত্মীয়তার বিষয়টিকে এই হতভাগারা তাদের ঘৃণ্য অপপ্রচারের হাতিয়ার বানিয়ে নিল।

তারা প্রথমত এ বিষয়টিকে বাতাস দেওয়ার চেষ্টা করল যে, হজরত উসমান—আল্লাহ পানাহ—স্বজনপ্রীতি করেন। তিনি আপনজনকে প্রাধান্য দেন এবং অন্যদের বঞ্চিত করেন। সাথে সাথে তারা একথাও রটিয়ে দিল যে, আপনজনকে বড় পদের অধিকারী বানানোর উদ্দেশ্যে বড় বড় সাহাবিকে পদচ্যুত করে তিনি জঘন্য অপরাধ করেছেন।

অনেক সময় একটি বিষয় সত্য হয় বটে; কিন্তু তাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সে রকমই হয়েছিল এখানে। একথা সত্য যে, যুবকদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার ফলে প্রবীণদের পেছনে না গিয়ে উপায় ছিল না।[১২৫] কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ সকল যুবক সাহাবি যদি

---

[১২৫] কুফার গভর্নর হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির একজন। পক্ষান্তরে তার পরিবর্তে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা, তিনি ছিলেন মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী এবং পেছনের সারির সাহাবি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪১৩, আল ইসাবাহ: ৬/৪৮২) এমনিভাবে হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর পরে নিযুক্ত হজরত সাঈদ ইবনুল আসও ছিলেন অল্প বয়স্ক সাহাবি। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/৩১)
অন্যদিকে হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর স্থলে নিয়োগপ্রাপ্ত হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ যেহেতু একবার মুরতাদ হয়েছিলেন, তাই তার সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুব একটা ভালো ছিল না। তবে মক্কাবিজয়ের সময় দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ঈমানের উপর অটল ছিলেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ১/৪৪৯)

নিজ নিজ পদের জন্য যোগ্য হয়ে থাকেন, তা হলে তাদেরকে পদে সমাসীন করার দ্বারা কোন বড় ক্ষতি হয়ে গেছে[১২৬]?

আর হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর পরিবর্তে বসরায় নিযুক্ত করা হয়েছিল হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. কে। অথচ তার জন্ম চার হিজরিতে। অর্থাৎ ২৯ হিজরিতে গভর্নর পদে নিযুক্ত হওয়ার সময় তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। (তারিখুল ইসলাম লিয জাহাবি : ৪/২৮৫, ২/৫১৬)

[১২৬] বাস্তবতা এই যে, সাহাবায়ে কেরামের এই যুবশ্রেণিটি নেতৃত্বদানের সেইসব সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার গুণে ভালোভাবেই উত্তীর্ণ ছিলেন, যেসব গুণে আরবের অন্যান্য গোত্র থেকে নবু উমাইয়া অনন্য ছিল। যদি তাবাকাতে সাহাবা এবং ইতিহাসের কিতাব খুলে দেখা হয়, দেখা যাবে, ঐতিহাসিকগণ এদের সকলকে দানশীল, সাহসী, সম্ভ্রান্ত, দূরদর্শী ও ন্যায়পরায়ণরূপে গণ্য করেছেন। শুধু ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর উপর উত্থাপিত অভিযোগটি তার ব্যতিক্রম। সে সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে। এ ছাড়া কোনো দুর্বল বর্ণনা দ্বারাও তাদের কারো কোনো দোষ প্রমাণ করা কঠিন।

আর আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ থেকে পূর্বে যা হয়েছে, তা তো হয়েছে। কিন্তু الاسلام يهدم ما كان قبله এর মর্ম অনুসারে ২য়বার ইসলামগ্রহণের পর তাকেও কোনো বিষয়ের জন্য দোষারোপ করা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা মেনেও নিই যে, কোনো কোনো আমির থেকে দু'একটি ভুল হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষের দু'চারটি অভিযোগ আসলেই সত্য ছিল, তবু সেটা গুরুতর কিছু নয়। কারণ হজরত উসমান রা. এর শাসনকাল ছিল দীর্ঘ ১২ বছর এবং শাসনাধীন এলাকার পরিমাণ ছিল ৪৪ হাজার বর্গমাইল। এ দীর্ঘ জীবনে এবং এত বিশাল এলাকায় এমন দু'একটি ঘটনা ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সাবায়িরা যদি তাদের সমালোচনা করে পরিবেশ ঘোলাটে না করত, তাহলে অবশ্যই দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকত। মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাত। সাধারণ মানুষের এ নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা থাকত না যে, কোন্ আমির তাদের শাসন করছে এবং সে কোন্ বংশ বা গোত্রের সন্তান।

মানুষের একটি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নিজের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সম্পর্কে সে সোচ্চার থাকে। কিন্তু সে অধিকার যদি সে কোনো অচেনা ব্যক্তি বা অমুসলিমদের থেকেও বুঝে পায়, তবে তাতেও সে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে নিজ বংশের কারো হাতেও যদি অধিকার লঙ্ঘিত হয়, সেটাও সে মেনে নিতে পারে না।

সুতরাং হজরত উসমান রা. যখন বাছাই করে সৎ ও যোগ্য যুবকদেরকে মানুষের সেবার জন্য আদেশ করেন, তখন এতে মানুষের কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়। বরং যাদের স্থলে যুবকদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাদের কারো মুখে নবনিযুক্ত যুব দায়িত্বশীল সম্পর্কে প্রশংসামূলক কথাও বর্ণিত আছে। যেমন : হজরত আবু মুসা আশআরি রা. যখন জানতে পারলেন, বসরার জন্য তার স্থলে হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. কে নিযুক্ত করা হয়েছে, তখন বসরাবাসীকে সম্বোধন করে বলেন,

ইতিহাস থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, হজরত উসমান রা. যেসব যুবক সাহাবিকে উচ্চপদে সমাসীন করেছিলেন, তারা প্রত্যেকে আশানুরূপ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. বসরার গভর্নর হয়ে খোরাসান অঞ্চলে যে ধারাবাহিক বিজয়ের সৃষ্টি করেছিলেন, তা ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এভাবে হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. মিসর ও আফ্রিকার আয়ে অসাধারণ প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছিলেন এবং জিহাদের অগ্রযাত্রা বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়েছিলেন। এরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল যাতুস সাওয়ারির যুদ্ধ।[১২৭]

কিন্তু দুষ্কৃতিকারীরা হজরত উসমান রা. এর ব্যবস্থাপনাগত এসব সিদ্ধান্তকে নেতিবাচক রঙ চড়িয়ে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করার আগেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। তাই আবদুল্লাহ বিন সাবা তার ষড়যন্ত্রকে সম্মুখে অগ্রসর করার লক্ষ্যে নৈকট্যভাজন ব্যক্তিদেরকে এভাবে নির্দেশনা প্রদান করল : আন্দোলনের সূচনা করতে হবে উসমানের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের সমালোচনার মাধ্যমে। সাথে সাথে মানুষকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে থাক, যাতে তোমরা মানুষের হৃদয় জয় করতে পার। তারপর মানুষকে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবে।[১২৮] যেহেতু এ মুষ্টিমেয় লোক হজরত আলি রা. কে 'অভিভাবক'রূপে গ্রহণ করেছিল, তাই হজরত উসমানের পতন ঘটানো এদের দৃষ্টিতে ছিল একটি উত্তম কাজ। একথা ভেবেই তারা এ সংকল্পের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল। তাদের প্রাথমিক অপপ্রচার কেবল এ পর্যন্তই ছিল যে, তারা তরুণ-যুবাদেরকে আমির নিযুক্ত করার বিষয়টিকে একটি বংশের ঠিকাদারি এবং অন্যান্য বংশের মূলোৎপাটন রূপে ব্যক্ত করল। একথা বলে হজরত উসমান রা. এবং

তোমাদের জন্য এমন এক যুবক আসছে, যার দাদি ও ফুফিদের বংশ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৬১)

কিন্তু আফসোস হলো, শান্তির পরিবেশ নষ্ট করার জন্য সাবায়িরা ছোট ছোট বিষয়কে ফলাও করে এমনভাবে প্রচার করত, বহু মানুষ তাদের চক্রান্তে ফেঁসে যেতো। আর এভাবেই সূত্রপাত হয়েছিল বিদ্রোহের এক জঘন্য দুর্যোগ।

[১২৭] এসব বিজয়ের বিস্তারিত ইতিহাস 'তারিখে খলিফা' এবং 'তারিখে তাবারি'তে ২৭-৩৩ হিজরির আলোচনায় দেখা যেতে পারে।

[১২৮] তারিখে তাবারি : ৪/৩৪

তার নিয়োগকৃত আমিরদের প্রতি সাধারণ মানুষের অন্তরে ঘৃণা জাগিয়ে তুলল। আর তৎকালীন সমাজও মানুষের সমাজই ছিল। তাই সাবায়িদের এসব অপপ্রচার দ্রুত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে শুধু সাধারণ মানুষই নয়, হজরত উসমানের ক্রোড়ে প্রতিপালিত মুহাম্মদ বিন আবি হুযাইফা এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর পুত্র মুহাম্মদও এ ষড়যন্ত্রের জালে ফেঁসে গেলেন এবং হজরত উসমানের ঘোর সমালোচনাকারীদের দলে শামিল হয়ে গেলেন।[১২৯]

---

[১২৯] তারিখুল ইসলাম লিযজাহাবি : ৩/৬০২, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪৮০-৪৮২

ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর ঘটনা

এই যখন ছিল পরিস্থিতি, তখন এমন এক ঘটনা ঘটে গেল, যাকে হজরত উসমানের বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে পরিবেশ সৃষ্টি করার মোক্ষম সুযোগ মনে করল। ঘটনা এই যে, কুফার গভর্নর এবং হজরত উসমান রা. এর চাচাতো ভাই ওয়ালিদ বিন উকবার বিরুদ্ধে মদপানের অপবাদ আরোপ করা হলো। ঐতিহাসিকগণ এব্যাপারে একমত যে, হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও উত্তম চরিত্রের কারণে সবার হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। তার ঘরে কোনো দরজা ছিল না। যেকোনো সময় যেকেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে পারত।[১৩০]

এসব বিষয়কে সামনে রাখলে হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর থেকে মদপানের শিকার হওয়া ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। আজও আমাদের চিন্তায় প্রশ্ন ওঠে যে, সত্যিই তিনি এই পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিলেন, নাকি তার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, যা এত ভয়ানক ছিল যে, সে যুগের প্রবীণ সাহাবিগণও একথা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন? তাই সহিহ বর্ণনার আলোকে জানা যায় যে, তার বিরুদ্ধে শরয়ি সাক্ষ্য (যা কেবল ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীরাই দিতে পারে) সম্পন্ন হয়েছিল এবং তার উপর শরয়ি দণ্ডও কার্যকর করা হয়েছিল।[১৩১]

তা সত্ত্বেও এসব বর্ণনা থেকেই এ ধারণাও হয় যে, এ অপবাদকে সত্য বলে মেনে নিতে প্রথম দিকে হজরত উসমান রা. এর অন্তরে অবশ্যই

---

[১৩০] তারিখে তাবারি : ৪/২৭৫

[১৩১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৯৬ অধ্যায় : হজরত উসমান রা. এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। হাদিস : ৩৮৭২, অধ্যায় : হাবশার হিজরত। সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৫৪, শরয়ি দণ্ডবিধি পর্ব।
ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর উপর দণ্ড প্রয়োগ সংক্রান্ত সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের বর্ণনাসমূহের পূর্ণ অনুবাদ পরবর্তী টীকায় উল্লেখ করা হলো।

সংশয় ছিল। সম্ভবত তিনি ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করছিলেন। যার ফলে শাস্তি প্রয়োগে বিলম্ব হয়েছিল এবং একে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন দানা বাধছিল যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো ইনসাফের দাবি পূর্ণ হবে না। অথচ হজরত উসমানের ইচ্ছা কখনোই এমন ছিল না যে, শরয়ি বিধানকে তিনি স্থানচ্যুত করবেন।[১৩২]

---

[১৩২] বুখারি শরিফের বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ বিন আদি বিন খিয়ার বলেন, মিসওয়ার বিন মাখরামা এবং আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুস আমাকে বললেন, 'আপনার কোথায় বাধা যে, আপনি আপনার মামা উসমানকে তার চাচাতো ভাই ওয়ালিদ সম্পর্কে কথা বলবেন। কেননা যে কাজ সে করেছে, তার জন্য মানুষ নানা রকম বাজে কথা বলছে।'

তারপর হজরত উসমান রা. যখন নামাজের জন্য বের হলেন, আমি (আবদুল্লাহ বিন আদি বিন খিয়ার) তার কাছে গেলাম। আমি বললাম, আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন ছিল, আর সেটি একটি কল্যাণকর কথা।

তিনি বললেন, 'আরে ভাই, আমি তোমাদের থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

তারপর আমি লোকদের কাছে ফিরে গেলাম। নামাজ শেষ করে মিসওয়ার বিন মাখরামা ও ইবনে আবদে ইয়াগুসের পাশে গিয়ে বসলাম এবং হজরত উসমানের সাথে আমার কথোপকথন তাদেরকে শোনালাম।

তারা উভয়ে আমাকে বলল, 'আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।'

আমি তাদের কাছেই বসে ছিলাম। ইত্যবসরে হঠাৎ হজরত উসমানের বার্তাবাহক (আমাকে ডাকতে) এসে পড়ল। তখন ঐ দুজন বলতে লাগল, 'আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন' (অর্থাৎ তারা ভেবেছিল, হজরত উসমান তাকে ডেকে নিয়ে শাসাবেন। অথচ হজরত উসমানের চরিত্র এর চেয়ে হাজারগুণ উত্তম ছিল)।

আমি হজরত উসমানের সম্মুখে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, 'তুমি যে কল্যাণকর বিষয়ের কথা বলছিলে, সেটি কী?'

আমি প্রথমে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলাম। তারপর বললাম, মহান আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন এবং তার প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব নাজিল করেছিলেন। আর আপনি সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিলেন। আপনি প্রথম দুটি হিজরতের উভয়টিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং তার মহান আদর্শ কাছে থেকে অবলোকন করেছেন।

পরকথা এই যে, আজকাল মানুষ ওয়ালিদ বিন উকবার বিষয়ে (আপনার বিলম্বের কারণে) নানারকম বাজে মন্তব্য করছে। সুতরাং আপনার জন্য জরুরি হলো, আপনি তার উপর অনতিবিলম্বে দণ্ড প্রয়োগ করুন।

হজরত উসমান রা. বলতে লাগলেন, হে ভাতিজা, তুমি আল্লাহর রাসুলকে দেখেছিলে?

আমি বললাম, না। তবে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শিক্ষা-দীক্ষা পর্দার অন্তরালের কুমারী কন্যার কাছেও পৌঁছেছিল, তা আমার কাছেও এসেছে।
এরপর হজরত উসমান কথা বলতে শুরু করলেন। প্রথমে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তার প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব নাজিল করেছেন। আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং নবীজিকে যে দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি যেমনটি বললে, আমি প্রথম দুটি হিজরতের উভয়টিই করেছি। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছি এবং তার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকারাবদ্ধও হয়েছি। সুতরাং আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, আমি কখনোই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করিনি এবং কখনো তার সাথে প্রতারণাও করিনি। রাসুলের মৃত্যু পর্যন্ত আমি এমনই ছিলাম। তারপর হজরত আবু বকর রা. খলিফা নিযুক্ত হলেন। আমি তার আদেশও কখনো অমান্য করিনি এবং কখনো তাকে ধোঁকা দিইনি। তারপর হজরত উমর রা. খলিফা হলেন। আমি কখনো তার আদেশও লঙ্ঘন করিনি এবং তাকে ধোঁকা দিইনি। তাহলে যখন আমাকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হলো, তখন আমার উপর তাদের যে হক ছিল, তোমাদের উপর কি আমার সেই হক নেই?
আমি বললাম, কেন নয়?
তিনি বললেন, 'তাহলে লোকদের পক্ষ থেকে তুমি আমাকে যেসব কথা শোনাচ্ছ, সেগুলোর কী বৈধতা থাকতে পারে? কিন্তু ওয়ালিদের অবস্থা সম্পর্কে তোমরা যা বলছ, ইনশাআল্লাহ সে ব্যাপারে আমি হকের উপরই থাকব।'
তারপর হজরত উসমান ওয়ালিদকে চল্লিশটি চাবুক মারলেন। হজরত আলি রা. কে আদেশ করলেন, চাবুক মারুন। হজরত আলিই তখন চাবুক লাগাতেন।
(-সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৮৭২, কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিল হাবশা)

সহিহ বুখারির এ বর্ণনা থেকে তৎকালীন সময়ের সৃষ্ট পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অর্থাৎ হজরত উসমান রা. খুব ভালোভাবেই অনুভব করছিলেন যে, তার একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকেরাও কিছু না কিছু প্রভাবিত হয়েছেন। তারা তাকে স্বজনপ্রীতির শিকার মনে করে সমালোচনা করতেও প্রস্তুত হয়ে গেছেন। একারণেই প্রথমবার তার কাছে ভাগিনার কথা শোনা অনর্থক মনে হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার সত্যের উপলব্ধি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, 'কল্যাণে'র শিরোনামে উপস্থাপিত যেকোনো কথা তার শোনা উচিত। তা ছাড়া তার উল্লিখিত বাণীসমূহের প্রতিটি শব্দ থেকে এ বিষয়টি জ্বলজ্বল করে ঠিকরে পড়ছে যে, নিজের সম্পর্কে মানুষের খারাপ ধারণাকে তিনি যথেষ্ট ঘৃণা করেন। তিনি চাইতেন, পূর্বের খলিফাদের যেভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, তাকেও যেন সেভাবে অনুসরণ করা হয়। আর নিঃসন্দেহে এ আশা করে তিনি সত্যের উপরই ছিলেন।
সহিহ মুসলিম শরিফে আছে, হুসাইন ইবনে মুসযির বলেন, ওয়ালিদ বিন উকবাকে যখন হজরত উসমানের দরবারে আনা হলো, তখন আমি তার কাছে উপস্থিত হলাম।

সে ফজরের নামাজ দু রাকাত পড়িয়ে বলেছিল, তোমাদেরকে কি আরো নামাজ পড়িয়ে দেব? একথা শুনে দুই ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল, যাদের একজনের নাম হিমরান। সে সাক্ষ্য দিল যে, ওয়ালিদ বিন উকবা মদ পান করেছে। অপরজন সাক্ষ্য দিল যে, আমি তাকে (মদ) বমন করতে দেখেছি।

হজরত উসমান তখন বলতে লাগলেন, যদি সে মদ পান না করত, তবে বমি করত না। তারপর বললেন, হে আলি, উঠুন, একে চাবুকাঘাত করুন।

হজরত আলি বললেন, হে হাসান, ওঠো, একে চাবুক মারো।

হাসান বলল, এ কাজের তাপ যেন সে-ই সহ্য করে, যে এর শীতলতা লাভ করেছে। অর্থাৎ তিনি এ কাজ করতে অসম্মত ছিলেন।

তখন হজরত আলি রা. বললেন, হে আবদুল্লাহ বিন জাফর, ওঠো, একে চাবুক লাগাও।

তখন তিনি চাবুক লাগালেন এবং হজরত আলি গুনতে লাগলেন। যখন চল্লিশ চাবুক পূর্ণ হলো, তখন বললেন, এবার থামো।

তারপর বললেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ চাবুক মেরেছেন। হজরত আবু বকরও চল্লিশ চাবুক মেরেছেন। হজরত উমর রা. মেরেছেন আশি চাবুক। সবকটিই সুন্নত। তবে আমার পছন্দ চল্লিশ।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৫৫৪, কিতাবুল হুদুদ, বাবু হদ্দিল খামার)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সহিহ মুসলিমের এই হাদিস অনুযায়ী হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. কে মদপানের দণ্ডস্বরূপ চল্লিশটি চাবুক লাগানো হয়েছিল। এটিই ইমাম শাফেয়ি রহ. এর অগ্রগণ্য মত। অবশ্য তার মতে যদি শাসক চায়, তবে এই শাস্তি বৃদ্ধি করে ৮০টিও করতে পারেন। হানাফি, মালেকি এবং হামবলি ফকিহদের মতেও ৮০টি লাগাতে হবে। এমনিভাবে হজরত উমর রা. এর যুগে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটাই ছিল। (ফাতহুল কাদির লিবনিল হুমাম : ৫/৩১০-৩১১) যেহেতু এটি একান্ত ফিকহি বিষয়, তাই বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহের কিতাবাদি দেখা যেতে পারে।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়ালিদ রা. এর উপর আরোপিত অপবাদের পর্যালোচনা

উল্লিখিত ঘটনাটি হাদিসের সর্বাধিক বিশুদ্ধ সংকলনে বিদ্যমান আছে। সুতরাং যদি এ ঘটনাকে কেবল একথা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, একজন সাহাবি থেকে এমন জঘন্য কাজ করা সম্ভব নয়, তাহলে এ যুক্তি অনুযায়ী শুধু বুখারি-মুসলিমই নয়, বরং হাদিসের কিতাবের এমন সমস্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যাতে আল্লাহর নবীর জীবদ্দশায় কয়েকজন সাহাবির উপর দণ্ড প্রয়োগের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা আমরা যদি পরবর্তী যুগেও এমন ভুল হওয়া অসম্ভব মনে করি, তাহলে রিসালাতের প্রদীপ বিদ্যমান থাকাকালে এর সম্ভাবনা বিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মত অনুসারে আমরা যদি মেনে নিই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেও দুয়েকবার কয়েকজন সাহাবি থেকে মানবীয় দুর্বলতার ফলে এমন পদস্খলন হয়েছিল, তাহলে একথা মেনে নিতেও কোনো আইনি বাধা থাকে না যে, পরবর্তীযুগেও এ ধরনের পদস্খলনের আশংকা আছে।

এমন চিন্তা করাও ভুল হবে যে, হজরত উসমান রা. হয়তো অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ছাড়াই ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর উপর দণ্ড প্রয়োগ করেছেন। কেননা এ চিন্তার মাধ্যমে ওয়ালিদ বিন উকবা রা. কে তো বাঁচানোর চেষ্টা করা হবে, তবে সাথে সাথে এ চিন্তার ফলে ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর চেয়েও বহুগুণ উচ্চ মর্যাদসম্পন্ন সাহাবি (হজরত উসমান রা.)-র উপর জুলুমের অপবাদ আরোপ করা হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম তাবারি রহ. এর উল্লেখকৃত কয়েকটি ঐতিহাসিক বর্ণনা আলোচ্য বিষয়টি ভিন্ন রঙে চিত্রায়ণ করে। তাতে বলা হয়েছে, আসলে এ ঘটনা ছিল তিন ব্যক্তির পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফল, যাদের নাম ছিল যথাক্রমে- আবু যাইনাব, মুওয়াররা এবং জুনদুব। আর যারা ওয়ালিদ বিন উকবা রা. র বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তারা মূলত শত্রুতাবশত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। তাকে পদচ্যুত করানোর জন্যই তারা এ খেলা খেলেছিল। কারণ, এ ঘটনার কিছুদিন পূর্বেই এদের অসভ্য ছেলেদেরকে কিসাসস্বরূপ হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. হত্যা করেছিলেন। কেননা তারা ইবনে হাইসুমান নামের এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত নির্মমভাবে জনসম্মুখে হত্যা করেছিল। অপরাধীদেরকে ঐ শাস্তি দেওয়ার কিছুদিনের মাথায় তাদের পরিবারের লোকেরা হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দাবি করে বসে যে, হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. মদ্যপায়ী। (আর ঐ দিনগুলোতেই ইবনে সাবার পক্ষ থেকে হজরত উসমান রা. এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সূচনা হয়েছিল। সুতরাং এটা মোটেই অবাক হওয়ার নয় যে, ইবনে সাবার ক্রীড়নকরা ঐ দাবি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে অংশ নিয়েছিল)।

হজরত উসমান রা. আত্মীয়দের দাবি শুনে হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. কে মদিনায় ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কুফার কয়েকজন অধিবাসী তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও প্রদান করে। হজরত ওয়ালিদ রা. তার নিরপরাধ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর কসম, এ সাক্ষীরা আমার শত্রু ও বিরোধী। দয়া করে এদের কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু হজরত উসমান রা. বলেন, এ শাস্তিতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আমাকে তো সে অনুযায়ী বিচার করতে হবে, যে রকম কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। তা ছাড়া আমাদের মধ্যে যে-ই বাড়াবাড়ির শিকার হচ্ছে, সে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আর আমাদের মধ্যে যে-ই জুলুমের শিকার হচ্ছে, তার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রতিদান রক্ষিত থাকবে। (তারিখে তাবারি, ৩/২৭৫) তারপর হজরত উসমান হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. কে চাবুকাঘাত করার আদেশ করেন, যেমনটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু এ ব্যাখ্যার উপর অবশ্যই আপত্তি ওঠে যে, তাবারির বর্ণনাগুলো সনদের বিচারে দুর্বল। সুতরাং এর দ্বারা বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানির অভিমত

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি তাবারির উপরোক্ত বর্ণনার বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন, যার সারসংক্ষেপ হলো, সহিহ বর্ণনাসমূহের আলোকে কেবল এতটুকু প্রমাণিত হয়

হজরত উসমান রা. শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য দেখে দেশের একজন বিশিষ্ট্য অফিসার এবং আপন বৈপিত্রেয় ভাইকে শাস্তি প্রদান করেন এবং সাথে সাথে তাকে বরখাস্ত করে হজরত সাঈদ ইবনুল আসকে কুফার গভর্নর বানিয়ে পাঠান। এ ঘটনা ২৯ বা ৩০ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।[১৩৩]

সরাসরি খলিফাতুল মুসলিমিনের কাজের সমালোচনা

হজরত উসমান রা. শরিয়তের বিধান সামনে রেখে নিকটাত্মীয়তাকে পেছনে ফেলে আপন চাচাতো ভাইকে শাস্তি প্রয়োগ করলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ইনসাফের বাণী সমুন্নত করলেন। আর এই দৃশ্য দেখে সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। যারা তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করেছিল, তারাও নিশ্চুপ হয়ে গেল। কেননা, স্বজনপ্রিয় শাসকরা এহেন পরিস্থিতিতে আইনের বাণী অগ্রাহ্য করে যেকোনো উপায়ে আপনজনকে বাঁচিয়ে নেয়।

কিন্তু এ ঘটনার পর হিংসুকরা দেশের অন্যান্য নেতাকে বাদ দিয়ে সরাসরি হজরত উসমান রা. এর কাজের সমালোচনার সুযোগ ও ছুতা তালাশ করতে লাগল। কিছুদিন পর, (৩০ হিজরিতে) হজরত হুযাইফা

যে, হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সম্পন্ন করে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, আসলেই তিনি মদ পান করেছিলেন কি না। আর শাসক তো বাহ্যিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই বিচার করেন। শাসকের পক্ষ থেকে কারো উপর দণ্ড প্রয়োগ করা একথা প্রমাণ করে না যে, সত্যিকারার্থেই সে লোকটি অপরাধী। যেমনটি প্রকাশ পায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী থেকে- 'হতে পারে তোমাদের থেকে কিছু লোক দলিল প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিক দ্রুতগামী হবে।' (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, কিতাবুল হুদুদ : ২/৪৯৮-৫০১)

[১৩৩] 'তারিখে খলিফা বিন খাইয়াতে' এ ঘটনাকে ২৯ হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম তাবারি এবং ইমাম ইবনে আসির রহ. একে ৩০ হিজরির ঘটনার তালিকায় উল্লেখ করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর উপর অপবাদ আরোপের ঘটনা ঘটেছিল ২৯ হিজরির শেষের দিকে। তারপর তার সম্পর্কে এ অভিযোগ মদিনায় পৌছা, তাকে মদিনায় ডেকে পাঠানো, সাক্ষ্যের উপর চিন্তাভাবনা, দণ্ড প্রয়োগ, নতুন গভর্নর নিযুক্তি, ইত্যাদি হতে হতে ৩০ হিজরি শুরু হয়ে গিয়েছিল। একারণেই হজরত ওয়ালিদের বরখাস্ত এবং হজরত সাঈদ ইবনুল আসের নিযুক্তির ঘটনাকে ৩০ হিজরির ঘটনাপ্রবাহের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনুল ইয়েমেন রা. তাবারিস্তান অঞ্চলে জিহাদের অভিযানে গেলেন। সে সফরে তিনি লক্ষ করলেন, লোকেরা কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কেরাত পাঠ করছে। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি কুফার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার জন্য আহ্বান জানালেন। তারপর মদিনায় এসে সরাসরি হজরত উসমান রা. কে ঘটনাটি জানিয়ে এর পরিণামের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। হজরত উসমান রা. সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শের পর গোটা মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র কুরআনের এক লিপিরীতে একতাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর যুগে কুরআনের যে কপিটি সংকলন করা হয়েছিল এবং যেটি হজরত উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রা. এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, সেটি চেয়ে আনা হলো। তারপর সেটির বহুসংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে গোটা মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতীকৃত ও সত্যায়িত কপি ছাড়া কুরআনের সকল সংকলন বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো।

চিন্তাশীল ও বিশেষজ্ঞ সাহাবিগণ এ উদ্যোগকে অত্যন্ত সাধুবাদ জানালেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী লোকগুলি একে কুরআন অবমাননার সমার্থক বলে দাবি করল। এক ধূর্ত চাপাবাজ বিষয়টিতে অপরাধের রঙ চড়িয়ে মনের ঝাল মিটিয়ে হজরত উসমান রা. কে সমালোচনার বানে জর্জরিত করে ফেলল। কিন্তুসাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে হজরত উসমান রা. কে সমর্থন দিয়েছিলেন। হজরত আলি নিজে বলেছিলেন, হজরত উসমান আমাদের সমর্থন নিয়েই এ কাজ করেছিলেন। যদি এ বিষয়টি আমার হাতে সোপর্দ করা হতো, তা হলে হজরত উসমান যা করেছেন, আমিও তা-ই করতাম।[১৩৪]

এভাবেই দুশমনদের এই অপপ্রচারও চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা শামে

এই সময় আবদুল্লাহ বিন সাবা তার ষড়যন্ত্রকে পত্রপল্লবে বিকশিত করার মানসে শামে চলে যায়। সেখানে পৌঁছে সে চেষ্টা করতে থাকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে যেন শোরগোল ওঠে। আর এ বিরোধিতার

১৩৪ 'আল কামিল ফিত তারিখ', ৩০ হিজরির আলোচনা।

সূচনা যেন খোদ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হয়, যাতে তার উপর কারো সন্দেহ না হয়। শামের বড় বড় সাহাবিকে সে সর্বাত্মকভাবে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে ফুঁসিয়ে তোলার চেষ্টা করল। বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু দারদা রা. তার এই দুরভিসন্ধি আঁচ করে ফেললেন। তখন তাকে লক্ষ করে তিনি বলে উঠলেন, 'আসলে তুমি কে? আল্লাহর কসম, আমার মনে হয় তুমি এখনো ইহুদি রয়ে গেছ।'

এরপর ইবনে সাবা হজরত উবাদা বিন সামেত রা. এর উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনিও জানতে পেরেছিলেন যে, এই বেটা এক কুচক্রী। তিনি তাকে বন্দি করে সোজা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দরবারে নিয়ে গেলেন। কিন্তু যেহেতু তার চক্রান্তের প্রকাশ্য কোনো প্রমাণ ছিল না, তাই হজরত মুয়াবিয়া তাকে সতর্ক করে ছেড়ে দিলেন।[১৩৫]

সাবায়ি ষড়যন্ত্রের মূল হোতা কারা?

সাবায়ি ষড়যন্ত্রের শিকার লোকদের অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ চক্রান্তের মূল হোতা ছিল এরা :

১. কিছু লোক ছিল চক্রান্তের মূল পরিকল্পনাকারী। এরা ছিল সেইসব ইহুদি, যারা শুরু থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এদের মধ্য থেকে কেবল আবদুল্লাহ বিন সাবার নাম পাওয়া যায়।[১৩৬]

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল ওইসমস্ত মানুষ, যাদের স্বভাব ছিল বিদ্রোহাত্মক। এদের অধিকাংশ ছিল ওইসব আরব গোত্রের সদস্য, যারা কুরাইশের নেতৃত্বের কারণে হিংসার আগুনে জ্বলছিল।[১৩৭]

---

[১৩৫] তারিখুত তাবারি : ৪/২৮৩-২৮৪; এ দুই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বাহ্যিকভাবে ইবনে সাবা শামের কোথাও সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীতে সে যেভাবে শামের মাটিতে তার আস্তানা ও ঘাঁটি বানিয়েছিল, তা থেকে ধারণা হয় যে, সেখানে সে শিয়া মতবাদের খণ্ডনে উসমানি মতাদর্শের চেতনা জাগিয়ে তোলার গোপন চক্রান্ত সম্পন্ন করে গিয়েছিল।

[১৩৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪১৪

[১৩৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩২৬-৩২৭

৩. তৃতীয় প্রকারে ছিল ওইসব মুসলমান, যারা দীনদারির গর্ব ও অহঙ্কারের শিকার ছিল, যাদের মধ্যে সমালোচনার স্বভাব খুব বেশি ছিল। একারণেই এই শ্রেণিটি পরবর্তীতে এ চক্রান্ত থেকে পৃথক হয়ে 'খাওয়ারিজ' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।[১৩৮]

৪. সাবায়ি-চক্রান্তের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ শ্রেণিটি ছিল ওইসব লোকের, যাদেরকে কোনো অপরাধের কারণে মুসলিম শাসক দণ্ড প্রদান করেছিল। তারা এখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এ চক্রান্তে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিয়েছিল।[১৩৯]

৫. পঞ্চম প্রকারে ছিল ওইসমস্ত মানুষ, যারা সম্পদের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল। সরকারি কোষাগারে সঞ্চিত বিভিন্ন প্রকার করের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তারা মুখিয়ে ছিল।[১৪০]

৬. এমন কিছু যুবকও এ চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়েছিল, যারা তাদের কাঙ্ক্ষিত পদ-পদবি না পেয়ে খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়েছিল।

৭. সর্বশেষ ওইসব সাধারণ মানুষও এর আওতায় এসেছিল, যারা কোনো স্লোগানের ডাকে সাড়া দিয়ে মাঠে নেমেছিল। এদের মধ্যে কৃষক, মজুর, গোলাম সবাই শামিল ছিল।

চক্রান্তের মূল হোতাদেরকে 'সাবায়ি' বা 'সাবাইয়্যাহ' বলা হয়। তৎকালীন সময়ের আলোচনায় তারিখে তাবারিসহ অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে 'সাবাইয়্যাহ' শব্দটি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।[১৪১]

---

[১৩৮] মুসান্নফে ইবনে আবি শাইবা, বাবু মা যুকিরা ফিল খাওয়ারিজ।

[১৩৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৩১৮

[১৪০] তারিখুত তাবারি : ৪/৩২৩

[১৪১] এ 'সাবাইয়্যা' শব্দটিই আসল। যদিও কোথাও কোথাও 'সাবায়ি' ব্যবহার করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য : মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩১২৩৬; উর্দুতেও 'সাবায়ি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। বিশ্বাসঘাতকামূলক এ চক্রান্ত সম্পর্কে আরো জানতে হলে ইতিহাসের নিম্ন বর্ণিত কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে :

১. আল ফিতনাতু ওয়া ওয়াকআতুল জামাল। সাইফ বিন উমর, পৃষ্ঠা : ৯৬, ৯৮, ১০৩, ১১৬, ১৫৮

২. আখবারুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যা, পৃষ্ঠা : ১০৫, আল মাআরিফ লিবনি কুতাইবাহ, দীনুরী, পৃষ্ঠা : ৬২২, ৬২৩

সাবায়ি ফেতনার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যেই বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলের লোকদেরকে সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন এবং অপর কতিপয় সাহাবির বিরুদ্ধে বিদ্বেষী করে তোলা হচ্ছিল। সাবায়ি চক্রান্তের ফল কেবল সাহাবা-বিদ্বেষের রূপেই প্রকাশিত হয়নি। বরং পরবর্তী যুগে শাম, ইরাক, বাহরাইনের কোনো কোনো শহরে বনু হাশেম এবং ও ক্ষমতাসীন নেতাদের বিরুদ্ধে যে পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল, (যা কোথাও নাসেবি ফেতনা, আবার কোথাও খারেজি ফেতনা রূপে প্রকাশিত হয়েছিল) তা-ও মূলত সাবায়ি চক্রান্তেরই পরোক্ষ ফল ছিল।

হজরত আবু জর গিফারি রা. এর সঙ্গে হজরত উসমান রা. এর ঘটনা :

এ বছরই (৩০ হিজরিতে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আংটি, যা আল্লাহর রাসুলের পর হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রা. এর হাতবদল হয়ে হজরত উসমান রা. এর হাতে এসেছিল, সেটি মদিনা থেকে দু মাইল দূরে (প্রায় সোয়া তিন কিলোমিটার) অবস্থিত মসজিদে কুবার কূপ 'বিরে আরিসে' পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। প্রভূত বরকতের উৎস এ আংটি হারিয়ে যাওয়ার কারণে হজরত উসমানসহ সমস্ত মুসলমান যারপরনাই চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সবাই মনে করছিলেন, হয়তো এটি বড় ধরনের কোনো ফেতনার পূর্ব ইঙ্গিত।[১৪২]

ইত্যবসরে শামে হজরত আবু জর গিফারি রা. তার দুনিয়াবিমুখ মানসিকতার কারণে লোকজনকে জোরালোভাবে আদেশ করেছিল, তারা যেন তাদের সব সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এর ফলে সমাজের মধ্যে একধরনের অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হলো। আশঙ্কা হচ্ছিল যে, পাছে এর দরুন ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্যগত টানাপোড়েন শুরু না হয়ে

---

৩. তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩৬, ৪৩৮, ৪৪৪, ৪৫৪, ৫১২, ৫৪১, ৫৪৩, ৫/১৯৩, ২৭২, ৬/২৫,৮৩, ৭/৪২৫

৪. আল মুনাতাযাম, ইবনুল জাওযি : ৫/৭৭,৮১, ৮৯, ৯৪, ৯৫, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪৭০, ১২/৩৮, ৪০, ১৩/২৫০

৫. তারিখে ইবনে খালদুন : ২/৬০৪, ২/৬০৫, ৬১৭, ৬১৮, ৬২১

[১৪২] আল কামিল ফিত তারিখ, ৩০ হিজরির আলোচনা।

যায়। শামের গভর্নর হজরত মুয়াবিয়া রা. এ অবস্থা সম্পর্কে খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উসমান রা. কে অবহিত করলেন।

খবর পেয়ে হজরত উসমান রা. একদিকে হজরত আবু জর গিফারি রা. কে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, তিনি যেন মদিনায় এসে উপস্থিত হন।[১৪৩] অন্যদিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে চিঠি লিখলেন, "চারদিকে ফেতনার বীজ অঙ্কুর গজাতে শুরু করেছে। অচিরেই তা ডাল-পালা ছড়াবে। সুতরাং উম্মাহর এ দুর্যোগকে খুঁচতে যেয়ো না। বরং যথাসম্ভব মানুষকে শামলে রাখ এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তবে হ্যাঁ, আবু জরকে সসম্মানে রাহবার ও পাথেয় দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

হজরত মুয়াবিয়া রা. আদেশ পালন করলেন। হজরত আবু জর রা. মদিনায় এসে পড়লেন। হজরত উসমান রা. চাচ্ছিলেন হজরত আবু জর রা. যেন মদিনাতেই তার পাশে থাকেন। কিন্তু হজরত আবু জর রা. শহর থেকে দূরে 'রাবযা' নামক স্থানের এক খেজুরবাগানে অবস্থান নিলেন। হজরত উসমান রা. তকে একপাল উট এবং দুজন

---

[১৪৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৪০৬, কিতাবুয যাকাত, বাবু মা উদ্দিয়া যাকাতুহু। মুসান্নফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩০৬১০

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

সাইফ বিন আমরের দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনায় একথাও আছে যে, 'হজরত আবু জর গিফারি রা. আবদুল্লাহ বিন সাবার প্ররোচনায় পড়ে মানুষকে দুনিয়াবিমুখতা এবং অল্পতুষ্টির পাঠ দান করতে শুরু করেছিলেন।' আর বর্ণনার ভিত্তিতে কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করেছে যে, হজরত আবু জর রা. এর ফতোয়া ও দর্শন মূলত ইবনে সাবা থেকে সংগৃহীত ছিল। কিন্তু একথা সঠিক নয়।

প্রকৃত সত্য এই যে, হজরত আবু জর রা. ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের একজন আলেম ও বিশেষজ্ঞ সাহাবি। সুতরাং একথা প্রচার করা মিথ্যা অপবাদ যে, তিনি কোনো পথভ্রষ্টের কথায় প্রতারিত হয়ে ভুল ফতোয়া দিতেন। সাইফ বিন আমরের দুর্বল বর্ণনার এতটা ওজন নেই যে, এর উপর ভিত্তি করে একজন সাহাবি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হবে। বস্তুত হজরত আবু জর রা. এর পক্ষ থেকে দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পতুষ্টির প্রতি অধিক তাগিদ আরোপ করা শরিয়তেরই বিভিন্ন দলিলকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ছিল। আর এ কারণেই তার কিছু কিছু মত ব্যতিক্রম ধরনের ছিল। তবে তিনি আপন ইজতিহাদ ও বিবেচনার ফলে এক্ষেত্রে অপারগ ছিলেন।

গোলাম দান করলেন, যেন তিনি সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারেন।[১৪৪]

এভাবেই হজরত উসমান রা. এক সময়োপযোগী এবং ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একদিকে শামের সমাজের স্তরগত বৈষম্যের ঝুঁকিকে প্রতিহত করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে এক উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবির সম্মান ও মর্যাদায়ও কোনো ঘাটতি আসতে দেননি।[১৪৫] কিন্তু চক্রান্তকারীরা এ বিষয়টিকেও ঘোলাটে করতে শুরু করল যে, হজরত উসমান রা. এক বিশিষ্ট সাহাবির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন এবং তাকে দেশান্তর করেছেন (এ অপবাদ আজও পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে)।

ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র মিসরে

৩১ হিজরিতে চক্রান্তকারীরা মিসরেও তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ রা. অযোগ্য। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আসল ব্যাপার না জানার কারণে এ অপপ্রচারে প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেননি। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আবি হুযাইফা এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকরের ন্যায় উচ্চবংশীয় ব্যক্তিও ছিলেন।

হিজরি ৩২ সনে পারস্য উপসাগরের তীরে 'যাতুস সাওয়ারি' নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুজাহিদবাহিনী মুহাম্মদ বিন আবি হুযাইফা এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে দেখলেন, মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে অবস্থান করছেন। কারণ জিজ্ঞেস করে জানা গেল, হজরত উসমান রা. এর প্রতি তারা এতটাই খারাপ ধারণার শিকার যে, তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমির আবদুল্লাহ বিন সা'দের অধীনে থেকে তারা লড়াই করা পছন্দ করেন না।[১৪৬]

৩৩ হিজরির সূচনা : নতুন নতুন ঘটনা

৩৩ হিজরিটি এমন সময় শুরু হয়েছিল, যখন চক্রান্তকারীরা সন্তর্পণে, নীরবে নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছিল। বিশেষত কুফা এবং বসরায় তাদের

---

[১৪৪] তারিখুত তাবারি : ৪/২৮৪, সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৪০৬, কিতাবুয যাকাত, বাবু মা উদ্দিয়া যাকাতুহু ফালাইসা বি কানযিন।

[১৪৫] তারিখুত তাবারি : ৪/২৮৫

[১৪৬] তারিখুত তাবারি : ৪/২৯২

অবস্থান ছিল বেশ সরগরম। কুফার গভর্নর ছিলেন হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. এবং বসরার গভর্নর ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা.। ৩৩ হিজরিতে কুফা ও বসরায় এমন দুটি ঘটনার অবতারণা হয়, শাসকদের পক্ষে সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে অপরাধীদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পদক্ষেপ নিতে হলো।

প্রথম ঘটনা

প্রথম ঘটনাটি ঘটল কুফায়। কুফার গভর্নর হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. এর দরবারে কতিপয় আরব নগরবাসী এক যুবককে শুধু এ অপরাধে প্রহার করল যে, সে শাসকদের প্রশংসা করে কিছু বলেছিল। এই আগুন-জ্বালানো ঘটনা এমনভাবে ঘটেছিল যে, এটিকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না। তাই হজরত উসমান রা. এর আদেশে ওই যুবকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শামে হজরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান রা. এর দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

আমাদের মহান নেতা হজরত মুয়াবিয়া রা. অপরাধীদের সামাজিক অবস্থানের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের সঙ্গে অতিথিসুলভ আচরণ করলেন। তিনি তার স্বভাবজাত বিচক্ষণতার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন আসলে এরা নীচতা ও হিংসার রোগে আক্রান্ত। কুরাইশের নেতৃত্বের কারণে এরা বিদ্বেষ পোষণ করছে। তিনি তাদেরকে নম্র ভাষায় বুঝানোর পর শেষমেশ বলে দিলেন, ঠিক আছে যাও, যা মন চায় করো। কিন্তু কখনো আল্লাহর শরিয়ত বর্জন করো না। আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া তোমাদের যেকোনো আচরণ সহ্য করা হবে।'

তারপর তাদের সম্পর্কে হজরত উসমান রা. কে লিখে পাঠালেন যে, 'এরা নির্বোধপ্রকৃতির লোক। ন্যায়-ইনসাফ দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।'[১৪৭]

ঐ সময় হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. এর পুত্র হজরত আবদুর রহমান, যিনি হিমসের শাসক ছিলেন, এইসব অপরাধীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং কিছুটা কড়া ভাষায় সতর্ক করে দিলেন। তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইল।

---

[১৪৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩১৮-৩২১, ৩২৮

ফলে হজরত আবদুর রহমান বিন খালেদ রা. তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন।[১৪৮]

ইবনে সাবা ইরাকে

কুফার ওই যুবদলটি তাদের দুর্ব্যবহারের দরুন অনুশোচিত হলো। ফলে ইনসাফপ্রিয় শাসকদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপপ্রচার ব্যর্থ হয়ে গেল। একারণে আবদুল্লাহ বিন সাবা গাত্রদাহে ভুগতে লাগল। সেখান থেকে সে চলে গেল বসরায়। সেখানে গিয়ে অতি সংগোপনে মানুষকে তার দলে ভেড়াতে শুরু করল। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. এ সংবাদ জানতে পেরে আবদুল্লাহ বিন সাবাকে নজরবন্দি করে রাখলেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। সে বিভিন্ন রকম বাহানা দিয়ে নিজের সাফাই পেশ করল। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. তাকে এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

ইবনে সাবা তখন কুফায় গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে সে নতুন সদস্য সংগ্রহ করছিল। শহরের গভর্নর হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. তার খবর পেয়ে গেলেন। তিনিও তাকে শহর থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

কেউ তাকে কঠিন শাস্তি দেননি। কারণ, তখন ছিল ইনসাফের যুগ। আদালতে প্রমাণ উপস্থিত করা ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া হতো না।

ইবনে সাবা তারপর মিশরে ফিরে আসে। সেখান থেকে কুফা ও বসরায় তার সহযোগীদের সাথে পত্র-মারফত যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। তার টার্গেট ছিল হজরত উসমান রা. এর কর্মকর্তাদেরকে বদনাম করে বরখাস্ত করা এবং ইসলামি খেলাফতকে বিতর্কিত করে তোলা।[১৪৯]

---

[১৪৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৩২১,৩২২

[১৪৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৩২৬,৩২৭

৩৪ হিজরি

ষড়যন্ত্রের শাখা-প্রশাখা যখন জনসম্মুখে প্রকাশ পেল

৩৪ হিজরি যখন শুরু হলো, তখন কুফার চক্রান্তকারীরা তাদের শাসক হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. এর বিরুদ্ধে আদালতে প্রমাণ পেশ করার জন্য সর্বোতভাবে প্রস্তুত ছিল। শহরের গভর্নর সাঈদ ইবনুল আস রা. তখন গিয়েছিলেন মদিনায় হজরত উসমান রা. এর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য। এই সুযোগে শহরের দুষ্ট লোকেরা হজরত উসমান রা. এর নিযুক্ত কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার জন্য দাবি তুলে আন্দোলন শুরু করল। তাদের এক প্রতিনিধিদল সেই দাবিদাওয়া নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথিমধ্যে হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. ফেরার পথে তাদের সাথে মিলিত হলেন। কুফার দলটি বলল, আল্লাহর কসম, আমাদের হাতের এই তলোয়ারগুলো থাকতে সাঈদ কুফায় প্রবেশ করতে পারবে না। হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. যখন দেখলেন, কুফাবাসীরা তার পথ আগলে রেখেছে, তখন তিনি বললেন, "তোমাদের এই দাবি পূরণের জন্য একজন প্রতিনিধি আমিরুল মুমিনিনের কাছে এবং একজন আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল।"

একথা বলে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন এবং আমিরুল মুমিনিনকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন।

ঘটনা শুনে হজরত উসমান রা. ধীর-শান্তভাবে বিরোধীপক্ষকে বুঝানোর পন্থা অবলম্বন করলেন। তারপর তাদের দাবি মোতাবেক হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. এর স্থলে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করে দিলেন।[১৫০]

---

[১৫০] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৩৫-৩৩৬।

প্রাণনাশী আক্রমণের ব্যর্থ চেষ্টা

এই সময়েই একদিন কুফার এক অধিবাসী মদিনায় এসে উপস্থিত হলো। তার নাম ছিল কামিল বিন জিয়াদ।[১৫১] এই কুলাঙ্গার গায়ের পোশাকের ভেতর খঞ্জর লুকিয়ে হজরত উসমান রা. এর উপর আক্রমণের মানসে একদিন এক নির্জন পরিবেশে হজরত উসমানের দিকে অগ্রসর হলেন। হজরত উসমান চেহারা দেখেই তার দুরভিসন্ধির কথা বুঝে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিয়ে আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে লোকজন জড়ো হলো। কামিল কসম করে বলল, 'আমার মনে খারাপ কোনো উদ্দেশ্য ছিল না'।

লোকেরা বলল, 'আমরা এর ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখব'।

কিন্তু শালীনতা ও ভদ্রতার মূর্তপ্রতীক হজরত উসমান রা. বললেন, 'না, আমি চাই না সে মিথ্যুক প্রমাণিত হোক।'

তারপর একথা বলে তিনি হতভাগাকে ছেড়ে দিলেন- 'যাও, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, হিজরি ৩৪ সনের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত আছে, এ বছর সাহাবায়ে কেরাম পত্র-মারফত একে অপরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, 'যদি জিহাদের আগ্রহ থাকে, তবে আমাদের এখানে এসে করতে পার' (অর্থাৎ উম্মতকে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য একে অপরকে দাওয়াত দিতেন)। এ বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সামনে সেই চিঠিপত্র সম্পর্কে আলোচনা আসবে। সুতরাং বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে যে, ওয়াকিদির মতো দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনা আল্লাহর রাসুলের সাহাবির সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার জন্য কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

[১৫১] ইমাম বুখারি রহ. কামিল বিন যিয়াদকে হজরত আলি রা. থেকে হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। (আত তারিখুল কাবির: ৭/২৪৩)

মুসনাদে আহমাদ ও মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে কামিলের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, যা হজরত আলি ও হজরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। এর দ্বারা জানা যায়, কামিল পরে তাওবা করেছিল এবং হজরত আলির সাহচর্য তাকে নেককার বানিয়ে দিয়েছিল। আর হয়তো এ কারণেই মাদায়েনি কামিলকে কুফার আবেদগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। এ ছাড়া ইবনে সা'দ, ইবনে হিব্বান, আজলি এবং ইয়াহয়া ইবনে মাইন কামিলকে 'সিকাহ' তথা নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন। তবে তার সম্পর্কে তীব্র সমালোচনাও হয়েছে। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আম্মার তাকে 'রাফেজি' মতাদর্শী আখ্যায়িত করেছে এবং বলেছে بلاء من البلاء অর্থাৎ সে এক সাক্ষাৎ-আপদ। (তাহযিবুল কামাল : ২৪/২১৯)

করুন। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, আল্লাহ যেন তোমাকে লাঞ্ছিত করেন'।[১৫২]

বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে হজরত উসমান রা. এর পরামর্শ

এই যখন ছিল মুসলিমবিশ্বের চিত্র, তখন একদিন হজরত উসমান রা. তার সকল প্রাদেশিক গভর্নর ও কর্মকর্তাকে মদিনায় ডাকলেন। তারপর তাদের সম্মুখে চলমান সঙ্কট তুলে ধরে পরামর্শ চাইলেন। সকলেই একমত হলেন যে, একটি চক্রান্তকারী দল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আমাদের পিছে লেগেছে। তারাই সাধারণ মানুষকে নানাভাবে উসকে দিচ্ছে। পরামর্শসভায় কোনো গভর্নরই হজরত উসমানের সিদ্ধান্ত, উদ্যোগ ও কর্মপন্থার কোনো সমালোচনা করল না।

শুধু হজরত আমর ইবনুল আস রা. সামান্য সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনিও নির্জনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তার উদ্দেশ্য কেবল এই ছিল যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা কাজ করে, তারা যেন আমার সম্মুখে তাদের মনের কথাগুলো খুলে বলে, যাতে তাদের সংশোধন করা যায়।

বসরার গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. বললেন, মানুষকে জিহাদে ব্যস্ত করে দিন। তা হলে অন দিকে চিন্তা করার সুযোগই থাকবে না।

শামের শাসনকর্তা হজরত মুয়াবিয়া রা. অভিমত ব্যক্ত করে বললেন, আপনি সেনাপতিদের সহযোগিতা নিন। প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ অঞ্চলের জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। শামের মানুষের দায়িত্ব আমার। মিসরের গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ রা. পরামর্শ দিলেন, মানুষের উপর অঢেল সম্পদ ব্যয় করে তাদের মন জয় করে নিন।

হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. পরামর্শ দিলেন, রোগের শেকড় কেটে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে যারা অনর্থক উসকানি দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে তাদেরকে একটি শাস্তির

---

[১৫২] তারিখুত তাবারি : ৪/৪০৩ সাইফের বর্ণনা মোতাবেক।

দৃষ্টান্ত বানিয়ে ফেলতে হবে। তা হলে অন্যরা আপনা-আপনিই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

এই মতটি শুনে হজরত উসমান রা. বললেন, যদি ভিন্ন কোনো আশঙ্কা না থাকত, তবে এটাই করা উচিত ছিল।

আসল ব্যাপার এই যে, হজত উসমান রা. জানতেন যে, ইসলামি শাসনের বিরুদ্ধে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে চক্রান্ত চলছে, সেগুলো বন্ধ করার জন্য যদি শক্ত হাত ব্যবহার করা হয়, তা হলে আদালত ও আইনের মাপকাঠি অনুযায়ী নিশ্চিত সাক্ষ্য বজায় রাখা যাবে না।

বরং এ ধরনের ক্ষেত্রে গোপন সংবাদ ও শোনা কথার ভিত্তিতেই যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। আর তার ফল এই হয় যে, অপরাধীদের সাথে বহু নিরপরাধ মানুষও জড়িয়ে পড়ে। এভাবে একদিকে প্রশাসনকে হতে হয় কঠোর দমন-পীড়নকারী, অন্যদিকে এসব আইনবহির্ভূত পদক্ষেপ জন্ম দেয় স্বেচ্ছাচারিতাকে। এসব দিক বিবেচনা করে আমিরুল মুমিনিন কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দিলেন না। মতবিনিময় শেষে গভর্নরদের একথা বলে বিদায় দিলেন যে, মানুষকে জিহাদে প্রেরণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হোক।

এই কৌশল হিসেবে সে বছর কুফা থেকে আমিরগণ নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়লেন। খুবই অল্পসংখ্যক সাহাবি কুফায় অবস্থান করছিলেন। তাই কুফা বিশিষ্ট সাহাবিদের থেকে শূন্য হয়ে পড়েছিল।[১৫৩]

অপপ্রচার ও তিন মিথ্যা অপবাদ

মুনাফিকরা মুসলিম জনপদগুলোতে হজরত উসমানের বিরুদ্ধে পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তিনটি অপবাদ সবখানে ছড়িয়ে দিয়েছিল। যথা :

১. তিনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

২. উহুদযুদ্ধ থেকে তিনি পলায়ন করেছিলেন।

৩. এবং বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেননি।

---

[১৫৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪১

এসব আপত্তির খণ্ডনে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবির প্রামাণিক উত্তর সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আছে। জনৈক ব্যক্তি হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে এই আপত্তিগুলো করলে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, হজরত উসমান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশেই বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। আল্লাহর নবীর কন্যা (এবং হজরত উসমান রা. এর স্ত্রী) হজরত রুকাইয়া রা. এর শুশ্রূষার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদরযুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহর নবীর এই আদেশের কারণে হজরত উসমানের জন্য মদিনায় অবস্থান করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। একারণেই আল্লাহর নবী তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সমপরিমাণ গনিমতের সম্পদ দান করেছিলেন।

উহুদযুদ্ধ থেকে পলায়ন সংক্রান্ত অপবাদের উত্তর দিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, এই ভুলের ক্ষমার ঘোষণা সরাসরি কুরআনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এরপর আর কারো জন্য আপত্তি করার কোনো অধিকার থাকে না।[১৫৪]

বাকি রইল বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ না করার কথা। সেটা তো আসলে মূর্খতার সর্বনিকৃষ্ট উদাহরণ। কেননা বাইয়াতে রিদওয়ান তো সংঘটিতই হয়েছিল হজরত উসমানের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য। কেননা মক্কার কুরাইশরা তাকে নজরবন্দি করে রেখেছিল এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি শহিদ হয়ে গেছেন। এমন সময় আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরাম থেকে বাইয়াত বা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা উসমানের রক্তের বদলা নেবই নেব। আর তখন হজরত উসমানের হাতের বদলায় স্বয়ং আল্লাহর নবী স্বীয় পবিত্র হাত রেখেছিলেন।

ইবনে সাবার নতুন খেলা

এরপর আবদুল্লাহ বিন সাবার অনুসারীরা 'মিডিয়া সন্ত্রাসী' চালায়। প্রত্যেক শহরের ষড়যন্ত্রকারীরা অপর শহরের লোকদেরকে চিঠির মাধ্যমে

---

[১৫৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৬৯৮, ফাজাইলুস সাহাবা, বাবু মানাকিবি উসমান রা.। সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ৩৭০৬... এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে মহান আল্লাহর এ বাণীর প্রতি- ولقد عفا عنكم (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫২)।

মিথ্যা সংবাদ দিত, যাতে ইসলামি শাসনের বিরুদ্ধে কঠোর দমন-পীড়ন ও জনগণের নির্যাতনের বানোয়াট কাহিনি লেখা হতো।

খলিফাতুর মুসলিমিনের বিরুদ্ধে এসব বানায়োট কাহিনি এত দ্রুত ও সুকৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক শহরের মানুষ মনে করত, আমাদের এলাকা ব্যতীত অন্যসব এলাকা জুলুম-নির্যাতনে ছেয়ে গেছে। কিন্তু এটা যেহেতু কেবল একটা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছিল, একারণে কোনো শহর বা এলাকার লোকের কাছে সরাসরি খলিফার বিরুদ্ধে কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়নি। কিন্তু প্রত্যেকেই মনে করত, অন্যসব এলাকায় আইনকানুন সব তছনছ হয়ে গেছে এবং মানুষ বড় কষ্টে দিনাতিপাত করছে।[১৫৫]

হজরত উসমান রা. এর তদন্ত কার্যক্রম

এসব গুজব শুনে মদিনার অধিবাসীরা হজরত উসমান রা. এর কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন। তিনি সব খণ্ডন করলেন এবং বললেন, সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য তিনি কয়েকজন সাহাবির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে প্রত্যেক এলাকার অবস্থা যাচাই করলেন। এ দলটি প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে বিশিষ্ট ও সাধারণ সব ধরনের মানুষের কাছ থেকে স্থানীয় শাসকদের কার্যক্রম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে মদিনায় ফিরে আসে এবং বলে, আমরা কোথাও কোনো গড়মিল দেখতে পাইনি। কারো কোনো অভিযোগ নেই।[১৫৬]

এ সময় বিভিন্ন এলাকার গভর্নরগণ যাচাই করে হজরত উসমান রা. কে জানিয়ে দিয়েছিল কোন শহরে কে কে বিশৃঙ্খলা ছাড়ানোর কাজে যুক্ত রয়েছে। মিসর থেকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ রা. লিখে পাঠালেন যে, এখানে চার ব্যক্তি বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে। আবদুল্লাহ বিন সাবা, খালেদ বিন মুলজিম, সুদান বিন হুমরান এবং কেনানা বিন বিশর।[১৫৭]

---

[১৫৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪১

[১৫৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪১

[১৫৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪১; এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, হজরত উসমান রা. র শাসনামলের শেষবছরগুলোতে আবদুল্লাহ বিন সাবা মিসরে বসবাস করত।

হজরত উসমান রা. তদন্তকারী দলের প্রতিবেদনের উপর ক্ষান্ত থাকলেন না। বরং পুরো মুসলিমবিশ্বে ঘোষণা করে দিলেন, এ বছর (৩৪ হিজরি) হজের সময় ওইসব লোক যেন সরাসরি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, যাদের কাছে আমার অথবা আমার কোনো প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে। তারপর তারা চাইলে প্রতিশোধ নিবেন, অথবা ক্ষমা করে দেবেন।

এই ঘোষণা যখন পুরো মুসলিমবিশ্বের অলিগলিতে প্রচার করে দেওয়া হলো, তখন যারা আগে থেকেই হজরত উসমান রা. এবং তার গভর্নরদের ন্যায় ও ইনসাফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হজরত উসমানের জন্য তারা আরো বেশি দোয়া করতে লাগলেন।

এ সময় হজরত উসমান রা. তার শাসকদের আরো তাগিদ করতে থাকেন যে, তোমরা জনসাধারণের প্রতি আরো বেশি যত্নবান হও। তাদের অধিকার পূরণ করতে থাকো। তবে হ্যাঁ, যদি কোথাও আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘিত হয়, সেখানে চুপ থাকবে না।[১৫৮]

মুয়াবিয়া রা. এর শঙ্কা এবং মদিনাবাসীর জন্য উসমান রা. এর কল্যাণকামিতা

ভবিষ্যতের শঙ্কা অনুভব করে হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত উসমান রা. এর কাছে আবেদন করলেন, তিনি যেন শামে চলে আসেন। হজরত উসমান রা. বললেন, আমি কিছুতেই আল্লাহর নবীর প্রতিবেশিত্ব হাতছাড়া করতে প্রস্তুত নই, যদিও এতে আমার গলা কাটা যায়।

হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, তা হলে এখানে আপনার সুরক্ষার জন্য আমি শাম থেকে বাহিনী পাঠিয়ে দিই, যারা মদিনায় থেকে আপনাকে পাহারা দেবে?

হজরত উসমান রা. বললেন, যে মদিনাবাসী একদিন মুহাজির সাহাবিদের আশ্রয় দিয়েছিল, সাহায্য করেছিল, তাদের উপর আমি আমার রক্ষীবাহিনীর ভরণ-পোষণ ও ব্যয়নির্বাহের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না।

---

[১৫৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৩

হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, আমি আপনার উপর অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা করছি।

হজরত উসমানের নির্বিকার উত্তর- حسبنا الله ونعم الوكيل[১৫৯]

মূলত এটা ছিল হজরত উসমান রা. এর সুদূরপ্রসারী চিন্তা। শুরু থেকেই তিনি মদিনাবাসী মুসলমানদের হক ও অধিকার সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন ছিলেন। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, সৈন্যবাহিনী রাখার অর্থই হলো একটি পৃথক সেনাছাউনি স্থাপন করা। আর কোনো শহরে সেনাছাউনি থাকলে সেখানে সৈনিকদের অধিকার থাকে প্রথম পর্যায়ে, শহরের অধিবাসীদের অধিকার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে। হজরত উসমান রা. মদিনাবাসীকে এ কষ্ট থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। তাই হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সৈন্যপ্রেরণের প্রস্তাব তিনি নাকচ করে দেন।

---

[১৫৯] তারিখুত তাবারি, ৩৫ হিজরির আলোচনা অধ্যায় : আলোচ্য হাদিস থেকে সাইফ কর্তৃক তার শায়েখদের থেকে বর্ণিত হাদিস পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

বিশিষ্ট সাহাবিদের ন্যায়ানুগ কমপন্থা

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সাবায়িরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে হজরত উসমান রা. এবং তার গভর্নরদের বদনাম করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, সাধারণ মুসলিম সমাজ যা চরমভাবে বিভ্রান্তিকর মনে করেছিল। এরই সাথে শামের লোকজনকে বনু হাশেম এবং নেতাদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষে লাগিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রও চলছিল।[১৬০]

---

[১৬০] এজাতীয় কঠোর মেজাজের লোকেরাই পরবর্তীতে শুধু হজরত উসমান রা.-ই নয়, বরং বনু উমাইয়ার প্রত্যেক সদস্যের প্রতিরক্ষা ও সহযোগিতার জন্য সীমাহীন অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের এ অতি আবেগ ও উৎসাহ এমন সাম্প্রদায়িক বর্ণ ধারণ করেছিল, ইয়াজিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিতর্কও দীন ও ঈমানের অংশে পরিণত হয়েছিল। পক্ষান্তরে হজরত আলি, হজরত হাসান এবং হজরত হুসাইন রা. কে প্রকাশ্যে জাতির গাদ্দার, অথবা কমপক্ষে অযোগ্য ও মূর্খ বলা শুরু হয়েছিল।

যেহেতু এ চিন্তার সূচনা হয়েছিল হজরত উসমান রা. এর প্রতিরক্ষা ও সহযোগিতার শিরোনামে, তাই এ দলটিকে 'উসমানি' নামে আখ্যায়িত করা হতো। উসমানি দলের মধ্যেও আবার দুটি ভাগ ছিল। একদল হজরত আলি রা. র দোষচর্চা থেকে বিরত থাকত। অবশ্য তারা তাকে 'মুজতাহিদে মুখতি' তথা 'গবেষণায় বিচ্যুতির শিকার' বলত। এদের মধ্যে কয়েকজন হাদিস বর্ণনাকারীও ছিলেন। 'আসমাউর রিজালে'র কিতাবাদিতে এমন কতিপয় ব্যক্তিকে 'উসমানি' বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে এটি হালকা ধরনের 'জারহ' বা মন্তব্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

বনু উমাইয়ার পক্ষে কঠোর মেজাজের অপর দলটি হজরত আলি রা. কে গালমন্দ করত এবং অভিশাপ দিত। এদেরকে 'নাসেবি বা মারওয়ানি' বলা হয়। এ দলের অধিকাংশ লোক ছিল শামের অধিবাসী।

একইভাবে হজরত আলি রা. র প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে যারা সত্যের উপর অবিচল ছিলেন, তাদেরকে 'শিয়ানে আলি' বলা হতো। এদের মধ্যে কুফার প্রখ্যাত হাদিস বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণও ছিলেন। উম্মাহর আলেমগণ এদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু এদের থেকে যারা সাবায়ি ফেতনার শিকার হয়েছিল, তারা প্রথম তিন খলিফাকে গালমন্দ করত। এদেরকে বলা 'রাফেজি'। উম্মাহর আলেমগণ এদেরকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন।

একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শামে উমাইয়া বংশের আমিরদের শাসন চলেছিল। এই সুবাদে বনু ইমাইয়ার হাজার হাজার পরিবার তাদের গোলাম ও খাদেমসহ এখানে এসে বিভিন্ন শহর-নগরে বসবাস শুরু করেছিল। এই আরব পরিবারগুলো অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ও রাজনীতিঘনিষ্ঠ ছিল। সাধারণ মানুষ তাদের ভক্ত-অনুগত ছিল। এই অবস্থাকে সামনে রেখে সাবায়ি ষড়যন্ত্র শামে ভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করেছিল। মনে হয়, অনিষ্টের বীজ ঠিক তখনই বোনা হয়েছিল, যখন আবদুল্লাহ বিন সাবা শামে অবস্থান করেছিল। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এ চক্রান্তের অধীনে বনু হাশেমের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা হয়। হজরত উসমান রা. ও তার কর্মকর্তা এবং বনু উমাইয়ার আমিরদের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার সবক পড়ানো হয়। পাশাপাশি কোনো কোনো শহরে হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর রা. কে খলিফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে দলমত গঠন করা হয়।[১৬১]

এই ছিল সাবায়ি ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক কর্মকাণ্ড, যা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। যেমনিভাবে রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তেমনি মানুষের মনমানসিকতায় নেতিবাচক চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটালেও তার দ্বারা অনৈতিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

তখনকার পরিবেশে সকল অশুভ শক্তির লক্ষ্য একটাই ছিল। অর্থাৎ ইসলামি প্রেরণার স্থলে গোত্রীয় পক্ষপাত ও কট্টরপন্থা জাগিয়ে তোলা। আর এরই ফল প্রকাশ পেয়েছিল পৃথক পৃথক উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিবর্গের ভক্তি ও ভালোবাসারূপে। শুধু তা-ই নয়, বরং সাধারণ মানুষের মাঝে গর্ব ও অহঙ্কারের আগের সেই মানসিকতা আবার ব্যাপক হয়ে পড়েছিল, যাকে ইসলাম কখনোই পছন্দ করে না।[১৬২]

বহু সরলমনা, আবেগপ্রবণ এবং উদ্দীপ্ত যুবক নিজ নিজ এলাকাকে তাদের তরবারির অর্জন এবং বংশীয় জমিদারি মনে করতে লাগল।[১৬৩]

---

[১৬১] বসরার লোকেরা হজরত তালহা রা. কে এবং কুফার লোকেরা হজরত যুবাইর রা. কে শাসক হিসেবে চাইত। (তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৯)।

[১৬২] গোত্রীয় বড়াই ও অহঙ্কারের সেই সময়কার চিত্র দেখতে চাইলে 'মুফাজ্জল বিন মুহাম্মদ আয যাব্বি' (মৃত্যু : ১৬৮ হিজরি) কৃত 'আল মুফাজ্জালিয়াত' কিতাবটি দেখা যেতে পারে। এটি ইসলামের ইতিহাসের প্রাচীন কাব্যসংকলন রূপে বিবেচিত।

[১৬৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৩২৩

পাশাপাশি নিজ গোত্রকে আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্র মনে করে মুহাজির ও আনসারদের শাসনকে ঘৃণা করতে লাগল।[১৬৪] একথা বলা ভুল হবে না যে, ইসলামের আলো যে গোত্রীয় বড়াই ও কট্টরতাকে দমন করেছিল, সাবায়ি ফেতনা সবার অলক্ষে আবার তাকে জাগিয়ে তুলেছিল। কোনো

---

[১৬৪] আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. আলোচ্য ফেতনার সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে 'বাবু বাদইল আফজাজ আলা উসমান রা.' এ শিরোনামের অধীনে লিখেছেন,

لما استكمل الفتح واستكمل للملة الملك ونزل العرب بالامصار فى حدود ما بينهم وبين الامم من البصرة والكوفة والشام ومصر، وكانت المختصون بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهداه وآدابه المهاجرون والانصار من قريش واهل الحجاز ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم , واما سائر العرب من بنى بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والازد وكنده وتميم وقضاعة وغيرهم فلم يكونوا من تلك الصحبة بمكان الا قليلا منهم وكان لهم فى الفتوحات قدم ، فكانوايرون ذلك لانفسهم مع ما يدين به فضلاؤهم من تفضيل اهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم وماكانوا فيه من الذهول والدهش لامور النبوة وتردد الوحى وتنزل الملائكة فلما انحسر ذلك العباب وتنوسى الحال بعض الشيء وذل العدو واستفحل الملك كانت عروق الجاهلية تنفض ووجدوا الرياسة عليهم للمهاجرين والانصار من قريش وسواهم فانفت نفوسهم منهم

অনুবাদ : চারদিকে যখন বিজয় পূর্ণতা লাভ করল এবং উম্মাহ নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলো, আরবজাতি অন্যান্য জাতির সাথে বসরা ও কুফা থেকে শাম ও মিসর পর্যন্ত আবাদ হয়ে গেল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য এবং তার জীবন ও আদর্শের পূর্ণ অনুসারী মুহাজির ও আনসারগণই ছিলেন শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, যারা ছিলেন কুরাইশের বা হিজাজের সদস্য। অথবা এরা ব্যতীত অন্যান্য যারা সাহাবি হওয়ার এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তারাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

এ ছাড়া আরবের অন্যান্য গোত্র, যেমন : বনি বকর বিন ওয়ায়েল, আবদুল কায়েস, রবিয়া, আযদ, কিন্দা, তামিম, কুজাআ ইত্যাদি, এরা রাসুলের সান্নিধ্য অর্জনের এ মর্যাদার ক্ষেত্রে উপরোক্ত স্তরে ছিল না। অবশ্য এদের থেকেও অল্প সংখ্যক মানুষ রাসুলের সান্নিধ্য লাভ করেছিল। তবে এসব গোত্র ইসলামি বিজয়যাত্রায় বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। ফলে তারা মনে মনে নিজেদেরকে এসব বিজয়ের অধিনায়ক ভাবতে লাগল। অথচ এদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল, তারাও রাসুলের প্রথম সারির সাহাবিদের মর্যাদা স্বীকার করতেন। কেননা তারা নবুওয়াতের ঘটনাবলি, অহি অবতীর্ণ হওয়ার দৃশ্য এবং আসমান থেকে সরাসরি ফেরেশতা নেমে আসার কথা ভুলে যাননি। কিন্তু যখন এরাও মেঘের মতো সরে গেলেন আর নবুওয়াতের সেই স্মৃতিও হারিয়ে গেল, অন্যদিকে শত্রুরাষ্ট্র সব পদানত হওয়ার ফলে মুসলিমবিশ্ব সুসংহত হলো, তখন জাহিলিয়াতের শিরাগুলো আবার ফুলে উঠল। যার ফলে আরব গোত্রগুলো মুহাজির ও আনসার এবং কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের শাসনক্ষমতাকে ঘৃণা করতে লাগল এবং এদের প্রতি তাদের মন বিষিয়ে উঠল। (তারিখে ইবনে খলদুন : ২/৫৮৬)

কোনো এলাকার মানুষ মনে করত, খেলাফত বনু হাশেমের অধিকারে আসা উচিত। আবার কোনো এলাকার লোকেরা হজরত উসমানের খেলাফতকে বনু উমাইয়া বংশের ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে খুশি হতো। তাদের চিন্তায় একথা বড় কষ্টকর মনে হতো যে, খেলাফত বনু উমাইয়ার হাত থেকে ছুটে অন্য কোনো গোত্রের হাতে যাবে। এটা ছিল সমাজের মানুষের উপর সাবায়ি ফেতনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পরবর্তীতে এরা আরো যেসব অনিষ্ট সাধন করেছিল, তা এর চেয়ে বহুগুণ ভয়ানক ছিল।

হজরত উসমান রা. এর খেলাফতের শেষের বছরগুলোতে একদিকে সাবায়ি ফেতনা হজরত উসমান এবং তার প্রশাসকবর্গকে অযোগ্য বলে প্রচার করছিল। এমনকি তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেও তারা কারো কোনো পরোয়া করত না। অন্যদিকে এদেরকে প্রতিহত করার জন্য কিছু মানুষ এ পন্থা অবলম্বন করল যে, শাসন-নীতিতে কোনো সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেওয়াও যেন গাদ্দারিতুল্য। আর যারা হজরত উসমান রা. এর উপর আপত্তি তোলে, তারা হত্যাযোগ্য অপরাধী।[১৬৫]

---

[১৬৫] এ পরিস্থিতি কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও জড়িয়ে ফেলেছিল। যার উদাহরণ কেবল ইতিহাস নয়, হাদিসেরও পাতায়ও দেখা যায়। যেমন-

- আবুল গাদিয়াহ জুহানি (যিনি একজন নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী এবং প্রসিদ্ধ উক্তি মতে সাহাবিও) একদিন মসজিদে কুবাতে হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে হজরত উসমানের বিরুদ্ধে কিছু বলতে শুনলেন। তখন বললেন, আমি যদি সাহায্যকারী পেতাম, তাহলে একে (হজরত আম্মার রা. কে) হত্যা করে ফেলতাম। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/২৬০); এ বর্ণনার সকল রাবি নির্ভরযোগ্য। তদুপরি এর সমর্থনে আরো অনেক বর্ণনাও আছে। (দ্রষ্টব্য : তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/২৬০; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, হাদিস : ৫৬৫৮, সনদ সহিহ, আল মু'জামুল আওসাত, হাদিস : ৯২৫২)
- এমনিভাবে আশতার নাখায়িও হজরত উসমান রা. এর বিরোধিতায় খুব সরব ছিলেন (বিস্তারিত সামনে আসবে)। এ ব্যক্তি সম্পর্কে জারহ ও তাদিলের ইমামগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। 'মালিক ইবনে আশতার আন নাখায়ি ছিলেন কুফি, তাবেয়ি এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি'- (আস সিকাত লিল আজলি : ১/৪১৭) ইবনে হিব্বানও তাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। (আস সিকাত, হাদিস : ৫৩৩৮) হাফেজ ইবনে হাজার বর্ণনা করেন, 'তিনি দ্বিতীয় স্তরের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি'। (তাজিলুল মানফাআ : ৬৪২৯)

এহেন পরিস্থিতিতে মদিনার সাহাবিগণ একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। তারা হজরত উসমান রা. এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বও শিকার করলেন, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অপবাদগুলোও খণ্ডন করলেন, আবার সাথে সাথে শাসনব্যবস্থার সংশোধনের সুযোগও স্বীকার করলেন। পাশাপাশি তারা চেষ্টা করলেন, তারা যেন বিবদমান উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসাকারী তৃতীয়পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারেন। তারা চাচ্ছিলেন, উভয়ের মধ্যে সমঝোতার একটি উত্তম পন্থা বেরিয়ে আসুক।

ইতিহাসের যেসব বর্ণনায় মদিনার বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আলি, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর রা. প্রমুখকে হজরত উসমান রা. এর প্রতি অসন্তুষ্ট; বরং তার দুশমন দেখানো হয়েছে, সেসব বর্ণনায় আসলে অতিমাত্রিক অতিরঞ্জন করা হয়েছে। সত্য ও প্রমাণিত কথা কেবল এতটুকুই যে, এসব বিশিষ্ট ব্যক্তি শঙ্কিত ছিলেন, শাসন-ক্ষমতার সর্বোচ্চ পদে একটি বংশের প্রাধান্য বিস্তারের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু যখন সত্যিই সে ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, তখন তারা আমিরুল মুমিনিনকে সুপরামর্শ প্রদান করলেন। ইত্যবসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে তর্কবিতর্কও হলো। মতবিরোধের পর্যায়ও এলো। সর্বোপরি মানুষ হওয়ার কারণে পরস্পরে কিছুটা তিক্ত কথাও হয়ে গেল। তবে এ সবকিছুই হয়েছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে। তাই অল্পক্ষণ পরেই তারা চিনি ও দুধের ন্যায় একে অপরের সাথে মিলে যেতেন।[১৬৬]

এ ধরনের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কথায় পূর্ণ সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও ভুল বোঝা, আবেগপ্রবণতা, বদমেজাজ বা একরকম যশের মোহে পড়ে ভুল পথে পরিচালিত হয়ে পড়েছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মারওয়ান বিন হাকাম এমনই এক দৃষ্টান্ত, যিনি একদিকে একজন নির্ভরযোগ্য রাবি, অন্যদিকে দেখা যায় তিনি আশতার নাখায়ির ন্যায় কিছু মারাত্মক ধরনের ভুলের শিকার।

[১৬৬] ইমাম আবু বকর খাল্লাল রহ. ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. থেকে এ সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি বর্ণনায় হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. বলেন, আমি হজরত আলি এবং হজরত উসমান রা. কে দেখেছি, তারা একে অন্যকে অনেক কিছু বলে ফেললেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একজন অপরজনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং একজন অপরজনের জন্য ইসতেগফার

সাবায়িদের ষড়যন্ত্রের নীল নকশা

বিভিন্ন উপসর্গ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ৩৫ হিজরিতে চক্রান্তকারী দল মুসলিম উম্মাহর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বাধানো এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থা টুকরো টুকরো করে ফেলার যাবতীয় ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। ষড়যন্ত্রের মৌলিক কথা ছিল চারটি। যথা:

১. ইরাক ও মিসরবাসী, যারা বনু হাশেমের প্রতি অধিক আগ্রহী, তাদেরকে ব্যবহার করে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এমন আন্দোলন সৃষ্টি করা হবে, যার মধ্যে মদিনার বড় বড় তিন সাহাবি, হজরত আলি, হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইরও জড়িত থাকবেন। এদের প্রত্যেককে খেলাফতের দাবিদার বানিয়ে উম্মাহকে বিবাদে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

২. যদি এ লক্ষ্য সফল না হয়, তা হলে হজরত উসমান রা. থেকে জোরপূর্বক ইস্তফা নেওয়া হবে। তারপর খেলাফতের মসনদ শূন্য হওয়ামাত্র মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিগণ তা পূর্ণ করার চেষ্টা করবেন। আর তখনই জনগণের ঐক্য ভেঙ্গে দিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করতে হবে।

৩. হজরত উসমান রা. যদি ইস্তফা না দেন, তা হলে গোপনে তাকে হত্যা করে তার দায় চাপাতে হবে হজরত আলি, হজরত যুবাইর,

---

করতে লাগলেন। ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. এরকমই একটি ঘটনা ভিন্ন সনদে হজরত আবু সাঈদ খুদরি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তার শেষে আছে, (বিতর্কের পর) একজন অপরজনের হাত ধরলেন, যেন উভয়ে একই মায়ের দুই সন্তান।

عن سعيد بن المسيب قال شهدت عليا وعثمان ...... فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئا الا قاله .... ثم لم يبرحا حتى اصطلحا واستغفر كل واحد منهما لصاحبه.

(আস সুন্নাহ লি আবি বাকর আল খাল্লাল, হাদিস : ৭১৫)

عن ابى سعيد الخدرى ..... فما صليت الظهر حتى دخل احدهما أخذا بيد صاحبه كانهما أخوان لاب وام، يعنى عثمان وعليا رحمهما الله

(আস সুন্নাহ লি আবি বাকর আল খাল্লাল, হাদিস : ৭১৬)

হজরত আমর ইবনুল আস, উম্মাহাতুল মুমিনিনসহ বিশিষ্ট সাহাবিদের কাঁধে। আর এর মাধ্যমে এমনই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, যেন উম্মাহর দৃষ্টিতে এরা অনির্ভরযোগ্য হয়ে যায়। যাতে মুহাজির ও আনসারগণ কাউকে খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারে একমত না হতে পারে এবং এভাবে যেন মুসলমানদের একতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

৪. এসব সত্ত্বেও যদি মুহাজির ও আনসারগণ কাউকে খলিফা বানানোর ব্যাপারে একমত হয়ে যায়, তা হলে এই অপপ্রচার চালাতে হবে যে, এ লোকই ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী খলিফাকে হত্যা করেছে। এ বিষয়টি এতদূর পর্যন্ত ফলাও করতে হবে যে, পূর্ববর্তী খলিফার ভক্তরা যেন কোনোক্রমেই নতুন খলিফার উপর আস্থাশীল না হতে পারে। অবশেষে যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আর এভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিতে হবে।

সাবায়ি কাফেলা অপবাদের তালিকা নিয়ে মদিনায় উপস্থিত

বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অঙ্গার জ্বালিয়ে দিতে এবং বিরোধপূর্ণ পরিবেশকে বাতাস দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, যেসব অভিযোগ ও আপত্তি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার তালিকা দিয়ে একটি প্রতিনিধি দলকে হজরত উসমান রা. এর দরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে। এ দল ফিরে এসে প্রচার করবে যে, হজরত উসমান তার ভুল স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু তিনি তার কর্মপন্থা থেকে সরে আসতে প্রস্তুত নন। এভাবে জনসাধারণকে খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে।

সেমতে ৩৫ হিজরির রজব মাসে সাবায়ি প্রতিনিধিদল মিসর থেকে রওনা করল। মিসরের শাসক হজরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ রা. তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি হজরত উসমান রা. এর কাছে লিখে পাঠালেন যে, এই লোকগুলো আপনাকে খলিফার পদ থেকে অপসারণ করতে চায়।[১৬৭]

---

[১৬৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৫৭

হজরত উসমান রা. সেই দলটিকে মসজিদে নববিতে উন্মুক্ত মজলিসে কথা বলার সুযোগ দিলেন। সকল সাহাবি একমত হয়ে হজরত উসমান রা. কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, প্রতিনিধিদলের সকলকে বিদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। কিন্তু হজরত উসমান রা. অভিযোগকারীদেরকে 'সন্দেহভাজন' আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দিলেন না। বরং নিজে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে পছন্দ করলেন।[১৬৮]

আদালতের কাঠগড়ায় হজরত উসমান রা.

হজরত উসমান রা. একখানা কুরআন চেয়ে এনে সম্মুখে রাখলেন। তারপর প্রতিনিধি দলের আপত্তি শুনলেন আর এক এক করে প্রতিটি কথার স্পষ্ট উত্তর দিলেন। দুষ্কৃতিকারীরা প্রতিটি আপত্তির সাথে বিদ্রুপের সুরে বলত 'আল্লাহ আপনাকে অনুমতি দিয়েছিলেন নাকি আপনি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছেন?'

কিন্তু হজরত উসমান রা. অত্যন্ত ধৈর্যে ও সহনশীলতার সাথে সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন। একটি উত্তর শেষ হলে বলতেন, 'আর কোনো কথা থাকলে বলতে পার'।[১৬৯]

উক্ত কথোপকথনের বিভিন্ন বর্ণনা একত্র করলে জানা যায় যে, বৈঠকটি হয়েছিল কোনো উন্মুক্ত কাচারিতে। সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে সেখানে বিভিন্ন শহরের লোকদের সমবেত করা হয়েছিল। যার যা মন চেয়েছে, প্রশ্ন করেছে। পরিশেষে হজরত উসমান রা. এর বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট উত্তরের সম্মুখে সাবায়িরা নির্বাক হয়ে গেছে। আর সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে হজরত উসমানের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতা স্বীকার করেছে। উক্ত বৈঠকের প্রশ্নোত্তরগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. আপত্তিকারীরা বলল, আপনি 'বাকি'র চারণভূমিকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে তাকে 'হিমা' (নিষিদ্ধ এলাকা) ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে সাধারণ মানুষকে সেখান থেকে উপকৃত হতে নিষেধ করে

---

[১৬৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৫

[১৬৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১০৮-১০৯

দিয়েছেন; অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ ও তার রাসুল ব্যতীত কারো জন্য নিষিদ্ধ এলাকা নির্ধারণ করার অধিকার নেই।

হজরত উসমান রা. এই অভিযোগের উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম, এ নিয়ম আমি চালু করিনি। বরং আমার পূর্বের খলিফাদের থেকে চলে এসেছে। আমার পূর্বে হজরত উমর রা. সদকার উটের জন্য চারণভূমি নির্ধারণ করেছিলেন। আমি যখন শাসনক্ষমতা লাভ করলাম, তখন সদকার উট অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। উটের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই আমি সেই চারণভূমির আয়তন প্রসারিত করে দিয়েছি।[১৭০]

হজরত উসমানের কথার অর্থ ছিল, উল্লিখিত لاحمى الا لله ولرسوله শীর্ষক হাদিসে যে নিষেধের কথা বলা হয়েছে তা ওইসময়ের, যখন গোত্রপতিরা তাদের গবাদিপশু চড়ানোর জন্য বনাঞ্চল দখল করে নেবে। কেননা এ হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, মুসলমানদের শাসক যদি সরকারি সম্পদ এবং গবাদিপশুর সংরক্ষণের জন্য বনাঞ্চলে বা খোলা জমি নির্ধারণ করে দেয়, তবে এতে দোষের কিছু নেই। একারণেই স্বয়ং আল্লাহর নবী চারণভূমি নির্ধারণ করেছিলেন। তারপর হজরত উমর রা. তার সীমানা আরো প্রসারিত করেন। কেননা বাইতুল-মাল এবং সরকারি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত গবাদিপশুর উন্নত পালনের জন্য এ উদ্যোগ আবশ্যক ছিল।

হজরত উসমান রা. এ ধারাবাহিকতায় আরো উন্নয়ন এনেছিলেন। কেননা বাইতুল-মালে সদকা ইত্যাদির উটের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ছাড়া মুজাহিদদের জন্য ঘোড়ারও প্রয়োজন ছিল।[১৭১] সুতরাং সরকারি চারণভূমিতে উন্নয়ন করাটা ছিল একটি প্রশংসনীয় কাজ, অপরাধ নয়। আর এ উন্নয়ন হজরত উসমান রা. এর ব্যক্তিগত গবাদিপশুর জন্য ছিল না; ছিল সরকারি সম্পদের জন্য। হজরত উসমানের ব্যক্তিগত গবাদিপশুর হিসাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'খেলাফত লাভের পূর্বে গোটা আরব জাহানে আমার চেয়ে অধিক

---

[১৭০] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১০৯, তারিখে তাবারি : ৪/৩৪৭

[১৭১] ইমাম আহমাদ রাহ. সহিহ সনদে 'ফাজাইলুস সাহাবা'তে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিস : ৭৬৫

গবাদিপশু কারো ছিল না। আর আজ আমার কাছে কেবল একটি বকরি এবং হজের জন্য দুটি উট ছাড়া কিছুই নেই।' অর্থাৎ বাকি সব দান, সদকা ও হাদিয়া হিসেবে ব্যয় করা হয়েছে।[১৭২]

২. দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, পবিত্র কুরআনের একাধিক নুসখা চালু ছিল। আপনি সেগুলো নষ্ট করে একটিমাত্র নুসখা চালু করেছেন।

   হজরত উসমান রা. জবাবে বললেন, পবিত্র কুরআন একটিই, একই সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। তদুপরি আমি যা করেছি, সবার ঐকমত্যেই করেছি।[১৭৩]

   সাথে একথাও বললেন যে, আমি হজরত হুযাইফা রা. এর পরামর্শে এমনটি করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, যাতে কুরআনের তেলাওয়াতে আহলে কিতাবদের মতো মতবিরোধ দেখা না দেয়।[১৭৪]

৩. তৃতীয় আপত্তি ছিল, আপনি হজের সময় মিনাতে জোহর, আসর এবং এশা চার চার রাকাত পড়ানো শুরু করেছেন; অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হজরত আবু বকর ও উমর মুসাফিরদের ন্যায় দুই দুই রাকাত (কসর) পড়াতেন।[১৭৫]

---

[১৭২] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৭

[১৭৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৬

[১৭৪] তারিখুল মদিনা, উমার বিন শাবাহ : ৩/১১১৪, হজরত উসমানের উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে হজরত আলি রা. বললেন, এটি সকল সাহাবির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল। আরো বললেন, আমি খলিফা হলে আমিও এমনটিই করতাম। (তারিখুল মদিনা, উমার বিন শাবাহ : ৩/৯৯৫, তারিখুত তাবারি : ৫/১১৪, ফাতহুল বারি : ৯/১৮)

[১৭৫] বাকি রইল একথা যে পবিত্র কুরআনের নুসখা কেন জ্বালানো হলো। এ সম্পর্কে সকল আলেম ও ফকিহর ঐকমত্য চলে আসছে যে, যদি কুরআনকে অবমাননা থেকে রক্ষা করা এবং কোনো বিকৃতি সাধন থেকে মুক্ত রাখার জন্য জ্বালানো হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা সঠিক। কিন্তু যদি কুরআনের তাচ্ছিল্য করার জন্য ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পোড়ানো হয়, তাহলে তা হবে কুফুরি। হজরত উসমান রা. সরকারিভাবে অসত্যায়িত সকল নুসখা নষ্ট করার আদেশ দিয়েছিলেন কুরআনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে হজরত আলি, হজরত আব্বাস, হজরত মুয়াবিয়া, হজরত হাসান, হজরত হুসাইন, হজরত আবু মুসা আশআরি প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবিগণ হজরত উসমানের সমর্থন কেন করলেন? মোটকথা, এ উদ্যোগটিও হজরত উসমানের বিরাট এক অবদান ছিল। তিনি সকল সাহাবির ঐকমত্যে একাজ করেছিলেন, যাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

হজরত উসমান রা. এর উত্তরে বললেন, মক্কায় আমার বাড়ি আছে, পরিবার-পরিজন আছে। তাই আমি সেখানে (মুকিম হিসেবে) পূর্ণ নামাজ পড়াই।[১৭৬]

৪. পরবর্তী আপত্তি এই ছিল যে, হাকাম ইবনুল আসকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহর থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তারপর আল্লাহর নবীর যুগে, হজরত আবু বকর ও হজরত উমর-এর যুগে সে শহরে ফিরে আসার অনুমতি পায়নি। কিন্তু আপনি তাকে মদিনায় কেন ডেকে আনলেন?

হজরত উসমান রা. উত্তরে বললেন, হাকাম ইবনুল আস তো মক্কার অধিবাসী। আল্লাহর নবী তাকে তায়েফে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনিই আবার তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন (ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন)। তা হলে কি আমি ঠিক করিনি?

সকলে বলল, হ্যাঁ, আপনি সম্পূর্ণ সঠিক করেছেন।[১৭৭]

ওয়াসাল্লামের উম্মত ইহুদি ও নাসারাদের মতো আসমানি কিতাবের শব্দভিন্নতার বাহানায় বিভক্ত না হয়ে যায়। (ফাতহুল বারি : ৯/১১)

[১৭৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৬,৩৪৭; আসল ব্যাপার এই যে, হজের সময় মিনাতে জোহর, আসর এবং এশার ফরজ নামাজ কসর হিসেবে দুই রাকাত পড়ানোর কারণে, হজ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী গ্রামবাসী এবং নতুন মুসলমানদের মধ্যে এ ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, জোহর, আসর এবং এশার ফরজ নামাজ সর্বাবস্থায় দুই রাকাতই পড়তে হয়। এমনকি এক গ্রাম্য ব্যক্তি সরাসরি হজরত উসমান রা.কে মুখের উপর বলে ফেলেছিল, আমি যেদিন থেকে আপনাকে মিনায় দুই রাকাত পড়াতে দেখেছি, সেদিন থেকে আমি সর্বদা দুই রাকাতই পড়ি। (ফাতহুল বারি : ২/৫৭১) এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য হজরত উসমান রা. মিনাতে চার রাকাত পূর্ণ পড়াতে শুরু করেন। আর এর জন্য তিনি মক্কায় বিবাহ করেন এবং ঘরও আবাদ করেন। যার ফলে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি সেখানে মুকিম হয়ে যান।

[১৭৭] ঘটনা হলো, হজরত উসমান রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে থাকতে হজরত উসমান রা. সুপারিশ করে হাকাম ইবনুল আস রা. এর দেশান্তরিত হওয়ার শাস্তি একটা সময় পার হওয়ার পর ক্ষমা করার অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানত না। হজরত আবু বকর ও উমর রা. এর যুগে যেকোনো কারণে তাকে মদিনায় ডেকে আনা যায়নি। কিন্তু হজরত উসমান রা. ক্ষমতা লাভ করার পর তিনি নিজের দায়িত্ব মনে করলেন যে, হাকামকে আর শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না।

৫. আরেকটি আপত্তি ছিল, আপনি অল্পবয়সি যুবকদেরকে বড় বড় পদ দিয়েছেন এবং প্রবীণদের অপসারণ করেছেন।[১৭৮]

ইবনে শাইবার বর্ণনা অনুযায়ী অভিযোগকারীরা বলেছিল, আপনি আপনার মূর্খ কুরাইশি আত্মীয়দের শাসক নিযুক্ত করেছেন।[১৭৯]

এ অভিযোগের জবাবে হজরত উসমান রা. সাফাই-বক্তব্য পেশ করে বলেন, আমি কেবল যোগ্য, বুদ্ধিমান এবং বাছাইকৃত যুবকদেরকে দায়িত্ব দিয়েছি, যাদের চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে তাদের শহরবাসীকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তা ছাড়া যুবকদেরকে আমির নিযুক্ত করার বিষয়টি পূর্ব থেকেই চলে আসছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. কে আমির নিযুক্ত করেননি?

উপস্থিত জনতা বললেন, অবশ্যই করেছিলেন। আসলে এরা এমন এমন অভিযোগ করছে, যাকে এরা প্রমাণ করতে পারছে না।[১৮০]

তা ছাড়া হাকামকে দেশান্তর করা হয়েছিল মক্কা থেকে, মদিনা থেকে নয়। তো মক্কা থেকে যাকে দেশান্তর করা হয়েছে, তাকে মদিনায় বসবাসের অনুমতি দেওয়ার ফলে কী গুনাহটা হয়েছিল? যদি ধরেও নিই যে, হাকামকে মদিনা থেকেই দেশান্তর করা হয়েছিল, তবু এ শাস্তির তো একটা মেয়াদ থাকবে। তা দুই বছর বা পাঁচ বছর যাই হোক। অথচ হজরত উসমান রা. এর শাসনামল পর্যন্ত ১৫ বছর কেটে গিয়েছিল। সুতরাং তখন শাস্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়াই ছিল ইনসাফের দাবি।

[১৭৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৭

[১৭৯] তারিখুল মাদিনা, উমার বিন শাবা : ৩/১১১৪,

[১৮০] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৭, এতদ্ভিন্ন হজরত উসমান রা. যদি বড় কোনো সাহাবিকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে তার যৌক্তিক কারণও ছিল। যেমন : হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. কে এজন্য বরখাস্ত করেছিলেন যে, হজরত উমর রা. এর অসিয়ত এটাই ছিল যে, তাকে সরিয়ে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করবে। (আল কামিল ফিত তারিখ : ২/৪৫৩)
একইভাবে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.কে বরখাস্ত করেছিলেন ঋণ সংক্রান্ত একটি কারণে। হজরত সা'দ রা. বাইতুল মাল থেকে সম্পদ ঋণ নিয়ে তা আর ফেরত দিতে পারেননি। তাই হজরত উসমান রা. সাধারণ মানুষকে ভুল ধারণা থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাকে বরখাস্ত করেছিলেন। তারিখুত তাবারি : ৩৫ হিজরি।)
হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে শুধু এজন্য বরখাস্ত করেছিলেন যে, মিসরের মতো একটি সম্পদশালী রাষ্ট্র থেকে আশানুরূপ কর উসুল হচ্ছিল না। হজরত উসমান রা.

তবু হজরত উসমান রা. বললেন, তোমাদের থেকে প্রত্যেক শহরের লোকেরা বলুক যে, তারা কাকে গভর্নর বানাতে চায়। আমি তাকেই গভর্নর বানিয়ে দেব। তারা যাকে অপছন্দ করবে, আমি তাকে বরখাস্ত করব।

একথা শুনে বসরার লোকেরা বলল, আমরা আবদুল্লাহ বিন আমের রা. এর প্রতিই সন্তুষ্ট।

শামের লোকেরা বলল, আমরা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতিই সন্তুষ্ট।

কিন্তু মিসরের লোকেরা বলল, আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা. কে বরখাস্ত করে আমর ইবনুল আস রা. কে নিযুক্ত করুন।[১৮১]

৬. হজরত উসমানের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও করা হয়েছিল যে, আপনি মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহকে আফ্রিকার গনিমতের সম্পদ থেকে পুরস্কার হিসেবে এক-পঞ্চমাংশ কেন দান করলেন?

যখন হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রা.কে গভর্নর নিযুক্ত করলেন, তখন করের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেল। (তারিখে ইয়াকুবি : পৃষ্ঠা : ১৭২)

বাকি রইল যুবকদেরকে পদ দান করার ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মান বজায় রাখা। হজরত উসমান রা. তা যথাযথভাবেই রক্ষা করেছিলেন।

এ ছাড়া বয়সও একটি পর্যায়ে গেলে, সরকারি চাকুরিজীবীদের চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। যেমন: বর্তমান যুগে ষাট বছর বয়সে সরকারি কর্মকর্তাদের অবসর দেওয়া হয়। হজরত উসমান রা. যাদেরকে বরখাস্ত করেছিলেন, তাদের অধিকাংশের বয়সই ছিল এর চেয়ে বেশি। হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কুফার রাষ্ট্রীয় কোষাগারের পরিচালক ছিলেন। ৩২ হিজরিতে তিনি যখন বরখাস্ত হন, তখন শারীরিকভাবেও তিনি অসুস্থ ছিলেন। সে বছরই তার ইনতেকাল হয়ে যায়। তার বয়স ষাটের কিছু বেশি হয়েছিল। (উসদুল গাবাহ, ইবনে আসির জাযারী : ৩/৩১৮)

এমনিভাবে হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর বয়স ৭০ হয়েছিল। (আল ইসাবাহ : ৪/৫৪০ এ উদ্ধৃতি অনুযায়ী তিনি হজরত উমর রা. এর চেয়ে সাত বছরের বড় ছিলেন। হজরত উমর রা. ২৪ হিজরিতে ৫৮ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। এ হিসেবে তখন হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর বয়স হয় ৬৫ বছর। সুতরাং ২৭ হিজরিতে তিনি যখন বরখাস্ত হন, তখন তার বয়স হয় ৬৮ বছর।)

কেবল হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর বয়স ষাটের কম ছিল। তিনি ৫৬ হিজরিতে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/১২৪) এ হিসেবে ৬৫ হিজরিতে বরখাস্ত হওয়ার সময় তার বয়স হয় ৫১ বছর।

[১৮১] তারিখুল মদিনা, উমার বিন শাবাহ : ৩/১১১৪ এ বর্ণনার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, জুহাইম ব্যতীত। তবে ইবনে হিব্বান তাকেও নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

হজরত উসমান উত্তরে বললেন, আসলে আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহকে আফ্রিকার গনিমতের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ দান করা হয়েছিল (কেননা আফ্রিকা অভিযানের পূর্বে তার মনোবল বৃদ্ধির জন্য তার সাথে এ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল)। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ভুল ছিল না। এ ধরনের পুরস্কার হজরত আবু বকর ও হজরত উমরও দিতেন। যাই হোক, সাধারণ সৈনিকগণ অসন্তুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আমি সেটুকুও ফেরত নিয়ে তাদের মধ্যেই আবার বণ্টন করে দিয়েছিলাম, যাতে সৈনিকরা খুশি থাকে। অথচ এটা তাদের কোনো অনিবার্য পাওনা ছিল না।[১৮২]

৭. সেই বৈঠকে এ হাস্যকর অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল যে, আপনি আপনার বংশের লোকদেরকে বেশি খাতির করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করেন।

হজরত উসমান রা. উত্তরে বললেন, আমি আমার বংশের লোকদের অধিক ভালোবাসি, কথা সত্য। তবে এর কারণে কারো উপর জুলুম তো করি না। আর তাদেরকে যে পুরস্কার প্রদান করি, তা তো আমার নিজের পকেট থেকে। বাইতুল-মালে সঞ্চিত সাধারণ মুসলমানদের গচ্ছিত সম্পদকে আমি নিজের জন্য কিংবা অন্যকারো জন্যই হালাল মনে করি না। আর নিজের পকেট থেকে তো স্বয়ং আল্লাহর নবী এবং হজরত আবু বকর ও হজরত উমরের যুগ থেকেই দানের ধারা চলে আসছে। যুবাবয়সেই যখন আমার এ অভ্যাস ছিল, তা হলে আজ জীবনের সন্ধ্যায় এসে কি কৃপণতা শুরু করব?[১৮৩]

৮. অভিযোগের তালিকায় এটাও ছিল যে, আপনি শহরের নাগরিকদের উপর আর্থিক চাপ ও করের হার বাড়িয়ে দিয়েছেন।

উত্তরে হজরত উসমান রা. বললেন, এ অভিযোগ যারা করছে, তাদের শহরের কর উসুলের দায়িত্ব আমি তাদেরকেই অর্পণ করছি। তারা গিয়ে উসুল করুক। আমার কাছে তো উৎপাদিত ফসলের এক-

---

[১৮২] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৭

[১৮৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৭, ৩৪৮

পঞ্চমাংশ ছাড়া কিছুই আসে না। সেখান থেকেও আমি নিজের জন্য একটি পয়সাও হালাল মনে করি না। সে সম্পদ বণ্টনেরও যাবতীয় দায়িত্ব অন্য মুসলমানদের হাতে। তারাই সাধারণ মানুষের মধ্যে তা ব্যয় করে থাকে। নিজের খরচের জন্য আমি কিছুই গ্রহণ করি না। ব্যক্তিগত উপার্জনের উপরই আমি সীমাবদ্ধ থাকি।[১৮৪]

৯. এ অভিযোগও করা হয়েছিল যে, আপনি (বনু উমাইয়া ছাড়াও) কিছু মানুষকে অন্যায়ভাবে জমি দান করেছেন।

হজরত উসমান রা. উত্তরে বললেন, এটি আসলে মুহাজির ও আনসারদের ওইসব জমির কথা, যেগুলো বিজয় হওয়ার পর তারা সেখানে অংশ পেয়েছেন। পাওয়ার পর কিছু মানুষ তো সেখানেই বসবাস করতে শুরু করেছেন। আর কিছু নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। যারা ফিরে এসেছেন, তাদের মালিকানায় যে জমিগুলো ছিল, তা সেখানকার আরব জমিদারদের কাছে বিক্রি করে তার মূল্য আমি তাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছি। আর এটা তাদের পরামর্শের ভিত্তিতেই করেছি। এখন যা কিছু আছে, তাদের হাতেই আছে। আমার জন্য আমি কিছুই রাখিনি।[১৮৫]

১০. আরেকটি আপত্তি করা হয়েছিল এই যে, আপনি সরকারি সম্পদ থেকে মারওয়ান ইবনুল হাকামকে ১৫ হাজার এবং আবদুল্লাহ বিন খালেদকে পঞ্চাশ হাজার দান করেছেন (এরা উভয়ই ছিল উমাইয়া বংশের। যার ফলে এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল)।

---

[১৮৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৮

[১৮৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইমাম তাবারি রহ. এখানে উল্লেখ করেছেন যে, একটি অভিযোগ ছিল বনু উমাইয়াকে জমি ও অর্থ দান করা সম্পর্কে। সাথে সাথে একথাও স্পষ্ট করেছেন যে, শেষবয়সে হজরত উসমান রা. আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষার চূড়ান্ত স্তরও শেষ করেছিলেন। তার ব্যক্তিগত অর্থ সম্পদ ও ধনদৌলত ছিল অঢেল। তিনি বনু উমাইয়ার মধ্যে তা এত পরিমাণে দান করেছিলেন যে, নিজের সন্তানদেরকেও গোত্রের সাধারণ মানুষের সমান অংশ দিয়েছিলেন। কোনো পার্থক্য রাখেননি। সুতরাং এটি তো অভিযোগের কোনো বিষয় নয়। বরং আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণের একটি উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

> হজরত উসমান রা. উত্তরে বললেন, এটা আমি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে দিয়েছি। আর তা-ও এজন্য যে, এরা বড় অভাবী। হজরত উসমান বললেন, আমার মনে হয়, এতটুকু অধিকার আমার আছে (যে, ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কাউকে কিছু দান করব)। তবু আপনারা যদি একে ভুল মনে করেন, তা হলে আমাকে ধরিয়ে দেবেন। আমার সিদ্ধান্ত আপনাদের মতের অনুকূলেই থাকবে।
>
> হজরত উসমানের উত্তর শুনে উপস্থিত জনতা বলে উঠলেন, আপনি ঠিকই করেছেন, ভালোই করেছেন।[১৮৬]

এভাবে প্রতিটি অভিযোগ থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার পর হজরত উসমান রা. সেই অভিযোগকারী দলটিকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অথচ জনসাধারণ খুব অনুরোধ করেছিল, বিদ্রোহের অপরাধে এদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।[১৮৭]

---

[১৮৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৫

[১৮৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৮

সাবায়িদের মূল আক্রমণ

হজরত উসমান রা. ষড়যন্ত্রকারীদেরকে কথোপকথনের সুযোগ দিয়ে, সন্ধি ও সাফাই সম্পন্ন করে নিরাপদে ফিরে যেতে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে এদের মধ্যে মোটেই অনুশোচনা দেখা গেল না। বরং ফিরে গিয়ে তারা তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নে আরো বেশি তৎপর হয়ে উঠল। তারা রটিয়ে দিল যে, হজরত উসমান রা. সকলের উপস্থিতিতে তার উপর আরোপিত সকল অভিযোগ মেনে নিয়েছেন। সুতরাং এখন তার ইস্তফা দেওয়া উচিত। কিন্তু তিনি তাওবাও করছেন না, আবার স্বীয় পদ থেকে ইস্তফাও দিচ্ছেন না।

এ ছাড়া সাবায়িদের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছিল যে, খলিফা বার্ধক্যের কারণে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না। সুতরাং শাসনক্ষমতা তার থেকে নিয়ে যোগ্য কোনো সাহাবির হাতে অর্পণ করলে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ সাধিত হবে।[১৮৮]

বানোয়াট পত্র

এ ঘটনার কিছুদিন পরই বিদ্রোহীরা হজরত আলি, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর এবং উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর মতো মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রচারপত্র রচনা করে রাতারাতি কুফা, বসরা, মিসরসহ বড় বড় সব শহরে ছড়িয়ে দিল। সেসব চিঠিতে উক্ত বিশিষ্ট সাহাবিগণের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে যে, যদি তারা জিহাদ করতে চায়, তা হলে যেন মদিনায় এসে চলমান দালিলিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং শাসক পরিবর্তনের আন্দোলনে তাদের সাথে থাকে।[১৮৯]

---

[১৮৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২৭৫-২৭৭

[১৮৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২৭৭

সাবায়ি কাফেলার অভিযান

এবার ষড়যন্ত্রকারীরা মদিনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। কুফা, বসরা ও মিসর থেকে একটি করে কাফেলা গঠন করা হলো। ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রীয় নেতাদের মাথায় চক্রান্তের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা সাজানোই ছিল। কিন্তু তারা তাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকদের সম্মুখেও কেবল এতটুকুই প্রকাশ করল যে, এখন আমরা হাজী বেশে বের হয়ে মদিনায় পৌঁছব। তারপর সেখানে উসমানকে অবরোধ করে তাকে বরখাস্ত করব। যদি সে মানতে না চায়, তা হলে তাকে হত্যা করে ফেলব।[১৯০]

কিন্তু তখন পর্যন্ত চক্রান্তের প্রথম পদক্ষেপের কাজ চলছিল। অর্থাৎ সর্বসম্মত খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকজন ক্ষমতার দাবিদার দাঁড় করানো। এর জন্য রীতিমতো আরেক চক্রান্ত সাজানো হয়েছিল। বসরার আন্দোলনকারীদের মধ্যে হজরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, কুফাবাসীদের মধ্যে হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং মিসরবাসীদের মধ্যে হজরত আলি অধিক গ্রহণযোগ্য ছিলেন। এ কারণে বসরাবাসীকে বুঝানো হয়েছিল যে, হজরত উসমানকে বরখাস্ত করে হজরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে খলিফা নিযুক্ত করা হবে। অন্যদিকে কুফা থেকে যাত্রাকারী লোকদের সম্মুখে এ লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, মদিনায় গিয়ে তারা হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে খলিফা নিযুক্ত করবে। অন্যদিকে মিসরের আন্দোলনকারীদের চাহিদা অনুযায়ী তাদেরকে বলা হয়েছিল হজরত আলির হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হবে।[১৯১]

আসলে মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের পরস্পরের মধ্যে যে আন্তরিকতাপূর্ণ মতবিরোধ ছিল, তার সংবাদ মদিনার বাইরেও চলে যেত। আর ঠিক যেভাবে আজকের যুগে বহু মানুষ এ বিষয়টিকে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক শত্রুতা হিসেবে দেখে, সেভাবেই সেযুগেও বহু মানুষ এমনই

---

[১৯০] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৬, হজরত উসমান রা. এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। বরং তার পক্ষ থেকে প্রেরিত দুজন সংবাদবাহক বিদ্রোহীদের দলের সাথে মিশে গিয়ে তাদের এ চক্রান্তের সংবাদ উদ্ধার করে এনেছিল। হজরত উসমান রা. এ সংবাদ জানতে পেরে পথভ্রষ্টদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করেছিলেন। (তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৬)

[১৯১] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৫০

মনে করত। কেউ কেউ এ মতবিরোধের সংবাদ শুনে ধারণা করেছিল যে, মদিনার অধিবাসী ও বিশিষ্ট সাহাবিগণ হজরত উসমান রা. এর নেতৃত্ব এবং বনু উমাইয়ার উত্থানের কারণে হিংসার অনলে জ্বলছে। অন্যদিকে সাবায়িরা এ সংবাদ শুনে আশা করতে লাগল যে, মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিগণ বর্তমান খলিফার ক্ষমতা হরণের পথে তাদের পাশে থাকবেন। অথচ তাদের এ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

৩৫ হিজরির শাওয়াল মাসে কুফা, বসরা ও মিসর থেকে এ কাফেলাগুলো মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। প্রতিটি কাফেলার সদস্য ছিল প্রায় এক হাজার।[১৯২]

এমন নয় যে, হজরত উসমান গনি রা. এর গভর্নর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ চক্রান্ত ও তার সম্ভাব্য ফল সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। এ কারণে যখন কুফার গভর্নর হজরত হুযাইফা ইবনুল ইয়েমেন রা. এর নিকট প্রশ্ন করা হলো যে, একদল মানুষ হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের উদ্দেশ্যে শহর থেকে বের হয়েছে, এদের পরিণতি কী হবে?

হজরত হুযাইফা রা. সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, আল্লাহর কসম, এরা হজরত উসমানকে হত্যা করেই ছাড়বে। কিন্তু হজরত উসমান রা. হবেন জান্নাতের অধিবাসী আর তার হত্যাকারীরা হবে নিশ্চিত জাহান্নামি।[১৯৩]

সাবায়ি কাফেলার মদিনায় আগমন : প্রথম পদক্ষেপ ব্যর্থ

মদিনা ছিল চারদিক থেকে ইসলামি শহর-বেষ্টিত স্থান। বহু দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোথাও কাফেরদের কোনো এলাকা ছিল না। তাই মদিনায় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার তেমন প্রয়োজন ছিল না। যার ফলে মদিনায় সৈন্য বাহিনী থাকত নামে মাত্র।

শাওয়ালের শেষের দিকে হাজী বেশে চক্রান্তকারীদের তিনটি দলই মদিনা থেকে ৪৮ মাইল (সাড়ে ৭৭ কিলোমিটার) দূরে ছাউনি ফেলল। কাফেলার সাধারণ লোকদেরকে এখানে রেখে বিশেষ লোকেরা সম্মুখে অগ্রসর হয়।

---

[১৯২] তারিখুত তাবারি : ৩/৩৪৮-৩৪৯

[১৯৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৬৬৭,

মূলত সাধারণ লোকদেরকে এই ভুল বুঝিয়ে সঙ্গে আনা হয়েছিল যে, মদিনায় এক অত্যাচারী শাসক চেপে বসে আছে। যার উপর স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামও সন্তুষ্ট নন। আর এই ভুল জিইয়ে রাখার জন্য আবশ্যক ছিল যথাসম্ভব সাধারণ সদস্যদেরকে মদিনার অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ও অনবগত রাখতে হবে। শেষে যখন চূড়ান্ত প্রয়োজনের সময় হবে, তখন বিক্ষুব্ধ ও রোষানলে উত্তপ্ত করে হঠাৎ সামনে আনা হবে।

ষড়যন্ত্রের মূল হোতারা সম্মুখে অগ্ররস হয়ে ছাউনি ফেলল। মিসরের লোকেরা 'যিলমারওয়া' নামক স্থানে, বসরার লোকেরা 'যিখাশাব' নামক স্থানে এবং কুফার লোকেরা 'আওয়াস' নামক স্থানে অবস্থান নিল। তারপর কাফেলার নেতারা একান্ত সহচরদের নিয়ে মদিনায় প্রবেশ করল।

তারা যখন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা, হজরত আলি এবং হজরত যুবাইর রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, তখন এদের প্রত্যেককে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ দেখতে পেল। অবস্থা বেগতিক দেখে হতভাগারা হজরত উসমান রা. এর বরখাস্তের দাবি লুকিয়ে রেখে শুধু এতটুকু বলল যে, আমরা কয়েকজন গভর্নরের বরখাস্তের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু একজন সাহাবিও তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না।[১৯৪]

মদিনার বাইরে সাহাবায়ে কেরামের পাহারা

হজরত আলি রা. হজরত তালহা রা. এবং হজরত যুবাইর রা. বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের নাম ব্যবহার করে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে পরিবেশ ঘোলা করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাই তারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক দল নিয়ে মদিনার বাইরে পাহারায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কেননা তারা হজরত উসমান রা. এর সুরক্ষার জন্য ছিলেন অনেক চিন্তিত। হজরত আলি রা. পুত্র হাসানকে, হজরত যুবাইর রা. তার পুত্র আবদুল্লাহকে এবং একইভাবে হজরত তালহা রা. তার দুই পুত্রকে দায়িত্ব অর্পণ করলেন, যেন হজরত উসমানের হেফাজতের জন্য তারা সতর্ক ও সজাগ থাকে।[১৯৫]

---

[১৯৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৫০

[১৯৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৫০

হজরত উসমান রা. নিজেও মদিনার সুরক্ষার জন্য জরুরি ব্যবস্থাগ্রহণ থেকে কোনো রকম উদাসীন ছিলেন না। হজরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে তিনি ৫০ জন অশ্বারোহীর একটি দল যি-খাশাব নামক স্থানের দিকে পাঠিয়ে দেন।[১৯৬]

এসব কারণে বিদ্রোহীরা সে যাত্রায় শক্তির জোরে মদিনায় প্রবেশ করার দুঃসাহস করেনি।

বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে বিদ্রোহীদের পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ

তারপর মিসরের বিদ্রোহীদের মূল হোতারা হজরত আলি রা. এর খেদমতে উপস্থিত হলো। হজরত আলি তখন মদিনার বাইরে সেনাবাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। বিদ্রোহীরা তার কাছে আবেদন করল, তারা তাকে খলিফারূপে মেনে নিতে প্রস্তুত।

হজরত আলি রা. তাদেরকে কঠোর ভাষায় শাসিয়ে তাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, ভালো লোকেরা জানে, যি-মারওয়া এবং যি-খাশাবে অবস্থানকারী কাফেলার প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে কী অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল।

এমনিভাবে বসরার বিদ্রোহীরা হজরত তালহা রা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে একই রকম আবেদন করল। কিন্তু তিনিও তাদেরকে হুবহু হজরত আলির ন্যায় উত্তর দিলেন।

এমনিভাবে কুফার বিদ্রোহীরা হজরত যুবাইর রা. এর কাছ থেকে একই রকম উত্তর পেল।[১৯৭]

মোটকথা, রাসুল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর জ্ঞান, স্বভাবজাত বিচক্ষণতা ও সতর্কতা এবং ঈমানি দূরদর্শিতার ফলে বিজ্ঞ সাহাবিগণ ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হলেন না। আর এভাবেই তারা উম্মতকে তিন ভাগে বিভক্ত করার সাবায়ি-ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন।

---

[১৯৬] তারিখে দিমাশক লি ইবনি আসাকির : ৩৯/৩২২, হজরত উসমান রা. এর জীবনী,

[১৯৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৫০

বিজ্ঞ সাহাবিদের ধমক ও হুঁশিয়ারি পর চক্রান্তকারীরা ঝিমিয়ে পড়ে। হজরত উসমান রা. তাদের পরিপূর্ণ সান্ত্বনার জন্য হজরত আলি রা. কে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। হজরত আলি রা. তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'আমরা আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের অধিকার দিয়ে যাব।'

আন্দোলনরত দলের সাধারণ জনতা ছিল সহজ সরল মানুষ। আসলে তাদেরকে আনা হয়েছিল প্রতারণা করে। হজরত আলির বক্তব্য শুনে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই এবং বর্তমান আমিরুল মুমিনিনের প্রতিনিধি আলি রা. আল্লাহর কিতাব অনুসারে আমাদের সাথে কথা বলছেন। সুতরাং তার কথা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।[১৯৮]

সাবায়ি ফেতনার এই আগুন পূর্ণরূপে নির্বাপিত করার লক্ষ্যে হজরত উসমান স্বয়ং মদিনার বাইরে বেরিয়ে আসেন। একটি গ্রামে বিদ্রোহীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[১৯৯] তারপর পবিত্র কুরআন মাজিদ এনে সম্মুখে রাখেন। বিদ্রোহীদের সরদাররা বিভিন্ন আয়াত তেলাওয়াত করে ইসলামের এই তৃতীয় খলিফার বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্ম সম্পর্কে আপত্তি ও অভিযোগ করতে থাকে। আর হজরত উসমান রা. এক এক করে প্রতিটি কথার প্রশান্তিদায়ক উত্তর প্রদান করতে থাকেন।[২০০]

বিদ্রোহীরাও হজরত উসমান রা. এর বরখাস্তের দাবি ছেড়ে দিয়ে শুধু গভর্নরদের পরিবর্তনে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হজরত উসমান রা. তাদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন, 'তোমরা যেকোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে পছন্দ করবে, আমি তাকেই গভর্নর পদে নিযুক্ত করব। আর যাকে তোমরা পছন্দ করবে না, তাকে বরখাস্ত করে দেব।'[২০১]

---

[১৯৮] তারিখে দিমাশক : ৩৯/৩২৮, হজরত উসমান রা. এর জীবনী।

[199] বর্ণিত আছে-

فاستقبلهم فكان في قرية خارجا من المدينة. (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٢٩٠، ط الرشد)

[২০০] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৬৯

[২০১] বর্ণিত আছে-

قال : فليقم اهل كل مصريسألونى صاحبهم الذى يحبونه فاستعمله عليهم واعزل عنهم الذى يكرهون. (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٢٩١)

একথা বলে তিনি বিদ্রোহীদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তারা আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। যতদিন শাসনক্ষমতা আপন অবস্থায় থাকবে, ততদিন তারাও উম্মাহর ঐক্যে একীভূত হয়ে থাকবে।

বিদ্রোহীরা সন্তুষ্টচিত্তে হজরত উসমানের প্রস্তাবে সম্মত হলো।[২০২] মিসরের অধিবাসীদের দাবি অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন আবু বকর রা. কে তাদের গভর্নর পদে নিযুক্ত করার আদেশও তখন লিখে দেওয়া হয়েছিল।[২০৩]

এ অঙ্গীকার ৩৫ হিজরির ১ যিলকদ সম্পন্ন হয়েছিল।[২০৪]

বিদ্রোহী কাফেলার প্রস্থান

উক্ত অঙ্গীকারের খবর মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর অন্যান্য শহরে শান্তি ও নির্ভাবনার সুবাতাস বয়ে গেল। বিভ্রান্তির শিকার মুসলমানরা বুক ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।[২০৫] বাহ্যিকভবে মনে হলো, ষড়যন্ত্রের দাবানল স্তিমিত হয়ে গেছে। বিদ্রোহী সংগ্রামের হোতারা বিফল মনোরথ হয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করল। তবে মালিক বিন আশতার নাখায়ি এবং হুকাইম বিন জাবালা অজানা কোনো কারণে মদিনায় থেকে গেল।[২০৬]

ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পদক্ষেপ : বানোয়াট চিরকুট এবং বিদ্রোহীদের পুনর্বার আক্রমণ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, উক্ত আন্দোলন যদি সত্যিকার অর্থে হতো, তা হলে উল্লিখিত সর্বসম্মত অঙ্গীকারের পর তা থেমে যেত; কিন্তু ষড়যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ যেই নির্লজ্জদের হাতে ছিল, তারা তো কঠোরভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, বিশৃঙ্খলার আগুন আমরা যেকোনো মূল্যে জ্বালিয়েই ছাড়ব।[২০৭]

---

[২০২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১২৮

[২০৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/২৮১

[২০৪] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৬৮, মাদাইনির বর্ণনা অনুযায়ী।

[২০৫] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৫৭, কিতাবুল জামাল

[২০৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৭৫, মুহাম্মদ বিন আমর থেকে বর্ণিত।

[২০৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৫০,

যার ফলে ঘটনা এই ঘটল যে, মিসরের দলটি ফিরতিপথে যাত্রা করছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর দূরে এক ব্যক্তির দেখা মিলল। লোকটি তাদেরকে দেখে পালিয়ে গেল। একটু পর সে আগের চেয়ে আরো কাছে এলো। কিন্তু এবারও সে পালিয়ে গেল। কাফেলার লোকদের সন্দেহ হলো। তারা লোকটির পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে নিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার পরিচয় কী?

বলল, আমি আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে মিসরের গভর্নরের প্রতি প্রেরিত বার্তাবাহক।

লোকেরা তাকে তল্লাশি করল। তখন তার কাছ থেকে হজরত উসমানের মৌখিক বক্তব্য-লেখা একটি চিরকুট উদ্ধার হলো। তাতে মিসরের গভর্নরকে আদেশ করা হয়েছিল, এই কাফেলা মিসরে প্রত্যাবর্তনের পরপরই এদের সকলকে হত্যা করে ফেলবে।[২০৮]

এ লেখা দেখে কাফেলার লোকেরা ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তাকবিরধ্বনি তুলে এত দ্রুত তারা মদিনায় ফিরে এলো যে, স্থানীয় লোকেরা হতভম্ব হয়ে পড়ল। এবার কাফেলার কাউকেই পেছনে রাখা হলো না। সকল বিদ্রোহী মদিনায় প্রবেশ করল।[২০৯] অল্প সময়ের ব্যবধানে বসরা ও কুফার দলদুটিও ফিরে এলো এবং মিসরের কাফেলার সাথে একজোট হয়ে গোটা শহরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিল। শহরের রাস্তা-ঘাট ও অলিগলি দখল করে শহরবাসীকে অস্থির করে তুলল। তারপর কয়েকজন বিদ্রোহী হজরত আলি রা. এর কাছে গিয়ে বলল, আপনি উসমানের বিরুদ্ধে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করুন।

হজরত আলি রা. চরম ঘৃণার স্বরে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সাথে যাব না।

তারা বলল, তা হলে আপনি আমাদেরকে সেই সমস্ত চিঠি কেন লিখেছিলেন (যাতে আন্দোলনের আহ্বান করা হয়েছিল)?

---

[২০৮] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৬৯, তারিখুল মাদিনা লি ইবনি শাব্বাহ, ৪/১১৪৯

[২০৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৫১

হজরত আলি রা. বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে কোনো চিঠি লিখিনি।

একথা শুনে সাধারণ বিদ্রোহীরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল আর বলতে লাগল, আরে! তোমরা এর জন্য লড়াই করছ, এর জন্য রাগ করছ![২১০]

বস্তুত সাধারণ বিদ্রোহীদের ধারণাই ছিল না যে, সাহাবিদের নামে আন্দোলনের আহ্বানসংবলিত চিঠিগুলো ছিল বানোয়াট।

কুফার বিদ্রোহীদের সঙ্গে হজরত যুবাইর রা. এর এবং বসরার বিদ্রোহীদের সঙ্গে হজরত তালহা রা. এর একই ধরনের বাক্যালাপ হলো। সাহাবায়ে কেরাম বিদ্রোহীদের এ পর্যন্ত বললেন যে, আচ্ছা, তোমাদের এক কাফেলার লোকেরা অন্য কাফেলার সাথিদের অবস্থা জানলে কী করে? তোমরা তো তিনটি কাফেলায় ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যের দিকে যাত্রা করছিলে। এক কাফেলা থেকে আরেক কাফেলার মধ্যে প্রায় কয়েকদিনের দূরত্ব ছিল। সুতরাং যেভাবেই হোক, এটা পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।[২১১]

এবার বিদ্রোহীরা হজরত উসমান রা. এর কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইল, আপনি কি আমাদের সম্পর্কে এই চিরকূট পাঠিয়েছিলেন?

হজরত উসমান রা. অত্যন্ত সরল এবং যৌক্তিকভাবে উত্তর দিলেন যে, আচ্ছা তোমরা দুটি পদ্ধতির যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পার। হয়তো এ সম্পর্কে দুজন মুসলমান সাক্ষী উপস্থিত করো যে, এ চিরকূট আমি লিখিয়েছি, অথবা আমার থেকে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করো যে, আমি নিজেও এ চিরকূট লিখিনি এবং অন্যকাউকে দিয়েও লেখাইনি। আর না এর সম্পর্কে আমি কিছু জানি। কেননা সিলমোহর নকলও হতে পারে।

বিদ্রোহীরা শরিয়তসম্মত কোনো সাক্ষীও পেশ করতে পারল না, আবার হজরত উসমান রা. থেকে শপথ নিতেও সম্মত হলো না। বরং চরম

---

[২১০] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৫৫

[২১১] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৫১

ক্ষোভ ও প্রান্তিক চিন্তা থেকে তারা কেবল একটি কথাই বলছিল, তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ।[২১২]

বিদ্রোহীরা এও বলল যে, এ চিরকুট যদি আপনার না হয়ে থাকে, তবে কি এটা মারওয়ানের কাজ? তা হলে তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন।

মুহাম্মদ বিন মাসলামার মতও এটাই ছিল যে, এই ষড়যন্ত্র মারওয়ানই করেছে। কিন্তু হজরত উসমান রা. আশঙ্কা করছিলেন যে, এ উন্মাদের দল মারওয়ানকে হত্যাই করে ফেলে কি না। তাই তিনি মারওয়ানকে তাদের হাতে তুলে দেননি।[২১৩]

---

[২১২] তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা : ১৬৯

[২১৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৭৪

গোপন পত্রের ষড়যন্ত্রের হোতা কি মারওয়ান ছিল?

প্রসিদ্ধ আছে যে, গোপন পত্র প্রেরণের ষড়যন্ত্র করেছিল, হজরত উসমান রা. এর লিপিকার মারওয়ান। কিন্তু এর উপর প্রশ্ন ওঠে যে, মারওয়ান কি এতটুকু বুঝত না যে, ধরা পড়লে তার কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে? এমনকি এর পরিণতিতে সশস্ত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে এবং সবশেষে শাসন ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়তে পারে, এটা কি মারওয়ানের ধারণা ছিল না? কিন্তু এর বিনিময়ে মারওয়ান এমন কী-ই বা লাভ করতে পারত? বরং এর ফলে তার বর্তমান পদ তো ভালো, জীবনটাই হুমকির মুখে পড়ে যেতে পারত।

আসলে এখানে গভীর সত্য এই যে, হজরত উসমান এবং মারওয়ান উভয়ই এ অপবাদ থেকে নির্দোষ ছিলন। তাদের নির্দোষ হওয়া এবং চিরকুট বানোয়াট হওয়ার অনস্বিকার্য প্রমাণ এই যে, যার কাছে ঐ চিরকুট পাঠানো হয়েছিল, সেই আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ রা. ঐ সময় মিসরেই ছিলেন না। বরং মিসরের বিদ্রোহীরা মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর তিনিও তাদের পেছনে পেছনে মিসর থেকে বেরিয়ে শাম ও হিজাজের সীমান্তবর্তী এলাকার সন্নিকটে অবস্থান করছিলেন। যাতে প্রয়োজন হলে মদিনায় আসতে পারেন, আর প্রয়োজন না হলে মিসর ফিরে যাবেন। নিম্নের ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো একথাই প্রমাণ করছে :

- ثم ان عبد الله بن سعد خرج الى عثمان فى آثار المصريين، وقد كان كتب اليه يستأذنه فى القدوم عليه، فأذن له، قدم ابن سعد حتى اذا كان بايلة بلغه ان المصريين قد رجعوا الى عثمان وانهم قد حصروه،

অনুবাদ : আবদুল্লাহ বিন সা'দ মিসরিদের পেছনে হজরত উসমান রা. এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তিনি পত্র-মারফত হজরত উসমান রা. এর কাছে আসার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন এবং হজরত উসমান অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আবদুল্লাহ বিন সা'দ এসে যখন আইলা নামক স্থানে পৌছেন, তখন জানতে পারেন, মিসরি দল

মদিনায় ফিরে গিয়ে হজরত উসমান রা. কে অবরোধ করে রেখেছে। (তারিখুত তাবারি : ৪/৩৭৮, ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত।)

- فخرج عبد الله بن سعد من مصر فنزل على تخوم ارض مما يلى فلسطين فانتظر ما يكون من امر عثمان رضـ

অনুবাদ : হজরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ মিসর থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিন সংলগ্ন এলাকায় এসে পড়লেন। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন, হজরত উসমানের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়। (তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪৬, আবি মিখনাফ থেকে বর্ণিত।)

- كان عبد الله بن سعد القرشى امره عثمان رضـ على مصر، فخرج على عثمان رضـ وافدا حين تكلم الناس فى عثمان رضـ (ثم ذكر الراوى خروج ابن ابى حذيفة وغلبته على مصر ومراجعة عبد الله بن سعد الى مصر ومنع البغاة اياه عند جسر بحيرة قلزم) فانصرف الى عسقلان وكره ان يرجع الى عثمان رضـ وقتل عثمان رضـ وهو بعسقلان.

অনুবাদ : আবদুল্লাহ বিন সা'দ কুরাইশিকে হজরত উসমান রা. মিসরের গভর্নর বানিয়েছিলেন। তারপর যখন মানুষ হজরত উসমান রা. সম্পর্কে নানা রকম কথা বলতে শুরু করল, তখন আবদুল্লাহ বিন সা'দ হজরত উসমান রা. এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মিসর থেকে রওনা করল। (তারপর তার অনুপস্থিতিতে মিসরে ইবনু আবি হুযাইফাহর বিদ্রোহ এবং আবদুল্লাহ বিন সা'দের মিসরের দিকে প্রত্যাবর্তন, এবং লোহিতসাগরের উপকূলে বিদ্রোহীদের কড়া প্রহরার কারণে সম্মুখে অগ্রসর হতে না পারার ঘটনা উল্লেখ করার পর বর্ণনাকারী বলেন) তখন আবদুল্লাহ বিন সা'দ আসকালান ফিরে যান। কিন্তু হজরত উসমান রা. এর কাছে ফিরে যাওয়াটা তিনি পছন্দ করলেন না। হজরত উসমানকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তিনি আসকালানেই ছিলেন। (তারিখুল মাদিনা লি ইবনি শাব্বাহ্ : ৪/১১৫৩)

মিসরের গভর্নরের নিজ এলাকায় না থাকার বিষয়টি ছিল একটি সরকারি সংবাদ। যে সম্পর্কে হজরত উসমান রা. ও মারওয়ান অবগত হয়েছিলেন (কেননা মারওয়ান ছিল হজরত উসমান রা. এর সকল চিঠিপত্র ও হিসাবের লেখক এবং যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রমের পরিচালক)। সুতরাং হজরত আবদুল্লাহ বিন সারাহ রা. এর নামে মারওয়ান কর্তৃক এ চিরকুট লেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না যে, 'কাফেলা মিসরে ফিরে গেলে তাদেরকে হত্যা করবে'। কেননা মারওয়ান তো জানতেনই যে, আবদুল্লাহ বিন সারাহ মিসর থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

সুতরাং এ চিরকুট নিশ্চয় এমন কেউ বানিয়েছিল, যে উক্ত সরকারি তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিল না। সম্ভবত হুকাইম বিন জাবালা এই বানোয়াট চিরকুটের খেলা খেলেছিল। কেননা কাফেলা রওনা হয়ে যাওয়ার পর সে মদিনায় রয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আশতার নাখায়ির উপরও সন্দেহ হতে পারে। তবে তা খুবই ক্ষীণ। কেননা তার স্বভাবে ষড়যন্ত্রের তুলনায় নির্বুদ্ধিতা, আবেগ ও ক্ষিপ্রতাই অধিক বিরাজমান বলে দেখা যায়। কাজেই প্রবল ধারণা এটাই যে, এ কুটচাল হুকাইম বিন জাবালাই করেছিল, যাকে কোনো কোনো বর্ণনায় لص من لصوص عبد القيس তথা 'আবদুল কায়েস গোত্রের জনৈক চোর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩৫)

প্রসিদ্ধ আছে যে, যে লোকটি উক্ত চিরকুট নিয়ে যাচ্ছিল, সে ছিল হজরত উসমান রা. এর জনৈক গোলাম। আর তাকে পাঠিয়েছিল হজরত উসমানের লিপিকার মারওয়ান। কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, হজরত উসমানের কোনো গোলাম এই ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়নি। ষড়যন্ত্রকারীরা মিথ্যা রটিয়ে দিয়েছিল যে, হজরত উসমানের গোলামকে আটক করা হয়েছে।[২১৪]

বিদ্রোহীরা মসজিদে নববিতে

তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত বিদ্রোহীরা মদিনায় দাঁত কটকট করতে থাকে। মদিনার লোকেরা বিপদের ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে।

---

[২১৪] কিন্তু সত্যিই যদি তা হতো, তা হলে বিদ্রোহীরা নিশ্চয় গোলামকে ধরে মদিনাবাসীর সম্মুখে পেশ করত। যদি হজরত উসমান রা. তাকে পাঠিয়ে থাকতেন, তাহলে বিদ্রোহীরা সেই গোলামের মুখেই সাক্ষ্য পেশ করে তাদের দাবি প্রমাণ করতে সক্ষম হতো। চিঠি নকল না আসল এই প্রশ্নের চেয়ে বড় কথা হলো বিদ্রোহীরা মাত্র একজন মানুষের সাক্ষ্য দ্বারা হজরত উসমান রা. কে অপরাধী সাব্যস্ত করে ফেলল! অথচ ইতিহাসের তথ্য অনুসারে সেই চিরকুটবাহীকে কোথাও পেশ করা হয়নি।

সুতরাং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট ধরা পড়ে যে, ষড়যন্ত্রের মূল হোতারা পূর্ব থেকে নকল সিলমোহর তৈরি করে রেখেছিল। তারপর ভুয়া চিরকুট লিখে, তার উপর সেই নকল সিল লাগিয়ে তাদেরই একজনের হাতে দিয়ে বলে দিয়েছে যে, তুমি কাফেলার আগে চলবে এবং হঠাৎ দেখা দেবে।

তারপর এ পত্রবাহক মিসরি কাফেলার সম্মুখে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে আবার পালিয়ে গেছে, তার থেকেও কিন্তু ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যায়। নতুবা কাছে গিয়ে আবার দূরে পালিয়ে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? একইভাবে কাফেলার লোকদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় তৎক্ষণাৎ এ উত্তরটিও ছিল বড় আশ্চর্যজনক যে, 'আমি খলিফার পক্ষ থেকে মিসরের গভর্নরের প্রতি প্রেরিত বার্তাবহক'। যদি সত্যিই সে খলিফার পক্ষ থেকে প্রেরিত হতো এবং গোপন বার্তা বহন করে নিয়ে যেত, তাহলে অবশ্যই সে নিজের পরিচয় গোপন করত।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, ওয়াকিদির বর্ণনায় এ ব্যক্তিকে হজরত উসমান রা. এর গোলাম নির্দেশ করে বলা হয়েছে, তার নাম ছিল আবুল আওয়ার বিন সুফিয়ান আস সুলামি। অথচ এটা বড় হাস্যকর কথা। কেননা আবুল আওয়ার বিন সুফিয়ান আস সুলামি নামে তার কোনো গোলাম ছিল না। বরং সে ছিল বনু আবদে শামসের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন। তার প্রকৃত নাম ছিল আমর বিন সুফিয়ান। আর তিনি ছিলেন ঐসব সাহাবির একজন, যারা হজরত উমর রা. এর যুগে 'কুবরুস' বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সেনাপতি হয়েছিলেন। (আল ইসাবাহ : ৪/৫২৯,৫৩০)

হজরত উসমান রা. তখনও মসজিদে নববিতে নামাজ পড়াতে থাকেন। ইতিমধ্যে জুমার দিন উপস্থিত হলো। হজরত উসমান খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বারে দাঁড়ালেন। আর ঠিক তখনই বিদ্রোহীরা হাঙ্গামা শুরু করল। হজরত উসমান রা. এর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হলো। পাথরের আঘাতে তার শরীর জর্জরিত হলো এবং তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। লোকেরা তাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেলেন। হজরত আলি, হজরত তালহা, হজরত যুবাইরসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তার শুশ্রূষার জন্য এগিয়ে গেলেন। সৃষ্ট সংকট সম্পর্কে তারা ভীষণ শঙ্কা ও দুশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত করলেন।[২১৫]

অবরোধ

তারপর বিদ্রোহীরা সর্বপ্রথম হজরত উসমান রা. এর নামাজ পড়ানো এবং খুতবা প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। তারপর জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন বন্ধ করে দিল। আর এর কিছুদিন পরই তার বাড়ি অবরোধ করল।[২১৬]

বিদ্রোহীদের দাবি ছিল, হজরত উসমান রা. খেলাফত থেকে ইস্তফা দিয়ে দিন। কিন্তু হজরত উসমান রা. এর প্রথম এবং শেষকথা এটিই ছিল যে, 'আমি সেই পোশাক খুলে ফেলব না, যা আমাকে পরিধান করিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা'। মূলত আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হজরত উসমানকে অসিয়ত করে বলেছিলেন, 'কখনো যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে খেলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা হলে তা ছেড়ে দিয়ো না'।[২১৭]

নবীজি বলেছিলেন, 'হে উসমান, কোনো দিন যদি আল্লাহ তোমাকে এই পদ দান করেন আর মুনাফিকরা যদি চায় আল্লাহ তোমাকে যে পোশাক পরিধান করিয়েছেন তা খুলে ফেলতে, তা হলে তুমি তা খুলে ফেলবে না।'

---

[২১৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৫৩

[২১৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৮

[২১৭] সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৭০৫, বাবু মানাকিবি উসমান রা., আলবানি বলেছেন, হাদিসটি সহিহ।

আল্লাহর নবীর পবিত্র জবানে গুরুত্বের সঙ্গে তিনবার একথা উচ্চারণ করা হয়েছিল।[২১৮]

এ কারণেই আশতার নাখায়ি যখন হজরত উসমান রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে খেলাফত থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করছিল, তখন আল্লাহর নবীর এ প্রিয় জামাতা বলেছিলেন, 'আল্লাহ আমাকে যে পোশাক পরিধান করিয়েছেন, আমি তা খুলব না। এতে যদি আমার গর্দানও কর্তন করা হয়, আমি সন্তুষ্ট। তবু আমি চাই না উম্মাহকে পরস্পর পরস্পরের উপর আক্রমণকারী হিসাবে ছেড়ে যাব।

হজরত উসমান যখন আশতার নাখায়ির প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, তখন সে উন্মুক্ত লড়াইয়ের হুমকি দিল। হজরত উসমান তখন বললেন, যদি তোমরা এমন করো, তা হলে আগামীতে কখনো একে অপরকে ভালোবাসতে পারবে না, কখনো সকলে একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবে না, কখনো একজোট হয়ে জিহাদ করতে পারবে না।[২১৯]

বিদ্রোহীদের দাবি কেন মানা হলো না?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উসমান রা. কে এ ফেতনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত করেছিলেন, যার শেষ পরিণতি হজরত উসমানের শাহাদাত।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহর নবী হজরত উসমান রা. কে কেন এত গুরুত্ব সহকারে খেলাফত বর্জন না করার তাগিদ করেছিলেন? তার কারণ এই ছিল যে, যে দলটি হজরত উসমানের বরখাস্ত দাবি করছিল, তারা কখনোই উম্মাহর সাধারণ জনমতের মুখপাত্র ছিল না। তারা শুধু উম্মাহকে বিবাদে জড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল। সুতরাং যে দলটি উম্মাহর সঠিক

---

[২১৮] বর্ণিত আছে-

يا عثمان ان اولاك الله هذا الامر يوما فارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذى قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات. (سنن ابن ماجة، ح : ١١٢. قال الالبانى : صحيح)

এ সহিহ হাদিস স্পষ্টরূপে প্রমাণ করছে যে, হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে শোরগোলকারী হজরত সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন না; বরং এর নাটের গুরু ছিল একদল মুনাফিক শ্রেণির লোক। কেননা আল্লাহর নবীর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাদেরকে বলা হয়েছে 'المنافقون' তথা মুনাফিকের দল।

[২১৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৭১, ৩৭২; ইয়াকুব বিন ইবরাহিম থেকে বর্ণিত।

প্রতিনিধিত্ব করছিল না, তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যদি হজরত উসমান রা. খেলাফত ছেড়ে দিতেন, তা হলে কেয়ামত পর্যন্ত একটা ভুল দৃষ্টান্ত হয়ে যেত যে, যখনই কোনো ন্যায়পরায়ণ বা দীনদার আমিরের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন কোনো জনগোষ্ঠী শোরগোল ওঠাবে এবং বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করবে, তখন তাকে দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে।

এ কারণেই হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বিদ্রোহীদের দাবি না মানার উপর অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়ে হজরত উসমান রা. সমীপে আরজ করেছিলেন, 'আপনি যদি খেলাফত ছেড়ে দেন, তা হলে কি চিরদিন দুনিয়াতে থাকতে পারবেন? আর যদি খেলাফত ত্যাগ না করেন, তা হলে এরা আপনাকে হত্যার চেয়ে বেশি কিছু কি করতে পারবে? আল্লাহ আপনাকে যে পোশাক পরিধান করিয়েছেন, তা খুলে ফেলার কোনো অবকাশ আমি দেখি না। যদি আপনি এমনটি করেন, তা হলে এটা একটা নিয়ম হয়ে যাবে যে, যখনই কোনো জাতি বা গোষ্ঠী তাদের খলিফা বা আমিরকে পছন্দ করবে না, তখনই তারা তাকে বরখাস্ত করে দেবে।'[২২০]

হজরত উসমান রা. অস্ত্র ধারণ না করার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন?

হজরত উসমান রা. এর সম্মুখে আরেকটি কঠিন পরীক্ষা এই ছিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাঙ্গামাপ্রিয় লোকদের বিপক্ষে তরবারি ধারণের পরিবর্তে ধৈর্য ও সহনশীল হওয়ার আদেশ করেছিলেন। লোকেরা যখন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের অনুমতি চাইল, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর নবী আমার থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আমি ধৈর্যের সাথে আমার জীবনকে সেই অঙ্গীকার পালনের পথ অবিচল রাখতে চাই'।[২২১]

হজরত মুগিরা বিন শু'বা রা. বারবার হজরত উসমানকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য অনুরোধ করছিলেন। তখন ইসলামের এ তৃতীয় খলিফা অত্যন্ত

---

[২২০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৬৬, সনদ সহিহ। তারিখুল মাদিনা লিবনি শাব্বাহ, ৪/১২২৬, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭০

[২২১] মুসনাদে আহমাদ : হাদিস : ২৪২৫৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১১৩, সনদ সহিহ।

দৃঢ়চিত্তভাবে বললেন, 'আমি আল্লাহর নবীর খলিফাদের মধ্যে সেই প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না, যে উম্মাহর রক্ত প্রবাহিত করবে।'[২২২]

একইভাবে হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হজরত কা'বা বিন মালেক, হজরত যায়েদ বিন সাবেত প্রমুখ সাহাবি আবেদন করছিলেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনি অনুমতি দিলে শত্রুদের তাড়ানোর ব্যবস্থা করি।

হজরত উসমান রা. এর নির্বিকার উত্তর ছিল, 'আমার এসবের কোনো প্রয়োজন নেই।'[২২৩]

সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে বাধাপ্রদানের দ্বিতীয় কারণ হলো হজরত উসমান রা. প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শহরকে হত্যা ও রক্তপাতের ক্ষেত্র পরিণত করতে চাচ্ছিলেন না। আল্লাহর নবীর এ বাণী তার স্মরণ ছিল- 'মদিনা অত্যন্ত সম্মানিত ভূমি। সুতরাং এর কোনো তরুলতা কাটা যাবে না, এর উপর কোনো বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। যে বা যারা এখানে বিশৃঙ্খলা ঘটাবে, তাদের উপর আল্লাহ, সকল ফেরেশতা এবং গোটা মানবজাতির অভিশাপ'।[২২৪]

অন্যান্য শহরবাসীর দুশ্চিন্তা ও সাবায়িদের অপপ্রচার

চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল, মদিনায় খলিফাতুল মুসলিমিনকে অবরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন শহর থেকে মুসলমানগণ মদিনার দিকে রওনা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। কেউ কেউ এই উদ্দেশ্যে পথেও নেমে পড়েছিলেন।[২২৫]

ইতিমধ্যে সংবাদ এলো, অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেছে, সন্ধি ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসা হয়েছে।

অথচ এটা ছিল ভুল সংবাদ। হাঙ্গামাকারীরা কুফা, বসরা ও শাম পর্যন্ত বড় বড় শহরে এ মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছিল। মদিনার

---

[২২২] মুসনাদে আহমাদ : হাদিস : ৪৮১

[২২৩] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৭০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭০৮২, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৩

[২২৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৬৭, কিতাবুল হজ্জ, বাবু হারামিল মাদিনা।

[২২৫] তারিখুত তাবারি, ৪/৩৫১-৩৫২, আত তারিখুল আওসাত : ১/৬২, এখানে আছে, 'হজরত উসমান রা. কে সাহায্য করার জন্য এলো'।

সঠিক চিত্র তারা এসব শহরের বিশ্বস্ত মুসলমানদের কাছে পৌঁছতে দেয়নি। ফলে স্বাভাবিক শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে মানুষ মদিনার উদ্দেশে সফরের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।[২২৬]

খাবার ও পানির অবরোধ, হজরত আলির পক্ষ থেকে সাহায্যের চেষ্টা

ইতিমধ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রচণ্ড বেড়ে গেল। সাথে সাথে বিদ্রোহীরাও অবরোধকে আরো কঠোর করে তুলল। হজরত উসমানের ঘরে খাবার পানি নিয়ে যাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। প্রথম দিকে হজরত আলি রা. কিছু না কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দিতেন। কিন্তু এক সময় বিদ্রোহীরা তাকেও বাধা প্রদান করে।

ধীরে ধীরে হজরত উসমান রা. এর ঘরের খাবার-পানি ফুরিয়ে যেতে লাগল। হজরত আলি রা. এ সংবাদ জানতে পেরে অত্যন্ত ক্ষোভের স্বরে বিদ্রোহীদের বললেন, তোমাদের এই আচরণ মুসলমানদের মতো নাকি কাফেরদের মতো? রোম-পারস্যের কাফেরও তো কারাবন্দিদের খাবার-পানি দেয়। এই মানুষটি তোমাদের কী ক্ষতি করেছে যে, তোমরা তাকে অবরোধ ও হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছ?

কিন্তু হজরত আলির এ বক্তব্য যেন ছিল অরণ্যে রোদন। নিরাশ হয়ে যখন হজরত আলি ফিরে আসতে চাইলেন, তখন স্বীয় পাগড়ি খুলে হজরত উসমান রা. এর ঘরে নিক্ষেপ করলেন। যাতে হজরত উসমান রা. বুঝতে পারেন যে, হজরত আলি রা. এসেছিলেন ঠিকই; কিন্তু কিছুই করতে পারেননি।[২২৭]

উম্মুল মুমিনিনদের পক্ষ থেকে হজরত উসমানকে সাহায্যের চেষ্টা

এহেন পরিস্থিতিতে একদিন উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা রা. একটি খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে খাবার-পানির বোঝা নিয়ে হজরত উসমান রা. এর বাড়ির কাছে গেলেন। কিন্তু নির্দয় বিদ্রোহীরা আল্লাহর নবীর জীবনসঙ্গিনীর লাজও রাখল না। তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল।

---

[২২৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৫৭,

[২২৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৮৬

খাদ্যসামগ্রী ছিনিয়ে নিল। তারপর তাকে বহনকারী খচ্চরটিকে এমনভাবে মারতে মারতে তাড়িয়ে দিল যে, উম্মে হাবিবা রা. মাটিতে আছড়ে পড়লেন। দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেয়ে কোনো রকম রক্ষা পেলেন।[২২৮]

অবরোধের বাকি দিনগুলো হজরত উসমান রা. ভীষণ কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তার প্রতিবেশী ছিলেন হজরত আমর বিন হাযাম রা.। তিনি অত্যন্ত গোপনে সামান্য কিছু খাদ্য-পানীয় হজরত উসমানের কাছে পাঠাতেন। এর দ্বারা কোনো রকম দিনাতিপাত হতো।[২২৯]

একদিন উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়াও হজরত উসমান রা. এর সাহায্যের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই তার বাহন অভিশপ্ত আশতার নাখায়ি নির্মমভাবে চপেটাঘাত করে ফিরিয়ে দেয়।[২৩০]

এমন সময় একদিন আশতার নাখায়ি হজরত আয়েশা রা. এর নিকট হজরত উসমান রা. এর হত্যা সম্পর্কে অভিমত জানতে চায়। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, আল্লাহর পানাহ চাই, মুসলমানদের রক্তপাত ঘটানো, তাদের খলিফাকে হত্যা করা এবং হারামকে হালাল করার অনুমতি আমি কী করে দিতে পারি?[২৩১]

আপন জীবনের চেয়ে হজের ব্যবস্থাপনার ভাবনা বেশি ছিল এই মজলুম খলিফার

ইতিমধ্যে হজের সময় ঘনিয়ে এলো। হজরত উসমান গনি রা. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে আদেশ করলেন, তিনি যেন হাজীদের কাফেলা নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। হজরত ইবনে আব্বাস

---

[২২৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৮৬

[২২৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৮৭

[২৩০] মুসনাদে ইবনুল জা'দ : ১/৩৯০, সনদ সহিহ।

[২৩১] তারিখুল মাদিনা লি ইবনি শাব্বাহ : ৪/১২২৪,১২২৫, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৬, সনদ সহিহ।
হয়তো উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর এই কঠোর বক্তব্যের কারণেই আশাতারসহ বহু বিশৃঙ্খলাকারী হজরত উসমান রা. এর হত্যার বিষয়ে একমত ছিল না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭০৯, সনদ সহিহ)

রা. আরজ করলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর কসম, আমার নিকট এসব দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা হজের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।'

কিন্তু ইসলামের এই মজলুম খলিফা কসম দিয়ে হজরত ইবনে আব্বাস রা. কে আদেশ পালন করতে বললেন, যাতে হজের মতো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান যথাযথভাবে ও পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন হয়।[২৩২]

মদিনার কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবি মদিনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন

হজের জন্য কাফেলা প্রস্তুত হলো। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকাও কাফেলার সাথে হজের উদ্দেশ্যে যাত্রার ইচ্ছা করলেন। কেননা বিদ্রোহীরা মদিনার নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেওয়ার পর, হজরত আয়েশা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, দুষ্কৃতিকারীরা হজরত উসমান রা. এর পর আল্লাহর নবীর স্ত্রীদেরকে লক্ষস্থল বানাতে পারে। বিশেষ করে উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা এবং হজরত সাফিয়া রা. কে জনসম্মুখে অপমানিত করার পর এ আশঙ্কা মোটেই অমূলক ছিল না।[২৩৩]

হজরত তালহা রা. এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবি এ অনিশ্চিত অবস্থায় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[২৩৪]

হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর ন্যায় অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদও সংকটময় অবস্থা সহ্য করতে পারেননি। অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে তিনি মদিনা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যাওয়ার আগে মদিনাবাসীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, 'হে প্রিয় মদিনাবাসী, যারা এখানে উপস্থিত আছ এবং যাদের সম্মুখে হজরত উসমান রা. কে হত্যা করা হবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে ছাড়বেন। সুতরাং যাদের হাতে হজরত উসমানকে সাহায্য করার শক্তি নেই, তারা যেন এখানে অবস্থান না করে।'

এ কথা বলে তিনি তার উভয় পুত্র আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে মদিনা ছেড়ে ফিলিস্তিন চলে যান। একইভাবে হজরত হাসসান বিন সাবেত রা. এবং আরো অনেকে মদিনা ছেড়ে গিয়েছিলেন।[২৩৫]

---

[২৩২] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৮৭
[২৩৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৮৬
[২৩৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৮৬,৩৮৭

হজরত যুবাইর রা.-রও মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনিও মদিনার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা তাকে তাদের আন্দোলনের শীর্ষ-নেতা বলে প্রচার করছিল। তাই হয়তো এই হতভাগাদের থেকে দূরে চলে গিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন যে, এই অন্যায়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।[২৩৬]

হজরত যুবাইর রা. এর বার্তা

মদিনার উপকণ্ঠে ছিল বিরাট গোত্র বনু আমর বিন আউফের বসবাস। এরা হজরত যুবাইর রা. এর নেতৃত্বে হজরত উসমান রা. এর পক্ষে দুশমনকে প্রতিহত করার জন্য সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত ছিল। হজরত যুবাইর রা. হজরত উসমান রা. এর নিকট বার্তা পাঠালেন যে, 'আমি আপনার অনুগত। আপনি চাইলে আপনার সাথেই আপনার গৃহে অবস্থান করব এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে সঙ্গ দেব। আর যদি বলেন, তা হলে এই মুহূর্তে যেখানে আছি, সেখানেই অবস্থান করব। বনু আমর বিন আউফের লোকেরা পরামর্শ করেছে যে, এখানে তারা আমার পাশে সমবেত হবে। আমি যা বলব, তারা তা-ই শুনতে প্রস্তুত'।

হজরত উসমান রা. উত্তর দিয়ে পাঠালেন যে, আপনি ওখানেই অবস্থান করুন। বনু আমর বিন আউফের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য অপেক্ষা করুন। হয়তো আল্লাহ তাদের মাধ্যমে এই দুর্যোগ মিটিয়ে দেবেন'।[২৩৭]

উপদেশমূলক ভাষণ

এ সময় হজরত উসমান রা. পূর্ণ সহমর্মিতার সঙ্গে চেষ্টা করেছেন যে, বিশৃঙ্খলাকারীদের মধ্যে যারা ভুল বুঝে এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে, তারা যেন সঠিকটি বুঝতে পারে এবং তাওবা করে ফিরে যায়। বাড়ির উঁচু প্রাচীরে দাঁড়িয়ে হজরত উসমান তাদেরকে সম্বোধন করে অনেক কথা বলেছেন। যেমন :

---

[২৩৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৫৮, সাইফ থেকে বর্ণিত।

[২৩৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯২

[২৩৭] তারিখে দিমাশক : ৩৯/৩৭৪, হজরত উসমান রা. এর জীবনীর অংশ, হজরত মুসআব বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সনদ সহিহ।

আমি কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান না যে, আমি নিজে 'বিরে রুমা' নামক কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি?

উপস্থিত সকলে বলল, জি, হ্যাঁ।

হজরত উসমান রা. বললেন, তা হলে তা সত্ত্বেও তোমরা কেন এ কূপের পানি আমার জন্য বন্ধ করে দিলে?

তারপর বললেন, কসম দিয়ে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান না যে, আমিই আশপাশের জমি ক্রয় করে মসজিদে নববি সম্প্রসারিত করেছি? কিন্তু বল, আমি ছাড়া আর কারো সম্পর্কে কি তোমরা জান, যাকে এর আগে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতে বাধা দেওয়া হয়েছে?

এ কথাগুলো এতটাই মর্মস্পর্শী ছিল যে, বিদ্রোহীদের মধ্যেও কেউ কেউ বলে উঠল, আমিরুল মুমিনিনের বিরুদ্ধে আমাদের হস্ত প্রসারিত করা উচিত হচ্ছে না, তাকে আরো সুযোগ দেওয়া উচিত।[২৩৮]

হক ও বাতিলকে 'দুইয়ে দুইয়ে চারে'র মতো স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য হজরত উসমান সে সময় আরো বলেছিলেন, 'কসম দিয়ে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান না যে, একবার আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরাপর্বতে অবস্থান করছিলেন। ইত্যবসরে হঠাৎ পাহাড়টি কেঁপে উঠল। আল্লাহর নবী পদাঘাত করে বললেন, 'থেমে যাও, তোমার উপর নবী, সিদ্দিক ও শহিদ ব্যতীত আর কেউ নেই'। সেদিন আমি আল্লাহর নবীর সঙ্গেই ছিলাম।

এই হাদিস স্মরণ করিয়ে আল্লাহর নবীর এ জামাতা বিদ্রোহীদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, যদি তাকে হত্যা করা হয়, তা হলে তিনি শহিদ হবেন। যার অর্থ, তাকে যারা হত্যা করবে, তারা ভ্রান্ত ও জালেম হবে।

হজরত উসমান রা. আরো বললেন, কসম দিয়ে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি জান না যে, বাইয়াতে রিদওয়ানে, যেদিন আল্লাহর

---

[২৩৮] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭২

নবী আমাকে মক্কার মুশরিকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সাহাবিদের হাতের সাথে তিনি স্বীয় পবিত্র হাত রেখে বলেছিলেন, 'এটি উসমানের হাত'।

আরো বললেন, কসম দিয়ে আমি তোমাদের বলছি, তাবুকযুদ্ধের কঠিন অভাবের সময় আল্লাহর নবী বলেছিলেন, কে আছে, যে আল্লাহর পথে মকবুল দান করবে...? সেদিন আমি বাহিনীর অর্ধেক সৈনিকের রসদপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

হজরত উসমান রা. প্রতিটি কথা কসম দিয়ে দিয়ে বলছিলেন। ফলে অনেক বিদ্রোহী ও মদিনাবাসী তার প্রতিটি কথা সত্যায়ন করছিল।[২৩৯]

এ সময়ই একদিন হজরত উসমান রা. বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে কোন অপরাধে হত্যা করবে? আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেবল তিন অবস্থায় কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ হতে পারে। যথা:

১. যখন বিবাহিত কোনো মুসলমান ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

২. যখন অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করে।

৩. অথবা যখন কোনো মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়।

আল্লাহর কসম, আমি না জাহিলিয়াতের যুগে কখনো অপকর্মে লিপ্ত হয়েছি আর না ইসলামগ্রহণের পরে। আমি কোনোদিন কাউকে হত্যাও করিনি যে, কিসাসস্বরূপ আমাকে হত্যা করবে। আর যেদিন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি, কখনো দীন থেকে বিমুখ হইনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল। কিন্তু আমার এই অবস্থান সত্ত্বেও এরা আমাকে কেন হত্যা করতে চাচ্ছে?[২৪০]

---

[২৩৯] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৪২০

[২৪০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২৯২

ষড়যন্ত্রের তৃতীয় পদক্ষেপ
শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা

হজের পর মদিনায় সংবাদ আসতে শুরু করল, হাজীরা ফিরে আসছেন।[২৪১] সাথে সাথে এ সংবাদও ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কুফা, বসরা ও শাম থেকে হজরত উসমান রা. এর সাহায্যে সেনাবাহিনী আসছে।[২৪২]

এদিকে বিদ্রোহীরা হজরত উসমান রা. থেকে ইস্তফা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ল। তাই ষড়যন্ত্রের তৃতীয় ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তারা স্থির করল, হজরত উসমানের ঘরের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাকে শহিদ করা হবে।[২৪৩]

কিন্তু আশতার নাখায়ির মতো প্রথম সারির বিদ্রোহীও সাবায়ি ষড়যন্ত্রের এ ভয়ানক পর্ব সম্পর্কে একমত ছিল না। সে উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা রা. কে পাঠিয়ে হজরত উসমান রা. কে তার ঘর থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু অন্যান্য বিদ্রোহী নেতা আশতারকে ধমক দিল এবং তার এই চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল।[২৪৪]

হজরত উসমান রা. জীবনের শেষদিনগুলোর একদিন তার বাসভবনের প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ কথা বললেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তোমরা যদি আমাকে হত্যা করো, তা হলে এর পর আর কোনোদিন একসাথে নামাজ আদায় করতে পারবে না। কখনো একজোট হয়ে দুশমনের মোকাবেলা করতে পারবে না। বরং মতানৈক্যের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে

---

[২৪১] তারিখুত তাবারি, ৪/৩৮৮

[২৪২] তারিখুত তাবারি, ৪/৩৮৫, সাইফ থেকে বর্ণিত।

[২৪৩] তারিখুত তাবারি, ৪/৩৮৮, সাইফ থেকে বর্ণিত।

[২৪৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭০৯, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এ বর্ণনাটির সনদকে সহিহ বলেছেন, ফাতহুল বারি : ১৩/৫৭,৫৮

এভাবেই পরস্পরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। একথা বলে তিনি এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলে প্রবেশ করিয়ে দেখান।[২৪৫]

সর্বশেষ ভাষণে হজরত উসমান রা. লোকদেরকে বলেছিলেন, 'হে মদিনাবাসী, তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। দোয়া করছি, আমার পরে আল্লাহ যেন তোমাদেরকে উত্তম শাসনব্যবস্থা দান করেন।[২৪৬]

হজরত আলির পরবর্তী খলিফা হওয়ার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত ও অন্তিম বার্তা

জীবনের এই শেষদিনগুলোতে হজরত উসমান রা. বলতেন, হজরত আলির খেলাফতের অধিকারী হওয়া, আমার নিকট অন্য কেউ খলিফা হওয়ার তুলনায় অধিক পছন্দনীয়।[২৪৭]

একদিন হজরত উসমান রা. হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের কাছে বার্তা পাঠালেন, 'আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আমানতদার ও উত্তম ওই ব্যক্তি, যে নিজের হাতকে (সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে) বিরত রাখে। কিন্তু আমার ঘরে কিছু মানুষ জড়ো হয়ে জীবন উৎসর্গ করতে চাচ্ছে। কিন্তু তাদের রক্তপাত ঘটুক, এটা আমি চাই না। আপনারা হজরত আলি রা. এর নিকট যান। তাকে বলুন, এখন থেকে মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় বিষয় আপনার হাতে। আল্লাহ তায়ালা আপনার অন্তরে যা ঢেলে দেবেন, আপনি তা-ই করুন।

তারপর হজরত যুবাইর এবং হজরত তালহা রা. এর কাছে গিয়ে একই কথা বলুন।'

হজরত উসামা বিন যায়েদ এবং অন্যান্য সাহাবি হজরত উসমান রা. এর এর মত পছন্দ করলেন। তারা হজরত আলির সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলেন। কিন্তু তার গৃহের সম্মুখে কীসের যেন ভিড় লেগে ছিল। হজরত

---

[২৪৫] তারিখে দিমাশক : ৩৯/৩৫১,৩৫২, হজরত উসমান বিন আফ্ফান রা. এর জীবনীর অংশ।

[২৪৬] তারিখুত তাবারি, ৪/৩৮৫

[২৪৭] ولان يليها ابن ابى طالب احب الى من ان يلى غيره (تاريخ المدينة لابن شبة : ١٢٠٦/٤)

আলি রা. ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে ছিলেন। তাই তার সঙ্গে সাক্ষৎ হলো না।

তখন সাহাবিগণ হজরত যুবাইর রা. এর নিকট গমন করলেন। হজরত যুবাইর রা. বার্তা শুনে বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন ইনসাফের কথা বলেছেন'।

তারপর তারা হজরত তালহা রা. এর কাছে গেলেন। হজরত তালহা হজরত উসমান রা. এর এ বার্তা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।[২৪৮]

জীবনের শেষদিন : শত্রুদের সামান্য যুদ্ধ, নিরাপত্তাব্যবস্থার অবসান

দিনটি ছিল যিলহজের ১৮ তারিখ। হজরত উসমান রা. সেদিন রোজা রেখেছিলন। সেদিন তিনি ২০ জন গোলাম আজাদ করেছিলেন। অভ্যাসের বিপরীত পাজামা চেয়ে এনে পরিধান করেছিলেন, যাতে দুশমনের হামলার সময় কোনোভাবে সতর খুলে না যায়। তারপর তিনি কুরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন।[২৪৯]

গতরাতে হজরত উসমান রা. স্বপ্নে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। নবীজি বলেছিলেন, 'উসমান, ইফতার আমাদের সাথে করবে'।[২৫০]

---

[২৪৮] তারিখুল মাদিনা, লি ইবনি শাব্বাহ : ৪/১২০৪, ১২০৫
বিভিন্ন উপসর্গ থেকে ধারণা করা হয় যে, এটি হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের এক-আধ দিন পূর্বের, তথা ১৭ জিলহজের ঘটনা। সুধী পাঠকের সমীপে অনুরোধ থাকবে, 'তারিখুল মাদিনার এ দুই বর্ণনাকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন। কেননা এর আলোকে বিশিষ্ট সাহাবিগণের পারস্পরিক নির্ভরতা ও সুসম্পর্কের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। সুতরাং 'নাসেবি'দের এ অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় যে, হজরত আলি রা. হজরত উসমানের হত্যায় সহযোগিতা করেছিলেন। অথবা কমপক্ষে অমানবিক আচরণ তো অবশ্যই করেছিলেন। কেননা এ অভিযোগ যদি সত্য হতো, তাহলে জীবনের শেষ পর্যন্ত হজরত উসমান রা. হজরত আলির প্রতি এতটা নির্ভর কেন করতেন যে, খেলাফতের জন্য মনোনয়নের দৃষ্টি বারবার হজরত আলির প্রতিই নিবদ্ধ হতো।
একইভাবে উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা 'রাফেজি'দের এ দাবিও ভুল প্রমাণিত হয় যে, বিশিষ্ট সাহাবিগণ পরস্পর শত্রু ছিলেন। তাই তাদের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তখনকার সমস্ত ফেতনা প্রকাশ পেয়েছিল। (নাউযুবিল্লাহ)

[২৪৯] 'ফাজাইলুস সাহাবা'তে ইমাম আহমাদ রহ. এটি বর্ণনা করেছেন। হাদিস : ৮০৯,

[২৫০] মাজমাউয যাওয়ায়েদ লিল হাইসামি, হাদিস : ১২০০৭, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৭৪, এ বর্ণনাটি 'আল ইলমিয়্যা'র মুদ্রণে বাদ পড়েছে।

এদিন হজরত উসমান রা. এর ঘরের সম্মুখে অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি সমবেত হয়েছিলেন। আল্লাহর নবীর প্রিয় জামাতার সুরক্ষার জন্য তারা জীবন বাজি রেখেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবু হুরাইরা, হজরত হাসান, হজরত হুসাইন, হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হজরত সাঈদ ইবনুল আস, হজরত মুহাম্মদ বনি তালহা ও মারওয়ান বনি হাকামের ন্যায় সাহসী ব্যক্তিবর্গ। এ ছাড়া হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. ডাবল বর্ম পরে অবস্থান করছিলেন।

বিদ্রোহীরা হজরত উসমান রা. কে শহিদ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল। তারা ঘরের দরজায় হঠাৎ আক্রমণ চালাল। তখন উপরোক্ত সাহাবিগণ পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে তাদের প্রতিহত করেন। দেখতে দেখতে হাতে হাতে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।[২৫১]

সেদিন হজরত তালহাও আমিরুল মুমিনিকে রক্ষা করার জন্য লৌহবর্ম পরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তির নিক্ষেপ করতে শুরু করেছিলেন।[২৫২]

কিন্তু ইতিমধ্যে হজরত উসমান রা. কসম দিয়ে তার পক্ষে লড়াইকারীদের বললেন, আপনারা সবাই ভেতরে চলে আসুন।

এ আদেশ শুনে সবাই হজরত উসমান রা. এর গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো।[২৫৩]

হজরত উসমান রা. তখন তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত সকলকে চূড়ান্তভাবে বলে দিলেন যে, তারা যেন এ প্রহরা উঠিয়ে নেয় এবং নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়। হজরত উসমান রা. তাদের সম্মুখে স্পষ্ট করতে চাইলেন যে, খেলাফতের দায়িত্ব তিনি আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসুলের পক্ষ থেকে দেওয়া আমানত মনে করে পরিচালনা করেছিলেন। এটা কোনো রাজত্ব বা বাদশাহি নয়, যাকে অর্থসম্পদ ও আরাম-আয়েশের উপকরণ সংরক্ষণের জন্য হাতিয়ে নেওয়া হয়, যেখানে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য

---

[২৫১] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৩, ১৭৪

[২৫২] আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা বলেন,

رأيت طلحة يوم الدار يرامیهم وعليه قباء فكشفت الريح عنه فرأيت بياض الدرع من تحت القباء

(تاريخ المدينة لابن شبة : ١١٦٩/٤)

[২৫৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৮৮

সাধারণ মানুষের জীবন ও রক্ত পানির মতো প্রবাহিত করা হয়। এ বিষয়টি বুঝিয়ে হজরত উসমান তার সাথিদের বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আমার আদেশ পালনকে জরুরি মনে করো, তারা যেন নিজেদের হাতকে এ লড়াই থেকে বিরত রাখে এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করে।'[২৫৪]

সবশেষে হজরত উসমানের গৃহ ত্যাগ করেন হজরত হাসান ও হজরত হুসাইন

হজরত উসমান রা. এর আদেশ পালনার্থে সবাই যার যার মতো চলে গেলেন; কিন্তু হজরত হাসান রা. উঠলেন না। হজরত উসমান কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত করতে লাগলেন। একটু পর হজরত হাসান রা. কে বললেন, 'আমি কসম দিয়ে তোমাকে বলছি, চলে যাও।'

তারপর দুজনকে ডেকে বাইতুল-মালের সংরক্ষণের দায়িত্ব তাদের হাতে বুঝিয়ে দেন।[২৫৫] জীবনের অন্তিম সময়েও তার ভাবনা ছিল উম্মাহর হক সংরক্ষণের।

এভাবে এক এক করে সবাইকে তার প্রহরা থেকে সরিয়ে দিলেন। হজরত হাসান ও হজরত হুসাইন রা. সবার শেষে তার গৃহ ত্যাগ করেন।[২৫৬]

উল্লেখ্য যে, সাহাবি ও তাবেয়িগণ শেষমুহূর্তে হজরত উসমান রা. এর ঘরের সংরক্ষণ কেবল এজন্য পরিহার করেছিলেন যে, তারা প্রত্যেকে হজরত উসমান রা. এর আদেশের অনুগত ছিলেন। নতুবা তাকে রক্ষা করার জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করে মৃত্যুর জন্যও তারা প্রস্তুত ছিলেন।[২৫৭]

তারপর ঘরের পুরুষদের অংশে হজরত উসমান একা কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকেন। নারীদের অংশে তার স্ত্রী-সন্তান ছাড়া কেউ

---

[২৫৪] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৩

[২৫৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯২, ৩৯৩, সাইফ বিন উমরের বর্ণনা অনুযায়ী।

[২৫৬] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৪

[২৫৭] বিষয়টি বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়। দেখুন : তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৭০, তারিখে দিমাশক : ৩৯/৩৯৯, ৪০০

ছিল না।[২৫৮] এ সময় খলিফাতুল মুসলিমিনের গৃহের ফটক সম্পূর্ণ খোলা ছিল। যেকেউ ইচ্ছা করলে প্রবেশ করতে পারত।[২৫৯]

মুহাম্মদ বিন আবু বকর ও কিছু নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীর অনুতাপ

বিদ্রোহীরা যখন দেখল আকাশ পরিষ্কার, তখন এক খর্বকায় ব্যক্তিকে হজরত উসমান রা. এর ঘরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠাল। সে শেয়ালের মতো পা টিপে টিপে অগ্রসর হলো। গৃহের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে দেখল কোনো প্রহরা নেই।[২৬০]

এবার বিদ্রোহীরা নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হয়ে এক ব্যক্তিকে পাঠাল হজরত উসমান রা. কে শহিদ করার জন্য। সে ছিল ওই অজ্ঞদের একজন, যাদের ভুল বুঝানো হয়েছিল। কিন্তু হজরত উসমান রা. এর কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত তোলার সাহস পেল না সে। শুধু এতটুক বলল, 'আপনি খেলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিন, আমরা আপনাকে কিছুই বলব না।'

হজরত উসমান রা. বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত পোশাক কীভাবে খুলে ফেলব। বরং আমি এভাবেই থাকব, যতক্ষণ না আল্লাহ সৌভাগ্যশালীদের সম্মানিত এবং হতভাগাদের অপমানিত করে দেখাবেন।

এ কথা শুনে লোকটি কেঁপে উঠল। দ্রুত বাইরে এসে বলতে লাগল, 'তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য হালাল নয়'।[২৬১]

একটু পর আরেজন এলো। হজরত উসমান রা. তাকে বললেন, আমার এবং তোমার মধ্যখানে আল্লাহর কালাম বিদ্যমান।

---

[২৫৮] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াতে আছে-

فتح عثمان الباب ووضع المصحف بين يديه. (تاريخ خليفة بن خياط، ص ١٧٤، تاريخ الطبرى : ٣٨٤/٤. باسناد صحيح او حسن)

[২৫৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াতে আছে-

ففتحوا الباب وخرج وخلوا الدار فقتلوا عثمان رضـ (تاريخ خليفة بن خياط، ص ١٧٣)

[২৬০] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াতে আছে-

فجاء رويجل كانه ذئب فاطلع من باب. (تاريخ خليفة بن خياط، ص ١٧٤، طبقات ابن سعد، ٧٣/٣ ط صادر، تاريخ الطبرى : ٣٧٢/٤)

[২৬১] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯১

এ ব্যক্তির অন্তরেও কিছুটা ঈমান অবশিষ্ট ছিল। তাই সেও বিচলিত হয়ে পড়ল এবং বাইরে বেরিয়ে এলো।[২৬২]

এভাবে বিদ্রোহীরা একের পর এক অনুচরকে পাঠাল। কিন্তু প্রত্যেকেই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে গেল। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর পুত্র মুহাম্মদ বিন আবু বকরও ভুলের শিকার হয়ে বিদ্রোহীদের সাথে ছিল। এবার সে হজরত উসমানের ঘরে প্রবেশ করল। হজরত উসমান তাকে দেখে বললেন, তোমার এই রাগ ও ক্ষোভ আল্লাহর দানের বিপরীত তো নয় (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে খেলাফতের দায়িত্ব দান করার কারণে তুমি ক্ষুব্ধ নও তো)? বলো, আমি তোমাদের সাথে কী অপরাধ করেছি? যার যার অধিকার তার হাতে তা পৌঁছে দেওয়াটাই কি আমার অপরাধ?[২৬৩]

তারপর তাকে বললেন, 'তুমি আমার হত্যাকারী হতে পার না'।[২৬৪]

এক বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদ বিন আবু বকর হজরত উসমান রা. এর দাড়ি টেনে ধরেছিল। হজরত উসমান রা. তখন বলেছিলেন, 'তুমি আমার সাথে যে ব্যবহার করছ, তা যদি তোমার পিতা দেখতেন, তবে কখনোই তিনি পছন্দ করতেন না।[২৬৫]

একথা শুনে মুহাম্মদ বিন আবু বকরও প্রকম্পিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা ও অনুতাপে সে কাপড়ে মুখ লুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। এসে বিদ্রোহীদের ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিল। কিন্তু হত্যার জন্য মরিয়া লোকেরা তার কথার প্রতি কর্ণপাত করল না।[২৬৬]

---

[২৬২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৪

[২৬৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯১

[২৬৪] বর্ণিত আছে-

فقال له عثمان : "يا ابن اخى لست بصاحبى" (الاستيعاب : ٣/١٠٤٦)

[২৬৫] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৪

[২৬৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪০২, তারিখুল ইসলাম লিয জাহাবি , ৩/৩৫৪, ৩৫৫, হজরত উসামার দাসী রীতাহ থেকে বর্ণিত।
নোট : এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্তমানকালের সাধারণ উর্দু ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে, হজরত উসমানের হত্যাকারী মুহাম্মদ বিন আবু বকরের নেতৃত্বে হয়েছিল এবং তারা হজরত আমর বিন হাযাম রা. এর ঘরের সাথে লাগোয়া দেয়াল বা বড় জানালা ভেঙ্গে হজরত উসমানের ঘরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু

মোটকথা, হজরত উসমান রা. এর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মকৌশলের ফলে এমন অনেক মানুষ হাত উঠানোর ইচ্ছা পরিহার করে তাওবা করেছিল, যারা অজ্ঞতাবশত এ ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে কাজ করছিল।

কিন্তু এ পরিস্থিতি দেখে ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ও চূড়ান্ত হতভাগার দল তাদের লক্ষ্য নিজহাতে পূর্ণতায় পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

সাবায়িদের প্রাণঘাতী আক্রমণ ও হজরত উসমানের নির্মম শাহাদাত

তারপর বিদ্রোহী নেতারা হজরত উসমানের গৃহে প্রবেশ করে। আমিরুল মুমিনিন ঘরের পুরুষদের অংশে আগের মতোই আল্লাহর সাথে একান্ত ঘনিষ্ঠচিত্তে এবং নিজের জীবনের শঙ্কা থেকে সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে কুরআনুল কারিম সম্মুখে রেখে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় বিদ্রোহীদের থেকে রোমান নামক এক লোক লোহার ভারী লাঠি হজরত উসমানের গায়ে মারল।[২৬৭]

আবদুর রহমান বিন গাফেকিও লোহার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করল।[২৬৮]

তারপর 'কৃষ্ণযম' নামে এক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে পূর্ণশক্তি দিয়ে হজরত উসমান রা. এর গলা চেপে ধরে। হজরত উসমান ছটফট করতে থাকেন। তারপর সে খাপ থেকে তরবারি বের করে হজরত উসমানের উপর আঘাত হানে। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্তের ধারা ছিটকে গিয়ে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর পড়ে রক্তরঞ্জিত হয়ে যায়- فسيكفيكهم الله অর্থাৎ আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট।[২৬৯]

এ বর্ণনা হয়তো ওয়াকিদির, যা তারিখে তাবারিতে উল্লেখ আছে। সুতরাং এর দুর্বলতা স্পষ্ট। তা ছাড়া এটি হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব রা. এর দিকে সম্বন্ধকৃত একটি দীর্ঘ হাদিস থেকে সংগৃহীত। আর মুহাদ্দিসগণ সেটিকে মনগড়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। (আল কামিল ফি যুআফাইর রিজাল : ৭/৪৮৮)। কিন্তু এ বর্ণনাটিকেই প্রথমে আল্লামা ইবনে আসাকির রহ. তারিখে দিমাশকে, এবং সেখান থেকে আল্লামা সুয়ুতি রহ. 'তারিখুল খুলাফা'তে উদ্ধৃত করেছেন। আর 'তারিখুল খুলাফা' সংক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্ত হওয়ার সুবাদে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। তার অনুবাদও হয়ে গেছে। আর পরবর্তীযুগের ইতিহাসবিদরা এটিকে একটি চূড়ান্ত বাস্তবতা মনে করে আরো প্রসিদ্ধি দান করেছে।

[২৬৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৩১৮, ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী।

[২৬৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯১

[২৬৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৪, ১৭৫

তারপর এক হতভাগা বর্ষার আঘাত হানে। তখন হজরত উসমান রা. এর মুখ থেকে বের হয়ে আসে- بسم الله توكلت على الله অর্থাৎ আল্লাহর নামে চললাম, আল্লাহর উপরই ভরসা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে রক্তের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে।[২৭০]

এদিকে এ হাঙ্গামার শোরগোল ঘরের নারীদের অংশেও পৌঁছে যায়। হজরত উসমানের স্ত্রী হজরত নায়েলা ও তার কন্যারা তাকে বাঁচাতে চিৎকার করে ছুটে আসেন।[২৭১]

হজরত নায়েলা বিশ্বাস ও আন্তরিকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং হজরত উসমানকে বাঁচাতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।[২৭২] এমন সময় সুদান বিন হুমরান নামক জনৈক অভিশপ্ত তরবারি উঁচিয়ে অগ্রসর হয়। হজরত নায়েলা তরবারির আঘাত ধরে ফেলার চেষ্টা করেন। এতে তার কয়েকটি আঙুল কেটে যায়।[২৭৩] ইত্যবসরে মিসরের এক পাষণ্ড তরবারির ধারালো তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ হজরত উসমান রা. এর বুকের মাঝখানে রেখে তার উপর দেহের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে। সঙ্গে সঙ্গে হজরত উসমানের দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়। আর আল্লাহর নবীর প্রিয় জামাতা, ইসলামের তৃতীয় খলিফা, যুননুরাইন, হজরত উসমান বিন আফফান রা. এর পবিত্র আত্মা মর্তের দেহ ছেড়ে চলে যায়।[২৭৪]

انا لله وانا اليه راجعون

৩৫ হিজরির যিলহজ মাসের ১৮ তারিখ সূর্যাস্তের একটু আগে হজরত উসমান শহিদ হন। সেদিনই পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজরত উসমানের ইফতার করার কথা ছিল।

কয়েক মুহূর্তে এসব কিছু ঘটে যায়। ইতিমধ্যে হজরত উসমান রা. এর কতিপয় গোলাম, যাদেরকে তিনি সেদিনই এ শর্তে মুক্ত করেছিলেন যে, তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না, তারা ঘটনাস্থলে ছুটে

---

[২৭০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৩১০, ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী।

[২৭১] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯৩

[২৭২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৩১৮

[২৭৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৩১৮

[২৭৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯৩

আসে। তারপর তাদেরই একজন পাপিষ্ঠ সুদান বিন হুমরানের উপর তরবারির আঘাত হানে এবং এক আঘাতে দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

অপর এক গোলাম কুতাইরা নামক জনৈক বিদ্রোহীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। আর একজন 'কুলসুম বিন তুজাইব' নামক অত্যাচারীকে, যে হজরত উসমান রা. এর স্ত্রীর গায়ে হাত দিচ্ছিল এবং অশ্লীল কথা বলছিল, তাকে হত্যা করে ফেলে। তারপর তাদের থেকেই দুজন গোলাম বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সেখানেই শহিদ হয়ে যায়।[২৭৫]

ইত্যবসরে হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হজরত হাসান এবং মারওয়ান বিন হাকাম হাঙ্গামার শব্দ শুনে ফিরে আসেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করে ভীষণ আহত হয়ে পড়েন। পরে মদিনার লোকেরা রক্তরঞ্জিত অবস্থায় এ তিনজনকে উদ্ধার করেন।[২৭৬]

তারপর বিদ্রোহীরা হজরত উসমানের ঘরের সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়। এমনকি কোনো পাত্রও রেখে যায়নি। এরপর বাইতুল-মালের দিকে ছুটে যায় এবং তা লুটপাট করে। তাদের এ হীন কর্মই প্রমাণ ছিল যে, মূলত তারা ছিল দুনিয়াপূজারি এবং দাঙ্গাবাজ।[২৭৭]

জানাজা ও দাফন

হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের সংবাদ দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে রাতেই হজরত আলি, হজরত তালহা, হজরত হাসান, হজরত যায়েদ বিন সাবেত, হজরত কা'ব বিন মালেকসহ অন্যান্য সাহাবি দলে দলে হজরত উসমান রা. এর ঘরে ছুটে আসেন। জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য মদিনার নারী ও শিশুরা পর্যন্ত ময়দানে সমবেত হয়।[২৭৮]

---

[২৭৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯১

[২৭৬] আল ইসতিয়াব : ৩/১০৪৬, সনদ হাসান। ডক্টর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ গাবায়ি আস সুবহি কৃত ফিতনাতু মাকতালি উসমান রা. : ১/২০৫

[২৭৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯১

[২৭৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৪১৪

জানাজায় বিলম্ব করার কারণ ছিল, শেষবারের মতো হজরত উসমানকে দেখতে মানুষের ভিড় হয়েছিল। হজরত উসমানের বাড়িতেই জানাজার খাটিয়া রাখা হলো। মানুষ দলে দলে গিয়ে জিয়ারত করে আসছিল।

এক নরাধম বিদ্রোহী মনে মনে সংকল্প করে রেখেছিল, হজরত উসমানের মুখে চড় মারবে। খাটিয়ার পাশে এসে এ হতভাগা হজরত উসমানের চেহারায় আঘাত করতে চাইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার হাত অবশ হয়ে গেল।[২৭৯]

শহিদ হজরত উসমান রা. কে গোসল দেওয়া হলো না। পরিধেয় বস্ত্রই তার কাফন হিসেবে রেখে দেওয়া হলো। জানাজার খাটিয়া উঠিয়ে আনা হলো। মারওয়য়ান বিন হাকাম জানাজার নামাজ পড়ালেন।

তারপর হজরত উসমানের খাটিয়াকে জান্নাতুল বাকিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সচ্চরিত্র ও শালীনতার এই সূর্য জান্নাতুল বাকির পবিত্র মাটিতে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়।[২৮০]

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, শাহাদাতের সময় হজরত উসমান রা. এর সাহায্যের জন্য বিরাট সংখ্যক সাহাবি ও তাবেয়ি মদিনায় উপস্থিত ছিলেন। তারা তাকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু শুধু হযরত উসমান রা. এর কসম দেওয়ার কারণে তারা নিজেদের হাত গুটিয়ে রেখেছিলেন। আর হজরত উসমান রা. কসম দিয়েছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়তের কারণে।

কিন্তু বিদ্রোহীরা মদিনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি যে, সাহাবায়ে কেরাম এবং হজরত উসমানের সাহায্যকারীরা একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়েছিলেন।

সুতরাং দুর্বল বর্ণনায় উল্লিখিত এসব কথা বেশ সন্দেহপূর্ণ যে, শাহাদাতের পর হজরত উসমানের লাশ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাফন-দাফনবিহীন পড়ে ছিল, তারপর মুষ্টিমেয় মানুষ জানাজার নামাজ আদায় করে, অতি সংগোপনে কোনো অজ্ঞাত স্থানে হজরত উসমান রা. কে দাফন করে দেয়। অবশ্য এটা স্পষ্ট যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং সর্বত্র ত্রাস

---

[২৭৯] তারিখে দিমাশক : ৩৯/৪৫৮, হজরত উসমান রা. এর জীবনীর অংশ।

[২৮০] তারিখুত তাবারি : ৪/৪১৪

বিরাজ করতে থাকার দরুন জানাজার নামাজে অতটা লোক সমাগম হতে পারেনি, যতটা শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় হতে পারত। উক্ত দুর্বল বর্ণনাগুলো যদি মেনেও নেওয়া হয়, তবু তার অর্থ কেবল এতটুকুই।

দাফনের সময় কারামাত

হজরত উসমান রা. কে জান্নাতুল বাকির গোরস্থানে দাফন করা হলো। দাফনের কাজে অংশগ্রহণকারী একজন ছিলেন আবু খুনাইশ। তিনি বলেন, আমরা যখন গোরস্থানের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের পেছনে অনেক বড় একটি জনসমাবেশ আসছে অনুভব করলাম। আমরা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তখন পেছন থেকে আওয়াজ এলো যে, 'ভয় পাবেন না। আমরা আপনাদের সাথে দাফনের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছি।'

আসলে তারা ছিলেন একদল ফেরেশতা, যারা হজরত উসমান রা. এর জানাজা ও দাফনে শরিক হতে এসেছিলেন।[২৮১]

এই নির্মম ঘটনায় বিশিষ্ট সাহাবিদের অভিব্যক্তি

বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী হজরত উসমান রা. বিরাশি বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেছিলেন। তার মৃত্যুর সংবাদে মুসলিমবিশ্বের প্রতিটি হৃদয় ব্যথা-বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবির প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হলো।

১. হজরত আলি রা. বলেছিলেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার সম্মুখে উসমানের রক্ত থেকে নিজের দায়মুক্তি প্রকাশ করছি। আমি তাকে হত্যাও করিনি, কাউকে হত্যার জন্য উদ্বুদ্ধও করিনি।[২৮২]

   তিনি আরো বলেছিলেন, যেদিন উসমান শহিদ হয়েছেন, সেদিন আমার বিবেক হারিয়ে গিয়েছিল। আমি নিজেকে অচেনা অনুভব করছিলাম।[২৮৩]

---

[২৮১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৩১৯

[২৮২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৮০ তারিখে দিমাশক : ৩৯/৩৭২, হজরত উসমান রা. এর জীবনীর অংশ।

[২৮৩] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৪৫২৭, হজরত উসমান রা. এর জীবনীর অংশ।

২. হজরত যুবাইর রা. এ সংবাদ শুনে বলেছিলেন, انا لله وانا اليه راجعون তারপর বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা হজরত উসমানের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং তার রক্তর বদলা গ্রহণ করুন।

৩. ঠিক একই রকম কথা বলেছিলেন হজরত তালহা রা.।

৪. হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. বলেছিলেন, হে আমার প্রভু, এ পাপিষ্ঠদের লাঞ্ছিত করুন। এদেরকে আপনার গ্রাসে নিপতিত করুন।[২৮৪]

৫. হজরত সামুরা বিন জুনদুব রা. এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, এতদিন ইসলাম একটি কঠিন দুর্গে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু এ হতভাগারা হজরত উসমান রা. কে শহিদ করে সে দুর্গে চিঁড় ধরিয়ে দিয়েছে। এ ফাটল কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ করা যাবে না।

৬. বিশিষ্ট বদরি সাহাবি হজরত আবু হুমায়েদ সায়েদি রা. বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, আজ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনোদিন আমি হাসব না।[২৮৫]

৭. হজরত সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল রা. বলতেন, যদি উহুদপর্বত কোনো হৃদয়বিদারক ঘটনার কারণে টুকরো টুকরো হতে পারত, তা হলে হজরত উসমানের শাহাদাতের কারণে হওয়া উচিত ছিল।[২৮৬]

৮. হজরত আবু হুরাইরা রা. এর সম্মুখে যখনই হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের আলোচনা আসত, অবচেতন মনে তিনি বলে উঠতেন, 'হায়, হায়!' একথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।[২৮৭]

৯. উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর নিকট এ নির্মম ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি হজরত উসমান

---

[২৮৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯২

[২৮৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৮১,

[২৮৬] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৮৬২, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি সাঈদ বিন যায়েদ রা.।

[২৮৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৮১,

রা. সম্পর্কে বাজে কথা বলবে, তার উপরও আল্লাহর লানত পতিত হবে।[২৮৮]

১০. হজরত আমর ইবনুল আস রা. মদিনায় বিদ্রোহীদের আবির্ভাবের কারণে মনঃক্ষুণ্ন ও নিরুপায় হয়ে ফিলিস্তিন চলে গিয়েছিলেন। সেখানে যখন তিনি হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের সংবাদ পেলেন তখন অবচেতনভাবে তার মুখ থেকে বের হয়ে এলো, واعثماناه!

তারপর অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

يا لهف نفسى على مالك* وهل يصرف اللهف حفظ القدر

انزع من الحر اودى بهم *فاعذرهم ام بقومى سكر

হায় আফসোস! মালিকের উপর আমার জীবন উৎসর্গ হোক,
কিন্তু এ আহাজারি কি তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারবে?
এভাবে কি আমি তাদেরকে (যুদ্ধের) উত্তাপ থেকে রক্ষা করতে পারব?
তবে কি আমি তাদেরকে অপারগ ভাবব, না আমার জাতি নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল?

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা হজরত উসমানের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন।

পাশাপাশি তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন যে, এখন যুদ্ধ তো হবেই। কারণ যে ব্যক্তি কোনো বিষফোঁড়া খুঁচিয়ে তুলবে, তা অবশ্যই তাকে বিদীর্ণ করে ছাড়বে।[২৮৯]

তার এ ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা এই ছিল যে, যেসব দাঙ্গাবাজ এ ফেতনার সূচনা করেছে, তারা আগামীতে মুসলমানদের মধ্যেও রীতিমতো যুদ্ধ বাধিয়েই ছাড়বে।

১১. বস্তুত গোটা মুসলিমবিশ্বে হজরত উসমানের শাহাদাতের কারণে শোকের ছায়া পড়ে গেল। মানুষ জার জার হয়ে কাঁদত এবং হজরত

---

[২৮৮] আত তারিখুল কাবির লিল ইমামিল বুখারি : ১/২৬, মাহমুদ খলিলের হাশিয়াকৃত।
[২৮৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৫৯

উসমান রা. এর উত্তম গুণাবলির কথা স্মরণ করত। বসরায় বসবাস করতেন আল্লাহর নবীর এক সাহাবি, যার নাম ছিল কালিব জুরমি রা.। তিনি বলেন, হজরত উসমান রা. এর হত্যার সংবাদ শুনে আমি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যেভাবে কাঁদতে দেখেছি, এর কোনো দৃষ্টান্ত কখনো দেখিনি। মানুষ তখন এত বেশি কাঁদত যে, চোখের জলে দাড়িও ভিজে যেত।[২৯০]

রোম সম্রাট কায়সারের হঠাৎ আক্রমণ এবং আল্লাহর গায়েবি সাহায্য

এই সময় যখন মুসলমানরা খেলাফতের মূল বিষয় নিয়ে এক জঘন্য বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল, তখন তৎকালীন রোম সম্রাট কনস্টানটাইন স্বয়ং ইসলমিবিশ্বের সীমান্তে এসে চোখরাঙাতে শুরু করল। এক হাজার সামুদ্রিক জাহাজের বিশাল নৌবহর নিয়ে সে ফিলিস্তিনের সীমান্তে এসে অবস্থান নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহর কী অসীম দয়া। সমুদ্রের তুফান ও ঝড়োহাওয়া এসে তার গোটা নৌবহর তছনছ করে দিল। কনস্টানটাইন কোনোরকম জীবন বাঁচিয়ে সিসিলি গিয়ে উঠল। সেখানে তার দরবারের লোকেরাই তাকে সৈন্যবাহিনী ধ্বংসের জন্য দায়ী করে শৌচাগারের মধ্যে হত্যা করে ফেলে।

যাই হোক, রোমানদের এ বিশাল বাহিনী যদি আসমানি আপদের সম্মুখীন না হতো, তা হলে ভীষণ ভয় ছিল যে, মুসলমানদের চলমান ছত্রভঙ্গ অবস্থার দরুন কুফুরি শক্তির আক্রমণে ইসলামি দুনিয়ার উপর কেয়ামত নেমে আসত।[২৯১]

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে রোম সম্রাট কর্তৃক এত বিরাট বাহিনী নিয়ে স্বয়ং মুসলিমবিশ্বের উপর আক্রমণ করা কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না। এটি ভিন্ন কথা যে, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়টিকে তেমন একটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, এ আক্রমণ কয়েকটি প্রশ্নের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন,

১. তা হলে কি রোম সম্রাটের আগে থেকে জানা ছিল যে, মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে কী ধরনের দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে! মদিনার

---

[২৯০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৫৭, কিতাবুল জামাল।
[২৯১] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪১

অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা সর্বোচ্চ ৪০ দিন ছিল। এতটুকু সময়ের মধ্যে রোম সম্রাটের কাছে খবরও পৌঁছে গেল এবং সে বিশাল বাহিনী তৈরি করে দুই তিন মাসের পথও অতিক্রম করে ফেলল, এটা কী করে সম্ভব হলো? যদি পূর্ব থেকে তার ধারণা থাকে যে, অচিরেই মুসলমানাদের মধ্যে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, তা হলে এর দ্বারা কি এ আশংকা উঁকি দেয় না যে, মুসলিমবিশ্বের শাসনব্যবস্থার এই অস্থিরতার পেছনে স্বয়ং রোম সম্রাটেরও হাত ছিল এবং পর্দার আড়াল থেকে সে ষড়যন্ত্রকারীদের সহযোগিতা করেছিল?

২. দ্বিতীয় যে বিষয়টি এখানে ভেবে দেখার মতো তা হলো, এত বড় একটা ষড়যন্ত্র মোটা অঙ্কের আর্থিক যোগান ছাড়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হজরত উসমান রা. এর যুগে এ কথা জানা যায়নি যে, বিদ্রোহীদের আর্থিক যোগান কোথা থেকে আসত। হজরত আলি রা. এর যুগে হজরত আমর ইবনুল আস রা. মিসরে একটি গোপন কার্যক্রম পরিচালনার সময় এক খ্রিষ্টান গুপ্তচরকে আটক করেছিলেন। তার থেকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দিনার উদ্ধার করা হয়েছিল। আর এ বিপুল অর্থ তাকে সরবরাহ করেছিল তৎকালীন রোম সম্রাট।[২৯২]

এর থেকে ধারণা করা যায় যে, হাঙ্গামাকারীদের অর্থ যোগান দিত বাইরের শক্তিগুলো এবং তার পরিমাণ অবিশ্বাস্য, যাতে স্বল্প মেধার লোকদের দীন ও ঈমান কিনে নেওয়া যায়।

৩. রোম সম্রাটের উক্ত আক্রমণে আরেকটি বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, সে নিজে বাহিনীর সাথে ছিল। সাধারণত ছোটখাট অভিযানে বাদশাহ নিজে নেতৃত্ব প্রদান করে না। বরং কোনো অসাধারণ বিজয় বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের যুদ্ধের জন্যই সে বের হয়ে থাকে। সুতরাং রোম সম্রাটের স্বয়ং উক্ত অভিযানে বের হওয়ার দ্বারা পরিষ্কারভাবে একথাই বোঝা যায় যে, রোম সম্রাটের মনে তখন এক অভূতপূর্ব বিজয়ের স্বপ্ন ছিল। এতটা আশান্বিত হওয়ার কারণ এ ছাড়া কী হতে পারে যে, মুসলমানরা তখন অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার শিকার ছিল।

---

[২৯২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৬৬২

হজরত উসমান রা. এর পক্ষ থেকে এই দুর্যোগের সংবাদগুলো গোপন রাখার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও রোম সম্রাট এর পূর্ণ বিবরণ জানত। আর তার কারণ এটাই হতে পারে যে, সে নিজেই গোটা ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

উপরোক্ত আশংকাগুলোর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভেতর ও বাহির উভয় দিকের শত্রু একসাথে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা ভেতর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আর বাহির থেকে রোম সম্রাট মুসলিমবিশ্বের সীমান্তে বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলো।

কিন্তু ইসলামের রক্ষাকর্তা তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি তার অদৃশ্য শক্তি প্রকাশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তার দীনের সুরক্ষার জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। তার আদেশেই রোম সম্রাটের বিরাট বাহিনী সমুদ্রঝড়ে বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর ইসলামের শিখা অনির্বাণ চিরতরে নিভিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইবলিস ও তার দোসরদের মনের ফাঁস হয়ে রইল।

হজরত উসমান রা. কে কারা হত্যা করেছিল?

একথা তো স্পষ্ট যে, হজরত উসমান রা. কে সাধারণ বিদ্রোহীরা শহিদ করেনি। বরং যারা তাকে শহিদ করেছিল, তাদের অন্তরাত্মা পাথরের চেয়েও অধিক শক্ত ছিল।

একথাও প্রমাণিত যে, এই হত্যাকাণ্ডে আক্রমণকারী একজন ছিল না, ছিল কয়েকজন। তারা বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রের আঘাতে হজরত উসমানকে হত্যা করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, হজরত উসমানের উপর আক্রমণকারী অধিকাংশ লোকের নাম-পরিচয় এবং গোত্র ও বসবাস কিছুই বিস্তারিত জানা যায় না। কেননা ঐতিহাসিক ও বর্ণনাকারীগণ কেন যেন এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চুপ।

আসলে এ বিষয়ক বর্ণনাগুলো এতই বিরোধপূর্ণ ও এলোমেলো যে, বলার মতো নয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, হত্যার পরপরই সাবায়িরা পরিকল্পিতভাবে বানোয়াট কাহিনি ও অপরিচিত নামের মিথ্যা বর্ণনা প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে দিয়েছিল, যাতে আসল রহস্য সম্পূর্ণ আড়ালে চলে যায়।

এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছে ওয়াকিদির বর্ণনা। অথচ সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই তা অত্যন্ত দুর্বল। সেখানে তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

১. কেনানা বিন বিশর তুজাইবি
২. সুদান বিন হুমরান
৩. আমর ইবনুল হামিক

ওয়াকিদির বর্ণনা অনুযায়ী প্রথমে কেনানা বিন বিশর লোহার ভারী একটি বস্তু নিক্ষেপ করে হজরত উসমানের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। তারপরই সুদান বিন হুমরান প্রাণঘাতী আক্রমণ করেছিল। আর সবশেষে আমর ইবনুল হামিক হজরত উসমান রা. এর বক্ষদেশে উঠে তরবারির অগ্রভাগ বিঁধিয়ে দিয়েছিল।

অথচ এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমর ইবনুল হামিক রা. ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি। ওয়াকিদির এই দুর্বল বর্ণনা এবং চরম মিথ্যুক আবু মিখনাফের এক বর্ণনা ছাড়া কোথাও আমর ইবনুল হামিক রা. সম্পর্কে হজরত উসমান-হত্যায় অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ নেই।[২৯৩]

আর এমন দুর্বল ও ভুল বর্ণনার আলোকে হজরত উসমানের হত্যায় কোনো সাহাবির অংশগ্রহণ কখনোই প্রমাণিত হতে পারে না। সুতরাং হজরত আমর ইবনুল হামিক রা. কে হজরত উসমানের হত্যাকারীদের মধ্যে গণ্য করা একটি নির্জলা অপবাদ।

প্রাণঘাতী আক্রমণের নেতৃত্ব কে দিয়েছিল?

হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের মধ্যে অত্যন্ত রহস্যজনক এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, যার নাম ছিল 'আল মাওতুল আসওয়াদ' বা কৃষ্ণজম। সম্ভবত এটা তার ছদ্মনাম, যা তার নির্দয়তা ও পাষণ্ডতার কারণে তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আসলে এই লোকটা কে?

এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর তো আজ এত-শত বছর পর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা কিছুটা ধারণা পেতে পারি। আর তা এভাবে যে, এ লোকটি সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়। যেমন :

---

[২৯৩] তারিখুত তাবারি : ৫/২৬৫

১. সে মিসর থেকে এসেছিল। তার গায়ের বর্ণ ছিল অত্যন্ত কালো। সে-ই প্রাণঘাতী আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং হজরত উসমানের শাহাদাতের পর উভয় হাত উঁচু করে সফলতার ঘোষণা দিয়েছিল।[২৯৪]

২. তার দুটি উপাধি ছিল। 'আল মাওতুল আসওয়াদ' তথা কৃষ্ণযম[২৯৫] এবং 'জাবালা' অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ।[২৯৬]

৩. তার বংশীয় সম্পর্ক ছিল বনি সাদুসের সাথে।[২৯৭]

এখন যদি চিন্তা করি, তা হলে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে এ রহস্য সামনে আসে যে, এই সবক'টি তথ্য ষড়যন্ত্রের মূল হোতা, মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ বিন সাবার সাথে মিলে যায়। কেননা তার গায়ের রংও ছিল কালো।[২৯৮] ওই সময় সে মিসরে থাকত। আর তার উপনাম ছিল 'ইবনুস সাওদা' অর্থাৎ কালো নারীর পুত্র।[২৯৯] আর এ শব্দটি হজরত উসমানের হত্যাকারীর উপাধি 'আলমাওতুল আসওয়াদ' তথা কৃষ্ণজমের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হত্যাকারীর আরেক উপাধি ছিল জাবালা। এ নামটি ইয়েমেনের ইহুদিরা রাখত।[৩০০] আর আবদুল্লাহ বিন সাবাও ছিল ইয়েমেনের ইহুদি।

এর সাথে আরেকটি তথ্যও যোগ করতে পারেন যে, ইবনে সাবার গোত্র সাদুস ছিল ইয়েমেনের প্রাচীন গোত্র কাহলান বিন সাবার বংশধর।[৩০১]

---

[২৯৪] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৮৪, হজরত সফিয়া রা. এর গোলাম কিনানা থেকে বর্ণিত। তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭২ হজরত হাসান বসরি রহ. থেকে বর্ণিত।

[২৯৫] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৪, আবু সাঈদের বর্ণনা অনুযায়ী।

[২৯৬] আত তারিখুল কাবির লিল ইমামিল বুখারি : ৭/২৩৭, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৮৩, ৮৪

[২৯৭] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৪, সনদ সহিহ।

[২৯৮] তারিখে দিমাশকে আছে-

عن زيد بن وهب عن على قال مالى ومال هذا الجميت الاسود؟ (تاريخ دمشق : ٢٩/٧)

[২৯৯] তারিখুত তাবারিতে আছে-

فلم يفجأهم لا كتاب من عبد الله بن سعد بن ابى سرح يخبرهم ان عمارا قد استماله قوم بمصر، وقد انقطعوا اليه، منهم عبد الله بن السوداء. (تاريخ الطبرى : ٣٤١/٤)

[৩০০] মু'জামুল বুলদানে আছে-

قال الحموى تحت ذكر مواضع اليمن جبلة وذو جبلة : جبلة رجل يهودى كان يبيع فى الفخار. (معجم البلدان : ١٠٦/٢)

আর আবদুল্লাহ বিন সাবাও ছিল ইয়েমেনের অধিবাসী। সুতরাং এর দ্বারাও ইবনে সাবার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একথা সবারই জানা যে, হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি প্রতিহিংসা প্রচারকারী এবং তার সাথে জঘন্য পর্যায়ের বিদ্বেষ পোষণকারী ছিল আবদুল্লাহ বিন সাবা। একজন ভিনদেশি এজেন্টই এতটা পাষাণ ও নির্দয় হতে পারে যে, ওই রকম নির্দয়তার সাথে বিরাশি বছর বয়সি একজন বৃদ্ধকে হত্যা করেছিল। অন্যান্য যাদেরকে হত্যার জন্য ভেতরে পাঠানো হয়েছিল, তারা প্রত্যেকে এসে অনুতপ্ত হয়ে চুপিসারে ফিরে গিয়েছিল। ইবনে সাবা পুরো হাঙ্গামার সময় দৃষ্টির আড়ালে ছিল। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, সে হাতে হাত রেখে বসে ছিল না। বরং অতি সংগোপনে সে তার মিশন সফল করার জন্য অন্যদেরকে সামনে অগ্রসর করতে থাকে। হতে পারে, প্রথমে সে অন্যদের হাতে হজরত উসমানকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল এই ফেরেশতা-স্বভাব ও নুরানী চেহারার বৃদ্ধের গায়ে কেউ হাত দেওয়ার সাহস পাচ্ছে না, তখন এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, সে নিজেই তার হতভাগা সাঙ্গ-পাঙ্গকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং নিজেই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে।

আর এটা তার জন্য কোনো কঠিন বিষয় ছিল না যে, এ অভিযানে সে তার আসল নাম গোপন করে ভিন্ন কোনো উপাধি ধারণ করেছিল। হয়তো একারণেই হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের ইতিহাসে তার আসল নাম আসেনি। কিন্তু কয়েকটি তথ্য থেকে তার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

---

[৩০১] আল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার নামক কিতাবে আছে-

اما طی فهو ادد بن زيد بن كهلان بن سبا، فمن بطون طی جديلة وتيهان وبولان وسلامان وهنی وسدوس. (المختصر فی اخبار البشر: ١٠٢/١

আবদুল্লাহ বিন সাবার অস্তিত্ব কি নিছক কল্পনা?

বর্তমানকালে প্রাচ্যবিদ, ধর্মহীন ইতিহাসবিদ এবং অধিকাংশ শিয়া ইতিহাসবিদ ইবনে সাবার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি ও দলিল এই যে, ইবনে সাবার উল্লেখ কেবল সাইফ বিন আমরের বর্ণনায় পাওয়া যায়। আর সাইফ হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল একজন বর্ণনাকারী। কিন্তু তাদের এ দাবি মিথ্যা। কেননা ইবনে সাবার অপকর্মের আলোচনা ইতিহাসের বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোতেও আছে। যেমন দেখুন,

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও সহিহ সনদে উল্লেখ করেছেন যে, হজরত আলি রা. এর সম্মুখে যখন আবদুল্লাহ বিন সাবার আলোচনা করা হলো, তখন তিনি বললেন, এই খবিস কালুর সাথে আমার কী সম্পর্ক?[৩০২]

২. ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন যে, হজরত আলি রা. ইবনে সাবাকে দেশান্তর করেছিলেন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন, যাদেরকে বলা হতো 'সাবাইয়্যাহ'।[৩০৩]

৩. হজরত আলি রা. একদিন জানতে পারলেন ইবনে সাবা তাকে হজরত আবু বকর ও উমর রা. এর উপর প্রাধান্য দেয়। তখন তিনি তাকে হত্যা করার জন্য তরবারি চেয়ে আনলেন।[৩০৪]

৪. ইবনে আসাকির ইমাম শা'বী রহ. থেকে, যিনি ২০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম মিথ্যা প্রচারকারী ছিল আবদুল্লাহ বিন সাবা। এই বর্ণনাটি 'হাসান'।[৩০৫]

৫. বর্তমান সময়ের শিয়া আলেমদের পক্ষ থেকে ইবনে সাবার অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিরর্থক। কারণ, কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্বয়ং তাদের

---

[৩০২] লিসানুল মিযান : ৩/২৯০

[৩০৩] তারিখে দিমাশক : ২৯/৩, আবদুল্লাহ বিন সাবার আলোচনা।

[৩০৪] তারিখে দিমাশক : ২৯/৯, আবদুল্লাহ বিন সাবার আলোচনা।

[৩০৫] তারিখে দিমাশক : ২৯/৭, আবদুল্লাহ বিন সাবার আলোচনা।

পূর্বপুরুষরাই তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। শিয়া ধর্মাবলম্বীদের ইমাম আল্লামা সা'দ বিন আবদুল্লাহ কুম্মী (মৃত্যু : ২২৯ হিজরি) লিখেছেন, 'আবদুল্লাহ বিন সাবা ছিল প্রথম ব্যক্তি, যে হজরত আলির ইমাম হওয়া এবং দুনিয়াতে তার পুনরাগমনের আকিদা পেশ করেছিল।[৩০৬]

৬. ইসলামি ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের মান যাচাই সম্পর্কে শিয়াদের এক প্রসিদ্ধ কিতাব 'রিজালকাশি', যা রচনা করেছে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন আমর আল-কাশি। তাতে উল্লিখিত আছে, 'আবদুল্লাহ বিন সাবা ছিল ইহুদি। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। হজরত আলির সঙ্গে মহব্বত প্রকাশ করেছে। সে যখন ইহুদি ছিল, তখন ইউশা ইবনে নুনকে হজরত মুসা আ. এর প্রতিনিধি বলত। ইসলামগ্রহণের পর এ আকিদাকেই সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর হজরত আলির জন্য পেশ করল। সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে হজরত আলি ইমাম হওয়া আবশ্যকতার বিষয়টি প্রচার করেছে। হজরত আলির দুশমনদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছে, তার বিরোধীদের মুখোশ উন্মোচন করেছে এবং তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে।'[৩০৭]

৭. হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর আলেম 'নাওবাখতি'র বক্তব্য এই যে, আবদুল্লাহ বিন সাবা ছিল ওইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা হজরত আবু বকর, উমর, উসমানসহ অন্যান্য সাহাবির কাজের সমালোচনা করেছে।'[৩০৮]

মোটকথা, সুন্নি ও শিয়া উভয় দলের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি আবদুল্লাহ বিন সাবার কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। তা সত্ত্বেও যারা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তার জন্য সুন্নি ও শিয়াদের সমস্ত ইতিহাস থেকে একেবারে হাত ধুয়ে ফেলা উচিত।

***

---

[৩০৬] আল মাকালাত ওয়াল ফিরাক, পৃষ্ঠা : ২০

[৩০৭] রিজালুল কাশি, পৃষ্ঠা : ১০৮, ১০৯

[৩০৮] ফিরাকুশ শিয়া, পৃষ্ঠা : ৪৩

উসমান রা. এর জীবনাদর্শের কয়েকটি বিশেষ দিক

সাধারণত মনে করা হয়, হজরত উসমান রা. ছিলেন বেশ সাদাসিধে এবং সহজ-সরল মানুষ। তার সতর্কতা, যেকোনো বিষয় অনুধাবন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের গুণ ও সক্ষমতা ছিল না। ভুল করলে কাউকে বকাঝকা করার সাহস ছিল না। গভর্নর ও কর্মকর্তাদের সাবধান করতে ভয় পেতেন। তাদের সম্মুখে তিনি চুপসে যেতেন। যে যা বলত, তিনি তাই মেনে নিতেন। আর এসব কারণে শাসনব্যবস্থার লাগাম ধীরে ধীরে আলগা হয়ে পড়ে। দুষ্কৃতিকারীদের জন্য পুরোদমে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাধারণত হজরত উসমান রা. সম্পর্কে এমনই সবার ধারণা।

কিন্তু আসলে এটা হজরত উসমান রা. এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা অর্জন এবং মূল বিষয়গুলো উপেক্ষা করার ফল।

ইসলামের এই খলিফার যাবতীয় কার্যক্রম যদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয়, তা হলে প্রমাণিত হবে যে, তার নম্রতা, ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার বিষয়টি তার ব্যক্তিগত পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। লজ্জা ও শালীনতা তার স্বভাবগত বিষয় ছিল। কিন্তু এটা কখনোই তার বিবেকের উপর প্রবল হতে পারত না। ব্যবস্থাপনা ও শরয়ি বিষয়ে তিনি অনিয়মকে কখনোই প্রশ্রয় দিতেন না। বড় থেকে আরও বড় কোনো ব্যক্তিত্বের প্রভাবও তার সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলতে পারত না। তার কাছে যখন ধর্মীয় অথবা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো, তখন সেখানে তিনি কারো অসন্তুষ্টির পরোয়া করতেন না। বরং অনেক সময় একটি বিষয় দেখতে খুব সাধারণ মনে হতো, কিন্তু তিনি তার পরিণতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিয়ে তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি করে দিতেন। তার কর্মপন্থা ছিল নম্রতামিশ্রিত। কিন্তু এ নম্রতা রেশমি সুতার মতোই দৃঢ় ছিল।

গভর্নরদের বরখাস্তের অবিচল সিদ্ধান্ত

হজরত উসমান রা. বিভিন্ন কারণে যখন হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবির জন্য কুফার গভর্নর পদে বহাল থাকা সতর্কতার পরিপন্থি মনে করলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করে দিলেন। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর ব্যক্তিগত প্রভাব ও মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। বরং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩০৯]

একইভাবে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে বসরার দায়িত্ব থেকে এবং হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে মিসরের শাসনক্ষমতা থেকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রেও তিনি এ দুজনের মর্যাদা ও বড়ত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হননি। মুসলমানদের কল্যাণকে সামনে রেখে এসব পরিবর্তন করতে তিনি কোনো রকম কুণ্ঠাবোধ করেননি।

প্রয়োজন অনুপাতে দণ্ডবিধিও কার্যকর করতেন

বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে হজরত উসমান রা. অধীনস্থ শাসকদের অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ দিতেন, যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির কারণে অবাধ্যদের উপর বেশি কঠিন শাস্তি প্রয়োগ না করা হয়। অথবা কোনো নিরপরাধ মানুষ যেন শাস্তির আওতায় না এসে পড়ে।

কিন্তু যখন কারো পক্ষ থেকে কোনো অন্যায় বা অনাচার প্রমাণিত হয়ে যেত, তখন ইসলামি আইন ও শরিয়ত অনুযায়ী শিক্ষাদান ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে হজরত উসমান রা. কালবিলম্ব করতেন না। এ কারণেই তার আদেশে কবি 'যাবি'কে সম্ভ্রান্ত লোকদের নিন্দাচর্চার অপরাধে কারাগারে বন্দি করা হয়েছিল।[৩১০] একইভাবে কুফার কয়েকজন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে তার আদেশে দেশান্তর করা হয়েছিল।[৩১১]

---

[৩০৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩৫ হিজরির ঘটনাবলি।

[৩১০] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩

[৩১১] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩, ৩৩ হিজরির ঘটনাবলি, আল কামিল, ৩৩ হিজরির ঘটনাবলি।

মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণে বাধাপ্রদানকারীদের শাস্তি

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদুল হারামের কোনো চৌহদ্দি ছিল না। চারপাশে ছিল বসবাসের ঘর। সেসব ঘরের পেছনের দেয়ালগুলোই মসজিদকে ঘিরে রেখেছিল। মসজিদে প্রবেশের জন্য যে দরজা ছিল, তা গলির মধ্যে খোলা হতো। হজের দিনগুলোতে সেই গলি বেশ সংকীর্ণ হয়ে যেত। এ কারণে হাজীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

এই সমস্যার কেবল একটিই সমাধান ছিল। আশপাশের ঘরগুলোর জমি মসজিদের জন্য ক্রয় করে নেওয়া, ঘরের মালিকরা রাজি থাক বা না থাক। কেননা মসজিদুল হারাম সংকীর্ণ হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষের কষ্ট হচ্ছিল। আর এর অন্য কোনো সমাধানও ছিল না। স্থানীয় লোকেরা তো অন্যত্রও বসবাস করতে পারবে।

তাই হজরত উমর রা. মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ শুরু করলেন। সম্প্রসারণের পরিকল্পনার মধ্যে যাদের ঘর ছিল, তাদেরকে জমির দাম গ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করা হলো। কিন্তু সমস্যা হলো, কেউ কেউ তার জমি বিক্রি করতেই অসম্মতি জানিয়ে দিল।

কিন্তু যেহেতু এটি একটি জাতীয় ও সামাজিক কল্যাণকর উদ্যোগ ছিল, তাই মালিকদের অসম্মতির কোনো তোয়াক্কা না করে, তাদের ঘর ভেঙ্গে ঘর ও জমির মূল্য তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু অসম্মতির কারণে সেই মূল্য গ্রহণ করতেও তারা অস্বীকার করল।

হজরত উমর রা. সেই ফিরিয়ে দেওয়া মূল্যগুলো 'খাযানাতুল কাবাহ'তে সঞ্চয় করে রাখলেন, যা মূলত কাবার ব্যয়নির্বাহের বিশেষ ফান্ড ছিল।

পরবর্তীতে অসম্মতি প্রকাশকারী মালিকরা সদয় হলেন এবং সেই প্রস্তাবিত মূল্য গ্রহণ করতে চাইলেন। তখন উক্ত ফান্ড থেকে তাদেরকে সমপরিমাণ মূল্য বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

এ সম্প্রসারণপ্রকল্পের আওতায় মসজিদ ও তার আশপাশের পরিবেশ প্রশস্ত করা হলো। মসজিদের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় পাঁচ-ছয় ফিট উঁচু সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হলো।[৩১২]

---

[৩১২] তারিখুল মাক্কাতিল মুশাররাফাহ ওয়াল মাসজিদিল হারাম লি ইবনি যিয়া' আল হানাফি (মৃত : ৮৫৪ হিজরি) পৃষ্ঠা : ১৫১, ইমাম বুখারিও সংক্ষেপে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৮৩০, বাবু বুনয়ানিল কা'বাহ।)

কিন্তু হজরত উসমান রা. এর যুগে জিয়ারতকারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে উক্ত সম্প্রসারণও অপর্যাপ্ত মনে হলো। তাই হিজরি ২৬ সনে হজরত উসমান রা. আশপাশের আরো জমি ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণের আদেশ করলেন।

কিন্তু এবারও একই সমস্যা দেখা দিল। কেউ কেউ বাড়ির মূল্য নিয়ে নিল আর কেউ কোনো কিছুর বিনিময়েই বাড়ি বিক্রি করতে সম্মত হলো না। অবশেষে জোরপূর্বক তাদের বাড়ি মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে মূল্য বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

কিন্তু এবার এ অসম্মত লোকেরা হজরত উসমান রা. এর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলো। হজরত উসমান রা. তাদেরকে বললেন, আমার স্বভাবগত নম্রতাই তোমাদেরকে বিতর্কের সাহস যুগিয়েছে। নতুবা হজরত উমর রা.-ও তো একই কাজ করেছিলেন। তখন তো কেউ টু শব্দটি করার সাহস পায়নি।

যেহেতু আগামীতেও মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন হতে পারে এবং প্রত্যেকবারই কিছু মানুষের হইচই করার আশঙ্কা ছিল, তাই হজরত উসমান রা. এমন একটি জাতীয় উদ্যোগে বাধা সৃষ্টির ধারা বন্ধ করার জন্য বিতর্ককারীদের শাস্তির আওতায় আনা সমীচীন মনে করলেন। তাই তিনি তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ করলেন। অবশ্য পরে মক্কার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে মুক্ত করে দেন।[৩১৩]

মদিনাবাসীকে সতর্কীকরণ

একবার হজরত উসমান রা. মদিনার কতিপয় অধিবাসীর সীমালঙ্ঘনের সংবাদ পেলেন। তখন এক উন্মুক্ত মজলিসে বক্তব্য দিয়ে বলেন, 'হে মদিনাবাসী, তোমরা ইসলামের ভিত্তিস্বরূপ। তোমরা যদি বিগড়ে যাও, তবে সবকিছু বিগড়ে যাবে। আর তোমরা সোজা থাকলে সব সোজা থাকবে। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করো। এখন থেকে যদি আমি তোমাদের কারো সম্পর্কে এদিক-ওদিক করার তথ্য পাই, তা হলে তাকে শহর থেকে বিতাড়িত করব।'

---

[৩১৩] তারিখুত তাবারি : ৪/২৫১

এর পর থেকে যারা শহরের জন্য অনুপযোগী কোনো কাজ করত, তিনি তাদেরকে মদিনা থেকে বের করে দিতেন।[৩১৪]

বাকপটুতা

হজরত উসমান রা. এর বাকপটুতা কেমন ছিল, তার ধারণা নেওয়া যেতে পারে তার ওইসব বাণী, যুক্তিপূর্ণ কথা ও বক্তব্য থেকে, যা ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত আছে, যার এক একটি শব্দ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি কোনো গোমরাহ দরবেশ ছিলেন না। তবে হ্যাঁ, এটা সত্য যে, তিনি অনর্থক কথা না বলে সংক্ষেপে ও সমৃদ্ধ অর্থবহ কথা বলতেন।

একবার আশতার নাখায়ির সাথে তার সংলাপ হচ্ছিল। আশতার নাখায়ি তার উপর চাপ প্রয়োগ করে বলল, হয়তো খেলাফত ছাড়ুন, নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন।

হজরত উসমান রা. দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহর কসম, উম্মতে মুহাম্মদিকে পরস্পরের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় আমার গর্দান কর্তিত হওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।[৩১৫]

নেতাদের সাথে অভদ্র আচরণ তিনি সহ্য করতেন না

হজরত উসমান রা. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের প্রতি, বিশেষত তাদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতেন। এ ব্যাপারে কোনো ধরনের অবহেলা তিনি সহ্য করতেন না।

একবার জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সাথে দুর্ব্যবহার করল। হজরত উসমান রা. তাকে শাস্তি দিলেন এবং প্রহার করলেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসুল যাদের সম্মান করতেন, তাদের সম্মানে অবহেলার সুযোগ আমি কী করে দিঁতে পারি?'[৩১৬]

---

[৩১৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯৯, সাইফ থেকে বর্ণিত।
[৩১৫] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭০
[৩১৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪০০, সাইফ থেকে বর্ণিত।

পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতেন

সাধারণ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে হজরত উসমান রা. কতটা সচেতন থাকতেন তার ধারণা একটি ঘটনা থেকে নেওয়া যায়। একবার কুফায় 'কা'ব বিন যিল-হাবাকা' নামে এক ব্যক্তি যাদু-টোনা ও নিকৃষ্ট বিষয়ের তদবির করতে শুরু করল। তখন হজরত উসমান রা. এর পক্ষ থেকে কুফার গভর্নর হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর কাছে এই মর্মে চিঠি পৌঁছল যে, এ লোকটাকে বন্দি করে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয়, তা হলে শাস্তি দিন।

হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. আদেশ অনুযায়ী তাকে আটক করে তদন্ত করার পর শাস্তি দিলেন। কিন্তু কুফার লোকেরা অবাক হয়ে গেল যে, হজরত উসমান রা. এত ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও কী করে অবগত হন।[৩১৭]

মন্দ বিষয়গুলো দূর করার চিন্তা

হজরত উসমান রা. সব সময় নতুন সৃষ্ট মন্দ বিষয় এবং যেকোনো অন্যায় কর্ম সম্পর্কে সচেতন থাকতেন। যেকোনো মূল্যে এগুলো নির্মূল করার চেষ্টা করতেন।

মুসলমানদের ধারাবাহিক বিজয়ের কারণে মদিনাবাসীর সম্পদ ও প্রাচুর্য এবং অবসরতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে কেউ কেউ অনর্থক কাজে ব্যস্ত হওয়ার পথ সৃষ্টি করছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় কেউ কেউ কবুতর পালন শুরু করেছিল। আবার কেউ গুলাইল দিয়ে নিশানা পরখ করার কাজে ব্যস্ত হচ্ছিল। অন্যদিকে কেউ কেউ এমন নাবিজ পান করতে শুরু করেছিল, যার মাধ্যমে নেশা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল।

হজরত উসমান রা. এই পরিস্থিতি দেখে এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিলেন, লাঠি নিয়ে শহরে ঘুরবে এবং কোথাও এসব অন্যায় দেখলে শায়েস্তা করবে।[৩১৮]

---

[৩১৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৪০১, ৪০২

[৩১৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯৮, সাইফ থেকে বর্ণিত।

বার্ধক্য সত্ত্বেও দুর্বল ও অসহায় ছিলেন না

বার্ধক্য সত্ত্বেও হজরত উসমান রা. এর শক্তি ও সক্ষমতার অবস্থা এই ছিল যে, জীবনের শেষ পর্যন্ত নফল নামাজে লম্বা লম্বা সুরা তেলাওয়াত করতেন। দীর্ঘ কেরাত পড়তেন এবং রোজা রাখতেন।[৩১৯]

সুউচ্চ মনোবল

হজরত উসমান রা. এর মনোবল ছিল ধারণার অতীত। সর্বাবস্থায় তিনি নিশ্চিন্ত হৃদয় এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় প্রফুল্ল থাকতেন। সংবাদাদাতারা যখন তাকে জানাল যে, বিদ্রোহীরা মদিনার দিকে আসছে, তারা আপনাকে হয়তো বরখাস্ত করবে, নতুবা হত্যার চেষ্টা করবে তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হেসে উঠেছিলেন। তারপর বিশৃঙ্খলাকারীদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করেছিলেন।[৩২০]

অথচ এজাতীয় মুহূর্তে বড় থেকে বড় মানুষও ঘামিয়ে ওঠে এবং মুখ থেকে বদদোয়া ছাড়া কিছুই বের হয় না। জীবনের শেষমুহূর্তে তারই রক্তপিপাসু শত্রুর আগমন অপেক্ষায় ঘরের দরজা খুলে দিয়ে, একাকী কুরআনুল কারিমের তেলাওয়াতে নিমগ্ন হওয়া, সত্যিই হজরত উসমান রা. এর ঈমানি শক্তি, দৃঢ় মনোবল ও অবিচলতা এবং আপন খালিক ও মালিকের সাথে হৃদয় ও মনের গভীর বন্ধনেরই প্রমাণ দিয়েছিল।

رضی الله عنه وارضاه

---

[৩১৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৮৮

[৩২০] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৪৬

হজরত আলি রা. এর খেলাফতকাল

যিলহজ ৩৫ হিজরি থেকে রমজান ৪০ হিজরি পর্যন্ত।
৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ মে থেকে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ জানুয়ারি পর্যন্ত।

হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের পর এক নজরে মুসলিমবিশ্বের চিত্র

হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের ফলে ইসলামি দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। এ অভাবনীয় ঘটনা প্রমাণ করেছিল যে, মুসলিমজাতির ঐক্য ও ভিত্তি আজ চরম ঝুঁকির সম্মুখীন। মুসলিম উম্মাহ সেই ভয়াবহ দুর্যোগের শিকার হয়ে পড়েছে, যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল কয়েকটি হাদিসে।

মুসলিমজাতির ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম দুর্ঘটনা, যা তাদের সর্বজনস্বীকৃত, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত খলিফা এবং তার সাথিবর্গের কার্যক্রমের সমালোচনার ফলে দেখা দিয়েছিল।

একথা আপন স্থানে যথার্থ যে, এ ঘটনার সময় মিসর ও মদিনা ব্যতীত অন্যান্য শহরের অবস্থা স্বাভাবিকই ছিল। না অভ্যন্তরীণভাবে কোনো ব্যাপক বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল, আর না ভিনদেশি শক্তিগুলো মুসলিমদের উপর জয়লাভ করতে পারত। কিন্তু সবচেয়ে বড় শঙ্কা ও ঝুঁকির বিষয় ছিল, খোদ মুসলমানদের মধ্যেই বিবাদ-বিসংবাদের সূচনা হয়েছিল।

যদিও তৃতীয় খলিফার বাড়ি অবরোধকারী ও তার পদত্যাগের দাবি উত্থাপনকারী গোষ্ঠী ছিল একটি ক্ষুদ্র দল; কিন্তু এ ঘটনা থেকে এ শঙ্কা স্পষ্ট হয়েছিল যে, যথাসময়ে মুসলমানদেরকে শামলে নেওয়া না হলে তাদের এ দ্বিতীয় প্রজন্মটি চিন্তাগত বক্রতা, বিপথগামিতা এবং সত্যের পথ থেকে বিচ্যুতির শিকার হতে পারে।

সেই সাথে আরো প্রমাণিত হয়েছিল, একটি আদর্শ সমাজ থাকলেও মুসলিমবিশ্ব অন্যান্য সমাজের মতো মানবজাতির সমন্বয়েই গঠিত। আর মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই আছে বিভিন্ন দুর্বলতা। সুতরাং কোনো

দুষ্কৃতিকারী দল চাইলে মুসলমানদের মধ্যেও ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা এবং বিশৃঙ্খলা জাগিয়ে তুলতে পারে।

উক্ত ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহীদের পূর্ণ উদ্দম ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করা সাক্ষ্য দেয় যে, অপরাপর মানব সমাজের ন্যায় ইসলামি সমাজেও সংশোধন, বিপ্লব, অধিকার, নবায়ন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার স্লোগান তুলে মানুষকে এতটাই আন্দোলনমুখর করে তোলা সম্ভব যে, সব সময় সমাজের মধ্যে একটা হুলুস্থুল অবস্থা বিরাজ করবে। যাতে শাসনব্যবস্থা পাকাপোক্ত না হতে পারে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হতে না পারে।

উক্ত ষড়যন্ত্রে যারা উঠেপড়ে লেগেছিল, তাদের মধ্যে মন্দপ্রকৃতির লোক যেমন ছিল, তেমনি সৎ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষও ছিল। আর ওই আন্দোলনকে ভালো বলে ফুটিয়ে তোলার জন্য তাদেরকেই সম্মুখে রাখা হয়েছিল। অথচ তারা কেবল অজ্ঞতা ও ভুলের শিকার হয়েই ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছিলেন।

হজরত উসমান রা. কে শহিদকারী বিদ্রোহীরা শুধু তার ঘরের মালপত্রই নয়, বরং বাইতুল-মাল থেকে মুসলমানদের জাতীয় সম্পদও লুণ্ঠন করেছিল। আর এটা স্পষ্ট প্রমাণ যে, বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও প্রতিহিংসার বাস্তবায়ন।[৩২১] আর এ উদ্দেশ্য যখন সফল হলো, তখন তারা বুঝতে পারছিল না যে, তারা কী করবে? যে-করেই হোক, আসলে তাদের জন্য নিজ নিজ সমাজ ও গোত্রে ফিরে গিয়ে কুফা, বসরা ও মিসরের মানুষের সম্মুখে জবাব দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি মানুষ জানতে চাইবে, তারা কী আন্দোলন করতে গিয়েছিল, আর কী করে এসেছে।

এটা ছিল সাধারণ বিদ্রোহীদের অবস্থা। অর্থাৎ তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত, দিশেহারা ও অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের উদ্দেশ্য লুটপাট ও প্রতিশোধ নয়; বরং উম্মাহকে পরস্পরে দাঙ্গায় লিপ্ত করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তাই এরপর তারা তাদের ভক্ত-চেলাদের তিনটি দলকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আন্দোলনে লাগিয়ে দিল।

---

[৩২১] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪

যেন তারা মদিনায় উপস্থিত শ্রেষ্ঠ তিন সাহাবিকে আরেকবার ক্ষমতার মসনদে বসানোর চেষ্টা করে এবং এর দ্বারা যাতে নতুন আরেকটি বিশৃঙ্খলা শুরু হয়।

সুতরাং বসরার বিদ্রোহীরা হজরত তালহা রা. এর কাছে, কুফার বিদ্রোহীরা হজরত যুবাইর রা. এর কাছে এবং মিসরের বিদ্রোহীরা হজরত আলি রা. এর কাছে খলিফা হওয়ার আবেদন পেশ করতে লাগল। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করলেন। বিদ্রোহীরা নিরাশ হয়ে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এবং তারপর হজরত ইবনে উমর রা. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণের চেষ্টা করল। কিন্তু তারাও তাতে সম্মত হলেন না।[৩২২]

এভাবে ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের চাল আরেকবার ব্যর্থ হলো। কেননা প্রমাণ হয়েছিল যে, প্রবীণ সাহাবিদের কেউই খেলাফতের প্রতি লালায়িত ছিলেন না।

হজরত আলি রা. কেন এককভাবে খেলাফতের হকদার?

এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামের মূল কেন্দ্রকে রক্ষা করতে এবং মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের বিরুদ্ধে চলমান ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার জন্য বিশিষ্ট সাহাবিগণ কাজ করতে শুরু করলেন। তারা হজরত আলি রা. কে খলিফা নিযুক্ত করার প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন। মদিনার অন্যান্য অধিবাসীরাও এতে একমত ছিলেন।

কিন্তু সাবায়ি যোগাযোগ-ব্যবস্থা আগে থেকেই মিথ্যা ও বানোয়াট চিঠিপত্রের মাধ্যমে যেসব বিশিষ্ট সাহাবিকে বিদ্রোহ আন্দোলনের নেতা বলে প্রচার করেছিল, তাদের মধ্যে হজরত আলি রা. এর নামও ছিল। সম্ভবত ষড়যন্ত্রকারীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তাদের মধ্য হতে যেকেউ খেলাফত গ্রহণ করবে, তার বিরুদ্ধেই ছড়িয়ে দেওয়া হবে যে, মূলত সে-ই তার ক্ষমতাগ্রহণের পথ সুগম করার জন্য পূর্ববর্তী খলিফাকে হত্যা করেছিল।

---

[৩২২] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩২, সাইফ থেকে বর্ণিত।

ষড়যন্ত্রকারীদের এ চক্রান্ত সম্পর্কে হজরত আলি রা. নিজেও বুঝতে পারছিলেন। তাই তিনি খেলাফতের পদ গ্রহণে কালক্ষেপণ করছিলেন। তবে উম্মতের মধ্যে ওই সময় হজরত আলি রা. এর চেয়ে উচ্চমর্যাদার অধিকারী কেউ ছিল না। তার শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা এবং চিন্তাশীলতা সম্পর্কে কারো কোনো সংশয় ছিল না। তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। শৈশব থেকে তিনি আল্লাহর নবীর সাথে একই ঘরে ছিলেন। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। হজরত আলির সাথে আল্লাহর নবীর যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তার কথা বহু হাদিসে আল্লাহর নবীর পবিত্র জবানে বিবৃত হয়েছে। যেমন :

এক হাদিসে তিনি ইরশাদ করেন, আমি যার বন্ধু, আলিও তার বন্ধু।[৩২৩]

একদিন হজরত আলি রা. কে লক্ষ করে আল্লাহর নবী ইরশাদ করলেন,

انت منى وانا منك

তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে।[৩২৪]

আরেকদিন বলেছিলেন, আলি আমার এবং আমি তার।[৩২৫]

আবার একদিন বলেছিলেন, আলি, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাই।[৩২৬]

---

[৩২৩] من كنت مولاه فعلى مولاه. رواه الامام احمد فى مسنده، ح ٦٤١ : এ হাদিসটি 'হাদিসে গাদিরে খাম' নামে পরিচিত। ইমাম তিরমিজি এটিকে হাসান এবং ইমাম তহাবি সহিহ বলেছেন। ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবা রহ. তার মুসান্নাফে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ. তার ফাজাইলুস সাহাবা ও মুসনাদে, ইমাম নাসায়ি রহ. তার আস সুনানুল কুবরাতে, ইমাম তাবারি রহ. তার তিনটি মু'জামে, আবু ইয়ালা মুসিলি এবং ইমাম বাজ্জার রহ. নিজ নিজ মুসনাদে, এবং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ইতহাফুল মাহারাতে এ হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
রাফেজিরা এ হাদিসকে তাদের 'ইমামতের আকিদা'র মূলভিত্তি বানিয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু এ ভুল প্রমাণের খণ্ডন করার পদ্ধতি এটা নয় যে, মূল হাদিসই অস্বীকার করা হবে।
ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ. এ হাদিস সম্পর্কে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা পেশ করেছেন। হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করে তিনি এর এমন অর্থই স্পষ্ট করেছেন, যা কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালা এবং ভাষাগত নিয়ম ও যুক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল। (শরহু মুশকিলিল আসার : ৫/১৮)

[৩২৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪২৫১, কিতাবুল মাগাযি

[৩২৫] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ৩৭১৯

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগামীদিনের আসন্ন ফেতনা সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, কিছু মানুষ হজরত আলি রা. এর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। তাই আল্লাহর নবী একথাও বলেছিলেন, 'প্রত্যেক ঈমানদার আলিকে মহব্বত করবে। কেবল মুনাফিকরাই তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।'[৩২৭]

আল্লাহর নবীর এ প্রিয় জামাতার ইলমি অবস্থান কত ঊর্ধ্বে ছিল, তার ধারণা নেওয়া যায় আল্লাহর নবীর এই বাণী থেকে- 'আমি প্রজ্ঞার ঘর আর আলি তার দরজা'।[৩২৮]

আল্লাহর নবীর সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি দিন ও রাত হজরত আলি রা. এর সম্মুখে ছিল খোলা কিতাবের মতো। তা ছাড়া সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় এবং সবার শ্রদ্ধার পাত্র। আল্লাহর নবীর প্রিয় কন্যা হজরত ফাতিমা রা. হজরত আলি রা. এর বিবাহবন্ধনে থাকার কারণে নবীপরিবারের সাথে তার সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও গভীর হয়েছিল।

হজরত আলি রা. আল্লাহর নবীর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অসীম আত্মত্যাগের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাবুকযুদ্ধের সময় নবীজির প্রতিনিধি হিসেবে মদিনার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের সময় হজরত আলির বয়স প্রায় ৩৩ বছর ছিল। তবে তিনি তখন একজন অসি চালনায় পারদর্শী সৈনিক হওয়ার চেয়ে একজন চিন্তাবিদ, নেতা, উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর যোগ্যতা অধিক অর্জন করেছিলেন। একারণেই হজরত আবু বকর, উমর ও উসমান রা. এর খেলাফতের পঁচিশ বছরে তিনি মদিনায়

---

[৩২৬] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ৩৭২০

[৩২৭] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৪৯, কিতাবুল আইমান, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৩৬

[৩২৮] ইরশাদ হয়েছে-

انا دار الحكمة وعلى بابها. (رواه الترمذى فى ابواب المناقب) وفى رواية "انا مدينة العلم وعلى بابها.

(المعجم الكبير للطبرانى : ٦٥/١١)

খেলাফতের যাবতীয় বিষয়ের কেন্দ্রীয় শুরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও কাজি ছিলেন।

হজরত উমর রা. খলিফা নির্বাচনের জন্য যে ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করেছিলেন, তার সিদ্ধান্ত ছিল হজরত উমরের পর খেলাফতের দায়িত্ব দুই মহান ব্যক্তিত্বের কোনো একজনকে প্রদান করা। একজন হলেন হজরত উসমান, অপরজন হজরত আলি রা.। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয়েছিল হজরত উসমান রা. এর ব্যাপারে। এখন তার শাহাদাতের পর নিঃসন্দেহে হজরত আলিই খেলাফতের সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন।

এ ছাড়া হজরত উসমান রা. জীবনের শেষমুহূর্তে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাও সাহাবায়ে কেরামের স্মরণ ছিল। তিনি বলেছিলেন, আপনারা হজরত আলিকে বলুন, মানুষের যাবতীয় বিষয় এখন আপনার দায়িত্বে। আপনি তাই করুন, যা আল্লাহ আপনার অন্তরে অবতীর্ণ করেন।[৩২৯]

জীবনের শেষদিকে হজরত উসমান রা. এটাও স্পষ্ট করেছিলেন যে, তার মতে খেলাফতের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হজরত আলি রা.।[৩৩০]

হজরত আলি রা. এর এমন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মদিনার অধিকাংশ মুহাজির ও আনসার তাকে খলিফা নিযুক্ত করতে চাচ্ছিলেন। সাধারণ বিদ্রোহীরা তখন তারই ছায়ায় আশ্রয় নিতে চাচ্ছিল। বিদ্রোহীরা মদিনায় চরম অস্থিতিশীলতা ও অরাজকতা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও এ সক্ষমতা তাদের ছিল না যে, নিজেদের মনমতো কাউকে খলিফা বানিয়ে দেবে। বরং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিশিষ্ট সাহাবিদের মতের ভিত্তিতেই হতে পারত।

হজরত আলির খেলাফতের বাইয়াত কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল?

পরিশেষে হজরত তালহা, হজরত যুবাইরসহ প্রবীণ মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ হজরত আলি রা. এর কাছে এলেন এবং আবারও তাকে দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন জানালেন। হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর রা. হজরত আলির হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য খুব জোরালোভাবে

---

[৩২৯] তারিখুল মাদিনা লি ইবনি শাব্বাহ : ৪/১২০৪, ১২০৫

[৩৩০] তারিখুল মাদিনাতে আছে-

ولان يليها ابن ابى طالب احب الى من ان يلى غيره (تاريخ المدينة لابن شبة : ١٢٠٦/٤)

আবেদন করছিলেন। তারা বারবার বলছিলেন, 'আবুল হাসান, আসুন, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত হই।[৩৩১]

অবশেষে তাদের পীড়াপীড়ি দেখে হজরত আলি রা. খোলা মনে বললেন, আপনারা চাইলে আমার হাতেও বাইয়াত হতে পারেন, আবার চাইলে আমি আপনাদের কোনো একজনের হাতে বাইয়াত হতে পারি।

তারা উভয়ে একসাথে বললেন, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত হবো।[৩৩২]

এ কথা বলে তারা দুজনই সর্বপ্রথম হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হন।[৩৩৩]

---

[৩৩১] তারিখুত তাবারি : ৪/৪২৭, আবু বশির থেকে বর্ণিত, ৪/৪২৯ মুহাম্মদ বিন থেকে বর্ণিত, ৪/৪২৯ ইবনে সিরিন থেকে বর্ণিত।

[৩৩২] ان شئتما فبايعانى وان شئتما بايعت احدكما، قالا بل نبايعك. (مصنف عبد الرزاق، ح : ٩٧٧٠ بسند صحيح الى الزهرى، ط المجلس العلمى)

[৩৩৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৪২৮, আমর ইবনে শাইবা থেকে বর্ণিত।
উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো বর্ণনায় এ দুই বিশিষ্ট সাহাবি সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তারা হজরত আলির হাতে বাইয়াত হতে অস্বীকার করেছিলেন অথবা তাদের থেকে জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ করা হয়েছে।

) تاريخ الطبرى، عن ايلى وعن ابى مخنف : ٤٢٩/٤، عن رجل مجهول عن الزهرى : ٤٣٠/٤، عن سرى : ٤٣٤/٤، عن الحارث الوالبى : ٤٣٥/٤ (

কিন্তু এই সমস্ত বর্ণনা সনদের বিচারে দুর্বল এবং মতনের বিচারে বানোয়াট। কোনোটি আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত, আর কোনোটি অন্যকোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি বা দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত। আমরা আমাদের আলোচনায় সনদের বিচারে উৎকৃষ্ট বর্ণনা গ্রহণ করেছি। আর তাতে কোনো রকম চাপপ্রয়োগ ছাড়াই বাইয়াত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে।

তবে আমাদের আলোচনায় উল্লিখিত বর্ণনা ছাড়াও এ বিষয়ে আরো সহিহ বর্ণনা আছে। যেমন হজরত আলি রা. এর নিজ বক্তব্য সহিহ সনদে উল্লেখ আছে,

ان طلحة والزبير بايعا طائعين غير مكرهين

নিশ্চয় তালহা ও যুবাইর স্বেচ্ছায় কোনো চাপপ্রয়োগ ব্যতীত বাইয়াত হয়েছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৭৯৯)

একই বর্ণনা হাসান সনদেও বর্ণিত আছে। (দেখুন, তারিখুল মাদিনা লি ইবনি শাব্বাহ : ৪/১২৭৫)

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার এক বর্ণনায় হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর রা. সহ বিভিন্ন লোকের বাইয়াত হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ আছে,

বাইয়াত ও প্রথম খুতবা

উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পুনঃপৌণিক আবেদন এবং মুসলিমজাতির বৃহত্তর কল্যাণ সামনে রেখে ৩৫ হিজরির যিলহজ মাসের ২৪ তারিখ হজরত আলি রা. মসজিদে নববিতে আল্লাহর রাসুলের মিম্বার অলংকৃত করে এ মহান দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। বিশিষ্ট-সাধারণ সবাই তার হাতে বাইয়াত হয়।[৩৩৪]

বাইয়াত গ্রহণের পর হজরত আলি রা. সাধারণ মানুষকে লক্ষ করে বলেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের এ দায়িত্ব গ্রহণ করাটা পছন্দ করছিলাম না। কিন্তু তোমরা আমাকে নির্বাচন না করে ছাড়লে না। সাবধান থাকো, তোমাদেরকে রেখে কোনো কাজ করার অধিকার আমার নেই। হ্যাঁ, তোমাদের (বাইতুল-মালের) সম্পদের চাবি আমার কাছে থাকবে। তবু মনে রাখবে, আমি তোমাদের অনুমতি ব্যতীত সেখান থেকে এক দিরহামও নিতে পারব না। তোমরা কি এতে সম্মত?

সকলে একবাক্যে বলল, আমরা সম্মত।

তখন হজরত আলি রা. জনসাধারণ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন।[৩৩৫]

হজরত উসমান রা. এর কিসাস

সাধারণত মনে করা হয় যে, হজরত আলি রা. এর জন্য সর্বপ্রথম ওইসব বিশৃঙ্খলাকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল, যারা বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিল।

কিন্তু হজরত আলি রা. এর সম্মুখে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ইসলামের হেফাজত। তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিল যে, মূল ইসলামের সঠিক ভাবমর্যাদাই শঙ্কার মধ্যে আছে। আর তা এভাবে যে, ইসলামের পরিচয়, সনদ ও সংজ্ঞা হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। আর তখন অবস্থা এমন ছিল যে, আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের কেবল ইখলাস ও

بايعوا عليا طائعين غير مكرهين.

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৭০৯) হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এ বর্ণনার সনদকে হাসান বলেছেন। (ফাতহুল বারি : ১৩/৫৪)

[৩৩৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪২৭, ৪২৮, জাফর থেকে বর্ণিত।

[৩৩৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৪২৮

কর্মই নয়, বরং তাদের কতিপয়ের ঈমান সম্পর্কেও সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছিল। সাবায়িরা তৃতীয় খলিফাকে 'কাফের' পর্যন্ত ঘোষণা করেছিল (যেমনিভাবে কোনো কোনো শিয়া ঐতিহাসিক এ ধরনের বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন)।

এহেন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ইসলামের জন্য আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের ভিত্তিমূল হওয়ার অবস্থানটিকে কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ হতে না দেওয়া। আর ঠিক এ বিষয়টিই এর আগে হজরত উসমান রা. এর সম্মুখেও ছিল। যে কারণে তিনি গালমন্দ থেকে নিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতও সহ্য করেছেন, কিন্তু শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত কাউকে এ ভুল তথ্য প্রচার করার সুযোগ দেননি যে, আল্লাহর নবীর প্রতিনিধি মুসলমানদের রক্তে হাত রাঙিয়েছেন।[৩৩৬]

আর ঠিক এই একই লক্ষ্য যেন স্বয়ং আল্লাহর নবীর কর্মপন্থায়ও ছিল। তাই আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মুনাফিকি, ইসলামের সাথে তার শত্রুতা ও গাদ্দারি সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর নবী পূর্ণ অবগত ও কয়েকবার তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বীকার হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামকে তাকে হত্যার আদেশ দেননি। শুধু এজন্য যে, দুনিয়ার মানুষ যেন এটা না বোঝে যে, ইসলামি শক্তি ও ক্ষমতা এমনই হয়। আল্লাহর নবী বলেছিলেন, 'পাছে মানুষ একথা না বলে যে, মুহাম্মদ তো নিজের সঙ্গীকেও হত্যা করে ফেলে'।[৩৩৭]

হজরত উসমান রা. এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটিই অনুধাবন করেছিলেন এবং হজরত আলি রা.-ও এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি যে কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা হলো, পরিস্থিতির সংশোধন ও সময়ের দাবি পূরণে সর্বপ্রথম তিনি আত্মসংবরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তার চেষ্টা ছিল, বিশিষ্ট সাহাবি কিংবা কোনো শাসকের পক্ষ থেকে যেন আবেগের তাড়নায় এমন কোনো কথা উচ্চারিত না হয়, যা শরিয়তের সীমার বাইরে অথবা যা আরো বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তা হলে দুনিয়ার মানুষ মনে করবে, ক্ষমতার লিপ্সায় মুসলমানরা গৃহযুদ্ধ, মতানৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়েছে।

---

[৩৩৬] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৪৮১

[৩৩৭] সহিহ বুখারি, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা য়ুনহা মিন দা'ওয়াতিল জাহিলিয়া।

বরং এ সময় আমাদের করণীয় হলো, কালিমা-বলা সমস্ত মুসলমানকে এক কাতারে এক পতাকার ছায়ায় অবস্থানকারীরূপে তুলে ধরা।

হজরত উসমান রা. জানতেন, যেসব মানুষ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় একটি সাধারণ কথাকে তুফানে পরিণত করতে পারে, চলমান ফেতনার পরিস্থিতিতে না জানি তারা কত কী করতে পারবে।

এ কারণে হজরত আলি রা. এর নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল সর্বপ্রথম করণীয় কারো উপর আক্রমণ নয়; বরং প্রতিরক্ষা ও নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা। আর এর জন্য শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ থাকা শর্ত। অর্থাৎ এটা আবশ্যক ছিল যে, প্রথমে উম্মতের হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় করা। মুসলমানদের অধিকার, কালিমার মূল্যায়ন এবং পারস্পরিক মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এবং সকলকে আমাদের মূল অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের বার্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

এ হিসেবই বাইয়াতের পর হজরত উসমান রা. লোকদেরকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাবকে হেদায়েতের মাধ্যম বানিয়েছেন। সে কিতাব কল্যাণ ও অকল্যাণ স্পষ্ট করে দেয়। সুতরাং কল্যাণ গ্রহণ করো, অকল্যাণ বর্জন করো। সে কিতাবে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'মুসলমানের মানসম্মান রক্ষা করা'। আর মুসলমান তো সে, যার হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

এটা ভিন্ন কথা যে, দীন ও শরিয়তের দাবি অনুসারে কোনো মুসলমানকে জবাবদিহি করা যায়। এ ছাড়া কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হালাল নয়। তবে শরিয়তের দাবি অনুযায়ী যদি কারো উপর শাস্তি ওয়াজিব হয় সেটা ভিন্ন কথা।

সুতরাং আল্লাহর বান্দা এবং তাদের ভূখণ্ডের অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। কেননা চতুষ্পদ জন্তু এবং জমিনের হক ও অধিকার সম্পর্কেও তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।'[৩৩৮]

---

[৩৩৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩৬, সাইফ থেকে বর্ণিত।

হজরত আলি রা. এর এ হৃদয় জুড়ানো ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ অজ্ঞতাবশত বিদ্রোহ-আন্দোলনে সম্পৃক্ত-হওয়া ব্যক্তিদের ভুলের উপর কুঠারাঘাত করেছিল। কেননা তখনকার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ না রাখা, ঈমানদারদের কষ্ট দেওয়া, ইত্যাদি বিষয় বিশৃঙ্খলার পদে পদে দেখা যাচ্ছিল। তাই হজরত আলি রা. বলতে চাচ্ছিলেন সংস্কার ও সংশোধনের স্লোগানসংবলিত যেকোনো আন্দোলন, বানোয়াট ও অন্তঃসারশূন্য হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, তাতে বান্দার হক উপেক্ষা করা হয়।

নতুন বর্ষ : ৩৬ হিজরির সূচনা

হিজরি ৩৬ সালটি যখন শুরু হলো, তখন মদিনার বাহ্যিক অবস্থা এ দৃষ্টিকোণ থেকে সুগঠিত দেখা যাচ্ছিল যে, সকল সাহাবি, মদিনাবাসী এবং বিদ্রোহীরাও হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হজরত আলি রা. এর সম্মুখে এমন কঠিন পরীক্ষা ছিল, পূর্ববর্তী কোনো খলিফাকে যার সম্মুখীন হতে হয়নি। পূর্ববর্তী তিন খলিফার প্রত্যেকেই শান্তি ও একতার পরিবেশে খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। অথচ হজরত আলির ক্ষেত্রে খোদ রাজধানীর নিরাপত্তাই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। হজরত উসমানকে শহিদ করা হয়েছিল এবং মুসলমানদের ঐক্যের শৃঙ্খলগুলো এক এক করে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। মোটকথা, হজরত আলির জন্য খেলাফতের মসনদ ফুলে-ফুলে সাজানো নয়, ছিল কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ।

কোনো সন্দেহ নেই যে, হজরত আলি রা. এর খেলাফত অনুষ্ঠিত হয়েছিল শুরাভিত্তিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। মদিনার সমস্ত বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার হজরত আলির হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী তিন খলিফার ক্ষেত্রেও মদিনাবাসীর বাইয়াতকেই খেলাফত সম্পন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। সে হিসেবে এবারও তাদের বাইয়াত যথেষ্ট ছিল।

অতএব, পূর্ববর্তী তিন খলিফার খেলাফতের ন্যায়, হজরত আলি রা. এর খেলাফতও সুদৃঢ় দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল। তাই দূরদূরান্তের শহর-নগরের মানুষের জন্য তখন হজরত আলি রা.কে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।[৩৩৯]

---

[৩৩৯] যদিও হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং তার শামের অনুসারীরা হজরত আলির হাতে হাত রেখে বাইয়াত হয়নি, কিন্তু হজরত আলির খেলাফতের উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদেরও কোনো দ্বিমত ছিল না। এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

খেলাফতের রাজধানী মদিনায় প্রায় সকল সাহাবি বাইয়াত হয়েছিলেন। আর এ কারণেই হজরত আলির বাইয়াত গ্রহণ অধিকাংশ আলেমের মতে ছিল 'ইজমায়ি' তথা সর্বজনস্বীকৃত। আকিদাশাস্ত্রের কিতাবাদিতেও এমনটিই লেখা আছে। (দেখুন, 'আল ইবানাতু আন উসুলিদ দিয়ানাহ' - ইমাম আবুল হাসান আল আশআরি কৃত, পৃষ্ঠা : ৭৮, আল ইকতিসাদ ফি ই'তিকাদ, ইমাম গাজালি কৃত, পৃষ্ঠা : ১৫৪, আল ই'তিকাদ লিল বাইহাকি, পৃষ্ঠা : ৩৭০ থেকে ৩৭৪ পর্যন্ত।

আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামি রহ. লিখেছেন,

ان الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلاثة هو الامام المرتضى وولى المجتبى على بن ابى طالب، باتفاق اهل الحل والعقد عليه، كطلحة والزبير وابى موسى وابن عباس وخزيمة بن ثابت وابى هيثم بن التيهان ومحمد بن مسلمة وعمار بن ياسر. (الصواعق المحرقة : ١/٣٤٩، ط الرسالة)

নাসেবি মারওয়ানি দলের লোকেরা হজরত আলি রা. এর বাইয়াতকে সর্বজনস্বীকৃত বলে মানতে অস্বীকার করে। কিন্তু এর পক্ষে দলিল হিসেবে তারা এমন এমন বর্ণনা পেশ করে, যাতে কোনো কোনো সাহাবি সম্পর্কে হজরত আলির হাতে বাইয়াত হওয়া থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ আছে। নিম্নে কয়েকটি বর্ণনার মান উল্লেখ করা হলো।

• তন্মধ্যে একটি বর্ণনায় প্রায় ১০ জন সাহাবির বাইয়াত না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার হলেন ১. হাসসান বিন সাবেত, ২. হজরত কা'ব বিন মালেক, ৩. হজরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ, ৪. হজরত আবু সাঈদ খুদরি, ৫. হজরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, ৬. হজরত নুমান বিন বাকির, ৭. হজরত যায়েদ বিন সাবেত, ৮. হজরত রাফে বিন খাদিজ, ৯. হজরত ফাজালা বিন উবায়েদ এবং ১০. কা'ব বিন উজরা রা.। (তারিখুত তাবারি : ৪/৪২৯, ৪৩০)

কিন্তু এ বর্ণনাটি যয়িফ। কেননা এর এক বর্ণনাকারী 'শাইখুন মিন বনি হাশিম' একেবারেই অজ্ঞাত।

• অপর এক বর্ণনায় উপরোক্ত সাহাবিদের সাথে হজরত কুদামা বিন মাযউন এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রা. কেও এ দলে গণ্য করা হয়েছে। (তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩০)

কিন্তু এ বর্ণনাটিকে জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি ইমাম যুহরি থেকে বর্ণনা করেছে। সুতরাং এটিও যয়িফ।

• আরেক বর্ণনায় হজরত আলি রা. এর বাইয়াতকে যারা জোরপূর্বক বলে আখ্যায়িত করতেন, তাদের তালিকায় হজরত উসামা বিন যায়েদ, হজরত সুহাইব রুমি, হজরত আইয়ুব বিন যায়েদ এবং হজরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা. কে গণ্য করা হয়েছে। (তারিখুত তাবারি : ৪/৪৬৬, ৪৬৭) কিন্তু এটি সাইফ বিন উমরের যয়িফ বর্ণনা।

• অপর বর্ণনায় আছে, হজরত তালহা রা. বলেছেন, আমি হজরত আলির হাতে এ অবস্থায় বাইয়াত হয়েছি যে, আমার মাথার উপর তরবারি তাক করা ছিল। আর এ বর্ণনাটিতেই বাইয়াত থেকে বিরত থাকার তালিকায় হজরত সা'দ বিন আবি

ওয়াক্কাস, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর ও হজরত সালামা ইবনে ওয়াকশ রা. র নামও উল্লেখ করা হয়েছে। (তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩০, ৪৩১)

কিন্তু এটির বর্ণনাকারী হচ্ছে ওয়াকিদি। আর ওয়াকিদির দুর্বলতা স্পষ্ট।

একইভাবে রাফেজিদের পক্ষ থেকেও এজাতীয় বহু বর্ণনা প্রচার করা হয়। রাফেজিরা মূলত এসব বর্ণনা এজন্য বানিয়েছিল যে, এর মাধ্যমে তারা অধিকাংশ সাহাবির উপর এ অপবাদ আরোপ করে যে, হজরত আলি রা. এর বাইয়াত থেকে বিরত থেকে তারা অপরাধী ছিলেন।

অন্যদিকে নাসেবিদের অবস্থা হলো, সাবায়িদের বর্ণনায় নবী-পরিবারের দুর্বলতার সামান্য কোনো দিকও যদি তারা পেয়ে যায়, তাহলে সেটিকে নিজেদের ঈমানের অংশ বানিয়ে নেয়। তাই আলোচ্য বানোয়াট বর্ণনাগুলোকে তারা হজরত আলি রা. র খেলাফত সংঘটিত না হওয়ার প্রমাণস্বরূপ প্রচার করে দেয়। অথচ মিথ্যুক রাফেজিদের বর্ণনার কীইবা গ্রহণযোগ্যতা আছে!!

সহিহ বর্ণনা দ্বারা যা প্রমাণিত

এসবের বাইরে সহিহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে, মদিনার অধিকাংশ মুহাজির ও আনসার সাহাবি হরজত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। যেমন,

১. বর্ণিত আছে,

عن محمد بن الحنفية، دخل المهاجرون والانصار فبايعوه، ثم بايعه الناس

অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া থেকে বর্ণিত, মুহাজির ও আনাসারগণ এলেন এবং হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হলেন। তারপর অন্যান্য সব মানুষ বাইয়াত হয়েছে। (তারিখুত তাবারি : ৪/৪২৭)

২. ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. সহিহ সনদে উল্লেখ করেছেন : মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া বলেন, আমি হজরত আলি রা. এর সঙ্গে ছিলাম। তখন হজরত উসমান রা. অবরুদ্ধ ছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আমিরুল মুমিনিনকে হত্যা করা হবে'। একটু পর আরেকজন এসে বলল, 'আমিরুল মুমিনিনকে এখনই হত্যা করা হচ্ছে'। তখন হজরত আলি রা. উঠে দাঁড়ালেন। আমি বিপদের আশঙ্কায় তার কোমর ধরে ফেললাম। তিনি বললেন, 'ছেড়ে দাও, তোমার মায়ের নাশ হোক'। এ কথা বলে তিনি হজরত উসমান রা. এর ঘরে গেলেন। কিন্তু তার আগেই হজরত উসমান রা.কে শহিদ করা হয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে হজরত আলি রা. নিজের ঘরে ফিরে এলেন এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর লোকেরা এসে দরজায় করাঘাত করল। দরজা খুলে দেওয়া হলে তারা ভেতরে এসে বলল, আগেরজন তো শহিদ হয়ে গেলেন। এখন মানুষের একজন খলিফা হওয়া আবশ্যক। আর আমরা আপনার চেয়ে অধিক উপযুক্ত ও হকদার কাউকে দেখি না।

হজরত আলি রা. বললেন, আমাকে তোমরা খলিফা বানানোর ইচ্ছা করো না। আমার জন্য তোমাদের শাসক হওয়ার পরিবর্তে উজির হওয়া শ্রেয়।

লোকেরা বলল, না। আল্লাহর কসম, আমরা আপনার চেয়ে উত্তম কারো সম্পর্কে জানি না।

বিদ্রোহীদের থেকে কেন বাইয়াত গ্রহণ করলেন?

হজরত আলি রা. কর্তৃক বিদ্রোহীদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ কেবল রাজনৈতিক কল্যাণের ভিত্তিতেই ছিল না; বরং পবিত্র কুরআনের নির্দেশও এটিই ছিল। ইরশাদ হয়েছে,

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হজরত আলি রা. বললেন, যদি তোমরা মানতে না-ই চাও, তাহলে আমার বাইয়াত গোপনে হবে না। বরং আমি মসজিদে নববিতে যাব। সেখানে যাদের ইচ্ছা, তারা যেন বাইয়াত হয়।

একথা বলে তিনি মসজিদে নববিতে গমন করেন এবং লোকেরা সেখানে তার হাতে বাইয়াত হলো। (ফাজাইলুস সাহাবা : ২/৫৭৩)

৩. ইমাম যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত আছে,

حتی اذا قتل عثمان رضہ بایع الناس علی بن ابی طالب رضہ. (مصنف عبد الرزاق، ح : ۹۷۷۰ بسند صحیح مرسل)

৪. ইমাম খাল্লাল রহ. ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

اصحاب رسول الله ﷺ رضوا به واجتمعوا عليه. (السية : ٤١٣/٢)

৫. ইমাম শাবি থেকে বর্ণিত আছে,

فبايعته العامة. (تاریخ الطبری : ۴/۴۳۳)

৬. আবুল হারেসা থেকে বর্ণিত আছে,

فقال الجمهور : علی بن ابی طالب نحن به راضون. تاریخ الطبری : ۴/۴۳۲)

৭. সাইফ বিন উমর থেকে বর্ণিত আছে,

بايع الناس كلهم. (تاریخ الطبری : ۴/۴۳۵)

৮. ইমাম বাইহাকি স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন,

فبايعه الناس ولم يعدلوا به طلحة والزبير ولاغيره, (الاعتقاد, ص : ۱۷۰)

৯. তাবাকাতে ইবনে সা'দে আছে,

بايعه طلحة والزبير وسعد بن ابی وقاص وسعید بن عمرو بن نفيل وعمار بن یاسر واسامة بن زید وسهل بن حنيف وابوايوب الانصاری ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. (۳۱/۳، ط صادر)

উল্লিখিত বর্ণনাগুলোর কেবল শেষের কয়েকটিতে সনদগত দুর্বলতা আছে। তবে শুরুতে উল্লিখিত সহিহ বর্ণনাগুলো থেকে প্রাপ্ত সমর্থন সেই দুর্বলতা দূর করে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, এতটুকু সঠিক যে, অনেক সাহাবি হজরত আলির হাতে বাইয়াত হওয়ার পরও রাজনৈতিক বিড়ম্বনা ও যুদ্ধে অংশ নেননি। আর তাদের এ সিদ্ধান্ত ফেতনার সময় নির্জনবাসী হওয়ার নির্দেশনাসংবলিত কয়েকটি নববি আদেশ থেকে উৎসারিত। তা ছাড়া তাদের রাজনৈতিক বিরোধ থেকে দূরে থাকার বিষয়টিকে 'বাইয়াত অস্বীকার করা'র অর্থে ধরা যায় না।

> ঐসব লোক এর থেকে ভিন্ন, যাদের উপর তোমরা প্রবল হওয়ার পূর্বেই তারা তাওবা করে নেয়। এই অবস্থায় জেনে রেখ যে, আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৩৪০]

এই আয়াতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনো বিশৃঙ্খলাকারী দল নাস্তানাবুদ হওয়ার পূর্বেই আত্মসমর্পণ করে শাসকের আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তারা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।

তা ছাড়া এখানে আরেকটি ব্যাপারও ছিল। মদিনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোকদের সিংহভাগই বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবগত ছিল। তারা অজ্ঞতাবশত কিংবা আবেগতাড়িত হয়ে মদিনায় ছুটে এসেছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ নিজ এলাকার নেতাও ছিল। আর তাদের পেছনে তাদের গোত্র ও বংশের বিরাট সহযোগিতাও ছিল।

সুতরাং যদি তাদের বাইয়াত গ্রহণ না করা হতো, তা হলে প্রথমত এর দ্বারা আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা হতো। আর দ্বিতীয়ত এই অবস্থায় এ লোকগুলো নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিপরীত পথ অবলম্বন করত। ফলে এভাবে একটির স্থলে কয়েকটি বিদ্রোহী দল সৃষ্টি হতো। আর পরিণামে সেই গৃহযুদ্ধই শুরু হয়ে যেত, যাকে প্রতিহত করার জন্য হজরত উসমান রা. স্বীয় জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

সুতরাং সাধারণ বিদ্রোহীরা বাইয়াত হয়ে কেন্দ্রীয় খেলাফতের আনুগত্য স্বীকার করুক, হজরত আলি রা. এর এ চিন্তা ও অভিমত পরিপূর্ণরূপে শরিয়তের আদেশ ও হেকমত অনুযায়ী ছিল। কিন্তু যে খলিফার উপর সবাই আস্থা প্রকাশ করেছিল, তিনি যদি বাইয়াতের পর প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দিতে শুরু করতেন, তবে তাতেও কেউ আপত্তি করতে পারত না।

---

[৩৪০] সুরা মায়েদা, আয়াত ৩৪

قال الشوكانى : لا يكون هذا حكم من فعل اى ذنب من الذنوب. بل من كان ذنبه هو التعدى على دماء العباد واموالهم. (تفسير فتح القدير: ٤١/٢)

وقال وهبة الزحيلى : هذه الآية فى المحاربين من اهل الاسلام وهم الذين خرجوا على الناس بقصد اخذ اموالهم او قتلهم او لإرهابهم، فيختل الامن والسلم. (التفسير الوسيط : ٤٥٣/١)

হজরত উসমান এবং হজরত আলি রা. উভয়ে শরয়ি দলিলের আলোকে ইসলামি রাজনীতিতে একটা সীমার মধ্যে থেকে বিরোধী মতকে মেনে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। হজরত আলি রা. একধাপ অগ্রসর হয়ে এও করেছেন যে, বিদ্রোহীদের থেকে মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং মালেক বিন আশতার নাখায়ির মতো কয়েকজনকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পদও দিয়েছেন। বস্তুত এ উদারতা ছিল ইসলামি রাজনীতি ও খেলাফতে রাশেদার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যার দৃষ্টান্ত সভ্যতার দাবিদার বর্তমান পৃথিবীতেও বিরল।

হজরত উসমানের হত্যাকারীদের গ্রেফতারে কাল-ক্ষেপণের কারণ : বিদ্রোহীদের পাঁচটি শ্রেণি

এটি সুপ্রমাণিত যে, হজরত উসমান রা. কে যারা শহিদ করেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। অন্যরা অবরোধ ও হট্টগোল করেছিল। আর হজরত আলি রা. এর দৃষ্টিতে বাইয়াতের পরপরই এদের সকলকে শাস্তির আওতায় আনার বিষয়টি ছিল ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল অথবা কমপক্ষে বিবেচনাযোগ্য।

আসলে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা ছিল পাঁচ ধরনের। যথা:

১. কিছু লোক সব সময় পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করত এবং তাদেরকে ধরার মতো কোনো প্রমাণ বা আলামত তারা রাখত না। যেমন আবদুল্লাহ বিন সাবা। তাই প্রমাণ বা আলামত ছাড়া এমন লোকদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া যায়?

২. কিছু মানুষের ব্যাপারে তাদেরকে হত্যাকারী বলে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়েছিল। যেমন : হজরত আমর ইবনুল হামিক ও আবদুর রহমান বিন উদায়েস রা.। হজরত আলি রা. তাদের নিরপরাধ হওয়ার বিষয়টি জানতেন। সুতরাং শুধু গুজবে ভর করে এদের থেকে কিসাস নেওয়ার কোনো যুক্তি ছিল না।

৩. কয়েকজন হত্যাকারীকে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলা হয়েছিল। যেমন: কুলসুম বিন তুজাইব, সুদান বিন হুমরান, কুতাইরা বিন হুমরান।[৩৪১]

---

[৩৪১] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮৯ থেকে ৪৯২

৪. ঘটনাস্থল থেকে যেসব হত্যাকারী বেঁচে গিয়েছিল, তারা ছিল পলাতক। বহু বছর পর জানা গেল যে, তারা শাম ও মিসরের সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে আত্মগোপন করে আছে। আর ওই অঞ্চলে কখনোই হজরত আলি রা. এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর যে অতীতের কথা আমরা এখন বলছি, সেই উট-ঘোড়ার যুগে তাদের কোনো চিহ্নও ছিল না।[৩৪২]

৩৪২

فطعنه احدهما بمشقص فى اوداجه وعلاه الآخر بالسيف فقتلوه، ثم انطلقوا هرابا، يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى اتوا بلدا بين مصر والشام، قال فكمنوا فى غار، قال فجاء نبطى من تلك البلاد معه حمار، قال فدخل ذباب فى منخر الحمار، قال فنفر حتى دخل عليهم الغار، وطلبه صاحبه فرآهم فانطلق الى عامل معاوية، قال فاخبره بهم، قال فاخذهم معاوية فضرب اعناقهم.

তারপর তাদের একজন হজরত উসমানের ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল। অপরজন তরবারি হাতে তার বুকে চড়ে বসল। আর ঠিক তখনই তারা হজরত উসমান রা. কে শহিদ করে দিল।

হত্যা করার পর এই খুনিরা পালিয়ে গেল। তারা দিনে লুকিয়ে থাকত, আর রাতে পথ চলত। চলতে চলতে মিসর ও শামের মধ্যবর্তী একটি ছোট্ট শহরে এসে তারা থামল। তারপর সেখানকার একটি পর্বতগুহায় আত্মগোপন করল।

হঠাৎ একদিন ঐ এলাকার এক নাবতি তার গাধা নিয়ে সেখানে এলো। ঘটনাক্রমে গাধার নাকে ঢুকে পড়ল একটা মাছি। ফলে গাধাটি এলোপাথাড়ি ছুটতে ছুটতে খুনিদের গুহায় গিয়ে প্রবেশ করল। ওদিকে গাধার মালিক গাধা খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখে এসে তাদের দেখে ফেলল। তারপর সে গিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর জনৈক কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানাল এবং সে কর্মকর্তা গিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. কে সব জানিয়ে দিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন এবং প্রত্যেকের গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৬৯১)

(بسند صحيح او حسن، رجاله رجال البخارى الا جهيم الفهرى، لكن وثقه ابن حبان)

এ কারণেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন,

فانه لم يقتله الا طائفة قليلة باغية

হজরত উসমান রা. কে হত্যা করেছিল কেবল একটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহী দল।

এরপর ইবনে তাইমিয়া রহ. হজরত উসমান রা. এর হত্যাকণ্ড এবং প্রকৃত অপরাধীদের পলায়নের ঘটনা হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন-

قال ابن الزبير، لعنت قتلة عثمان، خرجوا عليه كاللصوصمن وراء القرية، فقتلهم الله كل قتلة، ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب يعنى هربوا ليلا

৫. আর সর্বশেষ ও পঞ্চম স্তরে ছিল সাধারণ গোলযোগকারী দল। তারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না। বিদ্রোহ আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করেছিল বটে; কিন্তু পরে নতুন খলিফার হাতে নতুন করে বাইয়াত হয়েছিল। হজরত আলি রা. এর মতে নির্বিচারে তাদের উপর কিসাস বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না।[৩৪৩]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বলেন, হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের উপর অভিশাপ হোক। তারা গ্রামের বাইরে থেকে চোরের মতো হজরত উসমানের উপর হামলে পড়ল। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাদের হত্যা করলেন সম্পূর্ণরূপে। তাদের থেকে যে বাঁচল, সে তারার ছায়াতলে বেঁচেছিল। অর্থাৎ তারা রাতে পালিয়ে গেল। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ৬/২৯৬)

প্রাচীন ঐতিহাসিক আলেমদের থেকে এ বর্ণনাটি আবু বকর ইবনুল আনবারি (মৃত : ৩২৮ হিজরি) ইমাম ফাররা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। (আল আযদাদ, পৃষ্ঠা : ৩৪২)

হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. স্বয়ং হজরত উসমান রা. এর পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। আর তার উপরোক্ত বর্ণনা অন্যান্য সহিহ বর্ণনার সমর্থন করে, যেগুলোতে উল্লেখ আছে যে, কয়েকজন হত্যাকারী ঘটনাস্থলেই হজরত উসমান রা. এর ঘনিষ্ঠদের হাতে নিহত হয়েছিল। আর কিছু কোনোরকম বেঁচে দূরদূরান্তের পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে গিয়েছিল।

[৩৪৩] হজরত আলি রা. এর এই ফিকহি মতামতের উল্লেখ বিশিষ্ট হাদিস ব্যাখ্যাকার, ফকিহ ও আকিদাশাস্ত্রের ইমামদের আলোচনায় পাওয়া যায়। নিম্নে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো,

১. ইমাম নাসাফি রহ. লিখেছেন,

والباغى اذا انقاد لامام اهل العدل لا يؤاخذ بما سبق منه من اتلاف اموال اهل العدل وسفك دمائهم وجرح ابدانهم، فلم يجب عليه قتلهم ولا دفعهم الى الطالب

বিদ্রোহী যখন ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য স্বীকার করে, তখন তার থেকে অতীতের অপরাধ যেমন, ন্যায়পরায়ণ মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন, তাদের রক্তপাত ঘটানো, আহত করা ইত্যাদির কোনো বদলা নেওয়া হবে না। সুতরাং এমন বিদ্রোহীদের হত্যা করা কিংবা তাদেরকে (বদলার) দাবিদারদের হাতে ন্যস্ত করা শাসকের উপর আবশ্যক হবে না। (আল ই'তিমাদ ফিল ই'তিকাদ, শরহুল উমদা ফি আকিদাতি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ : পৃষ্ঠা : ৫০২)

২. ঠিক এ বিশ্লেষণটিই লিখেছেন হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. 'কুর্‌রাতুল আইনাইনি ফি তাফযীলিশ শাইখাইন' কিতাবে।

৩. ইমাম ফাখরুদ্দীন রাজি রহ. হজরত আলি রা. এর পক্ষে এ মতের দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন,

طعنوا فيه بانه ما اقام القصاص على قتلة عثمان رضى الله عنه، وهذا ظلم فادح فى امامته.
والجواب : ان شرائط وجوب القصاص تختلف باختلاف الاجتهادات، فلعله لم يؤد اجتهاده الى كونهم موصوفين بالشرائط الموجبة للقصاص.

লোকেরা হজরত আলি রা. এর উপর আপত্তি করেছে যে, তিনি হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের উপর কিসাস বাস্তবায়ন করেননি। সুতরাং তার শাসনামলে এটা ছিল এক জঘন্য অন্যায়।

এর উত্তর এই যে, কিসাস ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি ইজতিহাদের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম হয়। সুতরাং হয়তো হজরত আলি রা. এর ইজতিহাদ অনুযায়ী এটা প্রমাণিত হয়নি যে, ঘটনার সাথে জড়িতদের মধ্যে কিসাস আবশ্যককারী শর্তাবলি বিদ্যমান ছিল। (মাআলিমু উসুলিদ দীন, পৃষ্ঠা : ১৫২)

৪. এমনিভাবে আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানি রহ. বলেন,

وتوقف على رضى الله تعالى عنه ..... عن قصاص القتلة لشوكتهم او لانهم عنده بغاة، والباغى لا يؤاخذ بما اتلف من الدم والمال عند البعض.

হজরত আলি রা. র পক্ষ থেকে হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের কিসাসের বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন হয়তো তাদের শক্তি ও দাপটের কারণে ছিল, অথবা এজন্য ছিল যে, হজরত আলির মতে তারা ছিল বিদ্রোহী। আর কতিপয় মুজতাহিদের মতে যে বিদ্রোহী জান বা মাল ধ্বংস করে, তার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। (শরহুল মাকাসিদ : ৩/৫৩১

এখানে মনে রাখতে হবে যে, এ মত কেবল কতিপয় মুজতাহিদের নয়; বরং অধিকাংশ মুজতাহিদের। চার মাজহাবের ফিকহের কিতাবাদি থেকে এমনটিই প্রমাণিত হয়।)

৫. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর, হজরত আয়েশা প্রমুখ হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের তালাশে ইরাক গমন করেছিলেন। তারপর তারা হজরত আলি রা. এর সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেছেন। তখন হজরত আলি রা. যে মত ব্যক্ত করেছিলেন, সেটি ইবনে হাজার রহ. স্পষ্ট করেছেন এভাবে,

فراسلوه فى ذلك فابى ان يدفعهم اليهم الا بعد قيام دعوى من ولى الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه.

তারা এ সম্পর্কে হজরত আলি রা. এর সাথে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু হজরত আলি রা. ঐ বিদ্রোহীদেরকে তাদের হাতে ন্যস্ত করতে অস্বীকার করলেন। তবে যদি নিহতের ওয়ারিসরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার দাবি করে এবং এটা প্রমাণিত হয় যে, এরাই সশরীরে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, তাহলে তাদেরকে সোপর্দ করা যেতে পারে। (ফাতহুল বারি, ৬/৬১৬)

৬. মহামান্য উসতাদ মাওলানা আবদুর রশিদ নুমানি রহ. (যার থেকে অধম লেখকও উপকৃত হয়েছি) এ সম্পর্কে লিখেছেন, হজরত আলির পক্ষ থেকে কিসাস গ্রহণে

কিসাসের দাবিতে হজরত তালহা, যুবাইর, আয়েশা সিদ্দিকা ও মুয়াবিয়া রা. প্রমুখের ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?

অন্যদিকে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এবং উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এবং শামে হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং তার অনুসারীরা এই মত অবলম্বন করেছিলেন যে, মদিনায় শোরগোল সৃষ্টিকারী ও হজরত উসমান রা. এর বাড়ি অবরোধকারী সকলেই বিদ্রোহ, হত্যাকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতার অপরাধে

বিলম্বের মূল কারণ ছিল মাসআলার শরয়ি রূপরেখা। অর্থাৎ সেখানে মূল হত্যাকারী কে, তা জানা ছিল না। সুতরাং তার উপর কিসাস বাস্তবায়নও সম্ভব ছিল না। আর অন্যদের অবস্থান বিদ্রোহীদের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। আর বিদ্রোহী যখন আনুগত্য স্বীকার করে, তখন তার বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায় না। (বিশ্লেষণের দর্পণে নাসেবি মতবাদ : পৃষ্ঠা : ২৬১)

৭. মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলবি রহ. লিখেছেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. সেই দাঙ্গাবাজদেরকে হত্যাকারী মনে করতেন। পক্ষান্তরে হজরত আলি রা. এর দৃষ্টিতে তারা ছিল বিদ্রোহী। আর বিদ্রোহী যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তার থেকে বিদ্রোহের সময় কৃত কর্মকাণ্ডের কিসাস ও জরিমানা নেওয়া যায় না। (আকায়েদে ইসলাম : পৃষ্ঠা : ১৬০)

৮. মাওলানা সাইয়েদ হামেদ মিয়া রহ. তার এক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার সারকথাও এটাই। (মাসিক আনওয়ারে মদিনা, লাহোর : ২০০৬ এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর সংখ্যা।)

৯. পরিশেষে আনুগত্য স্বীকারকারী বিদ্রোহীদের অপরাধ ক্ষমা করার শরয়ি হেতুটিও জেনে নেওয়া ভালো হবে। মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'এ ক্ষমাপ্রদর্শনের হেতু এই যে, ইসলামে যেহেতু একদিকে ডাকাত (এবং বিদ্রোহীদের) শাস্তি প্রদানে এতটা কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে যে, গোটা দলের কোনো একজন থেকেও যদি কোনো অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে পুরো দলকেই শাস্তি পেতে হয়, তাই অন্যদিকে এ ক্ষমাপ্রদর্শনের মাধ্যমে বিষয়টিকে হালকা করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাওবা করে নাও, তবে দুনিয়ার শাস্তিও ক্ষমা করা হবে।

তা ছাড়া এতে একটি রাজনৈতিক কল্যাণও আছে। তা হলো, একটি শক্তিশালী দলকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। তাই তাদের জন্য উৎসাহের দরজা খোলা রাখা হয়েছে, যাতে তারা তাওবার প্রতি আগ্রহী হয়।

তা ছাড়া এতে এ কল্যাণও আছে যে, মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে একটি চরম ও চূড়ান্ত শাস্তি। আর ইসলামি বিধানের দাবি এই যে, এর বাস্তবায়ন যেন যথাসাধ্য কম হয়। (মাআরিফুল কুরআন : ৩/১২২, ১২৩)

অভিযুক্ত। সুতরাং এদের সকলকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা ওয়াজিব।[৩৪৪]

---

[৩৪৪] পরবর্তী সমস্ত ঘটনা সাক্ষী যে, উল্লিখিত সাহাবিগণের মত এটিই ছিল। অবশ্য তাদের এ মতও কয়েকটি শরয়ি দলিলের আলোকেই গৃহীত হয়েছিল। যেমন,

১. সুনানে তিরমিজিতে বর্ণিত আছে,

لو ان اهل السماء والارض اشتركوا فى دم مؤمن لاكبهم الله فى النار.

অর্থাৎ যদি আসমান ও জমিনের সকল অধিসাবী মিলেও কোনো একজন মুমিনকে হত্যা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (সুনানে তিরমিজি, আবওয়াবুদ দিয়াত)

২. হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর সঙ্গে যখন বসরায় হুকাইম বিন জাবালার সাত শত অনুচরের সাক্ষাৎ হলো, তখন এ বিশিষ্ট সাহাবিগণ এদের সকলকে হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারী এবং কিসাসের উপযুক্ত মনে করছিলেন। এ কারণেই তখন তারা এ দোয়ার শব্দগুলো বলেছিলেন,

الحمد لله الذى جمع لنا ثأرنا من اهل البصرة، اللهم لا تبق منهم احدا، واقد منهم اليوم فاقتلهم.

অর্থাৎ সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি বসরার অধিবাসীদের থেকে আমাদের প্রতিশোধের উপযুক্ত লোকদেরকে একত্র করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ, এদের একজনকেও জীবিত ছেড়ে দেবেন না। আজ এদের থেকে কিসাস গ্রহণ করুন, এবং এদেরকে হত্যা করে ফেলুন। (তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭০)

এ যুদ্ধটি ছিল প্রতিরক্ষামূলক। অর্থাৎ প্রথম আক্রমণ করেছিল হুকাইম বিন জাবালা। তাই সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে লড়াই ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না। কিন্তু তাদের দোয়ার শব্দাবলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, তারা ঐ দলের সকলকে শাস্তির যোগ্য মনে করতেন।

এহেন পরিস্থিতিতে অপরাধী যখন নিজেই তাদেরকে লড়াইয়ের জন্য বাধ্য করল, তখন সাহাবায়ে কেরাম এটাকে কিসাস গ্রহণের উপযুক্ত সুযোগ মনে করে এমন প্রবলভাবে যুদ্ধ করেছেন যে, ঐ সাত শত থেকে কেবল হাতেগোনা দু'চারজনই প্রাণে বাঁচতে পেরেছিল। বাকি সব নিহত হয়েছিল। এরপর হজরত তালহা ও যুবাইর রা. ঘোষণা করে দিয়েছিলেন-

الا من كان فيهم من قبائلكم احد ممن غزا المدينة فليأ تنا بهم.

'যারা মদিনায় হামলা করেছিল, তাদের থেকে একজনও যদি তোমাদের মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসো।'

এ ঘোষণা প্রচার করার পর, বিদ্রোহ-আন্দোলনে অংশ নিয়ে যারা মদিনায় গিয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে ধরে ধরে এনে হত্যা করা হয়েছিল। বর্ণনার শব্দগুলো দেখুন-

فجئ بهم كما يجاء بالكلاب فقتلوا.

আসলে এটি ছিল এই সকল সাহাবির ইজতিহাদি মত। কিন্তু হজরত আলি রা. তখন এই মত যথাযথ মনে করেননি। কয়েক বছর পরে অবশ্য এ বিষয়ক সঠিক শরয়ি কর্মপন্থা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত এই ফিকহি মতবিরোধ রাজনৈতিক বিরোধের কারণ হয়ে ছিল।[৩৪৫]

অর্থাৎ তাদেরকে কুকুরের মতো ধরে আনা হলো এবং সকলকে হত্যা করা হলো। (তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭০)

তারপর এ সফলতার সংবাদ চিঠিতে লেখা হলো,

استبسل قتلة امير المؤمنين، فخرجوا الى مضاجعهم ، فلم يفلت منهم مخبر الا حرقوا ص بن زهير.

(তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭২)

এ বিস্তারিত বর্ণনা যদিও দুর্বল বর্ণনাকারী সাইফ থেকে বর্ণিত, কিন্তু এ বিষয়ে শক্তিশালী সমর্থন আছে। (দ্রষ্টব্য : তাবারি : ৪/৪৬৯, ৪৭০, যুহরি থেকে বর্ণিত, এবং তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৮৩, সিনান বিন সালামা থেকে বর্ণিত।)

[৩৪৫] এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, সামনেও যেখানে 'হজরত উসমানের হত্যাকারী' কথাটি আসবে, সেখানে এর অর্থ এই নয় যে, এদের প্রত্যেকে সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। কেননা সে যুগে 'হজরত উসমানের হত্যাকারী' কথাটি ঐসব লোকের জন্য একটি পরিভাষায় পরিণত হয়েছিল, যারা মদিনায় শোরগোলের সাথে জড়িত ছিল। সম্ভবত এর কারণ এই ছিল যে, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর, উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা, হজরত মুয়াবিয়া রা. প্রমুখের মতে সকল বিদ্রোহীকে হত্যা করা ওয়াজিব ছিল। একারণে তারা বিদ্রোহী দলের সকলকে "قتلة امير المؤمنين" তথা 'হজরত উসমানের হত্যাকারী' বলে স্মরণ করত। আর এভাবেই মদিনায় হাঙ্গামাকারী পুরো দলটি, যাদের সংখ্যা ছিল আড়াই থেকে তিন হাজার, এদের সকলকে 'হজরত উসমানের হত্যাকারী' বলে আখ্যায়িত করা শুরু হয়। কিন্তু এদের মধ্যে মূল হত্যাকারী ছিল দু'চার জন। বাকি সকলে ছিল তাদের সহযোগী ও সহকারী।

এ ব্যাপারটি হজরত তালহা, হজরত যুবাইর, উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা, হজরত মুয়াবিয়া রা.-ও জনতেন যে, প্রত্যেকে সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পুরো বিদ্রোহী দলের উপর 'হত্যাকারী' শব্দটি প্রয়োগ করতেন। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর কয়েকটি দলিলের আলোকে তাদের কাছে এটিই মনে হতো যে, কোনো ব্যক্তির হত্যায় সহযোগী সকলের উপর কিসাস কার্যকর করা হবে, সে প্রাণনাশী আঘাত করুক বা না করুক। ফকিহদের মধ্যেও এমন একটি মত আছে। (আল হুজ্জাতু আলা আহলিল মাদিনা, ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান : ৪/৪০৪, ৪০৫, বাবুল কিসাস ফিল কাত্‌ল)

সাহাবায়ে কেরাম মতানৈক্য কেন করলেন?

হজরত উসমানের কিসাসের বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্য মূলত তিন কারণে হয়েছিল। যথা:

১. প্রকৃতপক্ষে হজরত উসমান রা. এর কিসাসের বিষয়টি ছিল একটি জটিল মাসআলা। কেননা এখানে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং বিদ্রোহ একটির সাথে আরেকটি মিলে গিয়েছিল। আর সূক্ষ্মভাবে বিদ্রোহের সীমা ঠিক কোন পর্যন্ত ছিল আর কোন কোন কাজের উপর ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান প্রযোজ্য হবে এ পার্থক্য করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

২. মতানৈক্যের দ্বিতীয় বড় কারণ ছিল, এ বিষয়ে আগের কোনো দৃষ্টান্ত না থাকা। মুফতি, কাজি ও বিচারকগণ খুব ভালো করে জানেন যে, যখনই কোনো প্রশ্ন, কেস বা মোকাদ্দমা সামনে আসে, তখন তাদের জন্য সবচেয়ে সহজ বিষয় এটাই হয় যে, এজাতীয় মাসআলার উপর আগের কোনো ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত সামনে আছে। কেননা এমন হলে ভুল হওয়ার আশংকা থাকে খুব কম। তা ছাড়া সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতেও সময় কম লাগে।

   কিন্তু ঘটনার ধরন যখন সম্পূর্ণ নতুন হয়, তখন মুফতি, কাজি ও বিচারকদের খুব মুশকিলে পড়তে হয়। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে বিচারকের পূর্ণ আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলাও অসম্ভব বিষয় নয়। হজরত উসমানের কিসাসের বিষয়টি ঠিক এমনই ছিল।

৩. তৃতীয় কারণ এই ছিল যে, বিরাট সংখ্যক সাহাবি হজরত উসমানের কিসাসের মাসআলায় আবেগে উদ্বেলিত ছিলেন। কেননা হজরত উসমান রা. কে যে নির্মমভাবে শহিদ করা হয়েছিল, তা লিখতে গেলে আজো কলম থরথর করে কেঁপে ওঠে। অতি পাষাণ হৃদয়ও কেঁদে ওঠে। তা হলে যারা ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের বিগলিত হৃদয়ের অধিকারী এবং হজরত উসমানের সাথে যাদের ভালোবাসা ছিল পিতা-পুত্রের ন্যায়, তাদের মনের তখন কী অবস্থা ছিল? তাদের জীবদ্দশায়ই তো এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল এবং তাদের ধৈর্যের সকল বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল।

কিন্তু হজরত আলি রা. মাসআলার সূক্ষ্মতা ও জটিলতা উপলব্ধি করে আবেগ ও বেদনাকে একদিকে রেখে অত্যন্ত সাহসিকতা ও সহনশীলতার সাথে শরয়ি দলিল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলেন। আর যেকোনো বিচারের ক্ষেত্রে এটাই শরিয়তের শিক্ষা। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا يقضى الحكم بين اثنين وهو غضبان

কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু ব্যক্তির মাঝে বিচার না করে।[৩৪৬]

একারণেই হজরত উসমান রা. এর কিসাসের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. সফল হয়েছিলেন। কেননা তিনি ইলম, শরিয়তের গভীর জ্ঞান ও ইজতিহাদের পাশাপাশি সংযম ও সহনশীলতার আঁচলও ধরে রেখেছিলেন।

বিচারিক কার্যক্রমে জটিলতা

হজরত উসমানের কিসাসের বিষয়টি যেহেতু একটি নতুন বিষয় ছিল, তাই এ বিষয়ে ইজতিহাদ করাই ছিল একটি কঠিন কাজ। সুতরাং এর বিচারিক কার্যক্রম ছিল আরো জটিল। হজরত আলি রা. হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণের দায়িত্ব কখনোই ভুলে যাননি। কিন্তু কয়েকটি কারণে এর বাস্তবায়ন ছিল একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। যথা :

১. কয়েকজন হত্যাকারীকে ঘটনাস্থালেই মেরে ফেলা হয়েছিল।[৩৪৭] আর যে অপরাধীরা শাম ও মিসরের অধিবাসী ছিল, হত্যাকাণ্ডের পর তারা অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গিয়েছিল।[৩৪৮] ফলে হজরত আলি রা. এর আয়ত্তে তখন এমন কোনো অপরাধী ছিল না, যাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যায়।

---

[৩৪৬] সুনানে আবু দাউদ,. হাদিস : ৩৫৮৯, কিতাবুল আকযিয়াহ, বাবুল কাযি ইয়াকযি ওয়াহুয়া গাযবান।

[৩৪৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৩৯১

[৩৪৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৬৯১, সনদ হাসান

২. হত্যাকারীদের চিহ্নিত করা, গ্রেফতার করা এবং শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য শরয়ি সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল। আর হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখেছে এমন মানুষ ছিলেন কেবল হজরত উসমান রা. এর স্ত্রী নায়েলা, অথবা তার গোলাম। কেননা শাহাদাতের সময় কেবল এ দুজনই ঘটনাস্থলে ছিলেন। কিন্তু গোলাম তো তখনই হত্যাকারীদের সঙ্গে লড়াই করে প্রিয় মনিবের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আর হজরত নায়েলা মূল আক্রমণের সময় হজরত উসমান রা. এর উপর উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনিও মূল অপরাধীদের চিহ্নিত করতে অপারগ ছিলেন। এ কারণে হজরত আলি রা. যখন তার কাছে খুনিদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে কাউকে শনাক্ত করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। কেবল এতটুকু বললেন যে, 'মুহাম্মদ বিন আবু বকর হত্যাকারীদের নিয়ে এসেছিল।'[৩৪৯]

চোখে দেখা সাক্ষীদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া রা. এর গোলাম কিনানা। কিন্তু সে তার বক্তব্য কেবল এতটুকু প্রকাশ করছিল যে, হত্যাকারী মুহাম্মদ বিন আবু বকর নয়; বরং এক কৃষ্ণাঙ্গ, যার নাম ছিল হিমার।[৩৫০]

এ বক্তব্য থেকে একদিকে প্রমাণিত হচ্ছিল যে, মুহাম্মদ বিন আবু বকর ছিলেন নির্দোষ, অন্যদিকে এর দ্বারা মূল হত্যাকারী আরো অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কেননা হিমার নামে কোনো ব্যক্তি ঘটনাস্থলে ছিল না। পক্ষান্তরে যেসব নামের কথা বলা হচ্ছিল, সেগুলো যদিও মুখে মুখে রটে গিয়েছিল; কিন্তু তাদের সম্পর্কে শরয়ি সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। এর কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো মূল

---

[৩৪৯] তারিখুল ইসলাম লিয জাহাবি : ৩/৪৬০

عن سعيد بن المسيب....

মূলত এটি একটি দীর্ঘ প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুর্বল বর্ণনা থেকে চয়নকৃত সাহাবায়ে কেরামের নিন্দামুক্ত খণ্ডাংশ। তাই আমরা এ অংশটুকু গ্রহণ করেছি। নতুবা এ বর্ণনার অন্যান্য বহু অংশ সাহাবায়ে কেরামের নিন্দাবাদের দোষে দূষিত। তদুপরি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার দরুন তা গ্রহণযোগ্য নয়। সেই সন্দেহপূর্ণ খণ্ডাংশগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনার শেষে 'সংশয় নিরসন' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করব।

[৩৫০] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৭৫

হত্যাকারী মুখোশ পরে ভেতরে এসেছিল, তাই তাকে চিনতে এত ঝামেলা হচ্ছে। অথবা হতে পারে হিমার ইত্যাদি ছিল ছদ্মনাম। আসল নাম অন্যকিছু। আবার এও হতে পারে যে, হত্যাকারীরা অন্যদের নামে নিজেদের নামকরণ করেছিল, যাতে হত্যাকাণ্ডের পর সেই নিষ্পাপ লোকগুলোই ধরা পড়ে, আর আসল খুনিরা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে।

৩. নবুওয়াতের যুগ থেকে ইসলামি রাজনীতির একটি ব্যতিক্রমী নিয়ম চলে আসছিল যে, কোনো অপরাধীর ব্যাপারে যতই সন্দেহ হোক না কেন, চাপ প্রয়োগ করে তার থেকে অপরাধের স্বীকারোক্তি নেওয়া হতো না। একইভাবে আদালতের বাইরে প্রতিশোধ বা শাস্তির জন্য তাকে টার্গেটও করা হতো না।

   এ নিয়মের প্রতি লক্ষ রাখতে গিয়ে খোদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুনাফিকদের থেকে এবং পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামকে গাদ্দারদের থেকে বহু আঘাত ও যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। কিন্তু তারপরও ক্ষমতার সুবিধার উপর সব সময় শরয়ি আইনের কর্তৃত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

   সুতরাং হজরত আলি রা. যদি চাইতেন তা হলে ক্ষমতাবলে চাপে ফেলে সন্দেহভাজন কয়েকজনের থেকে অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারতেন। কিন্তু শরিয়তের আইনের ধারা ও প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তিনি সে পথ অবলম্বন করেননি। মূলত এটি ছিল সাহাবা-যুগের ইসলামি রাজনীতির এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে অন্য কোনো সংবিধানের অনুসারী কোনো সমাজ বা সভ্যতা হয়তো কখনোই ইসলামের সমকক্ষ হতে পারবে না।

৪. বিভিন্ন কারণে মদিনা শহরটি সেনাছাউনির জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাই এখানে কোনো বাহিনী রাখা হতো না। একারণেই হজরত উসমান রা. এর বাড়ি অবরোধের সময় এখানে মাত্র কয়েক শ' সশস্ত্র সৈনিক উপস্থিত ছিল। হজরত আলি রা. খেলাফত লাভের পরও তাতে কোনো সংযোজন করা হয়নি। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই কয়েক শ' সৈনিক নিয়ে হজরত আলি রা. হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম ছিলেন না।

৫. যদি ধরে নেওয়া হয় যে, হজরত আলি রা. তৎক্ষণাৎ দু'চারজনকে গ্রেফতার করে কিসাসস্বরূপ হত্যা করে দিতে পারতেন, তবু তা হতো নিরর্থক। কেননা কিসাসের দাবি উত্থাপনকারী মুসলমানগণ অবরোধে অংশগ্রহণকারী সবাইকে শাস্তিযোগ্য মনে করতেন। সুতরাং দু'চারজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলে তারা কোনোভাবেই আশ্বস্ত হতেন না।

ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক জটিলতা

তা ছাড়া ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা দুষ্কর ছিল। কেননা এমন দ্রুত পদক্ষেপের ফলে বড় ধরনের চারটি ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। যথা :

১. হজরত আলি রা. এর দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং বিদ্রোহ মিশ্রিত এই মামলাটি ছিল গভীর চিন্তার দাবিদার একটি সূক্ষ্ম বিষয়। তাই এতে শরয়ি দলিল সম্পর্কে আরো গবেষণা এবং উম্মাহর ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্য আবশ্যক ছিল। যদি কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া সকল বিদ্রোহীকে হত্যা করা হতো, তা হলে তাতে শরিয়তের সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

২. যেসব বিদ্রোহী দু'দিন পূর্বে ছলে-বলে-কৌশলে শান্তিকামী হয়েছিল, তাৎক্ষণিক কোনো পদক্ষেপ নিলে তারা হয়তো অন্যায় পক্ষপাতের উন্মাদনায় দিশেহারা হয়ে তাদের অপরাধী সঙ্গীদের উপর দণ্ডপ্রয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করত। ফলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হতো এবং রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তা আরো হুমকির মুখে পড়ত।

৩. বিদ্রোহের মূল হোতারা তৎকালীন সময়ে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে খুব দাপুটে ছিল। যেমন: আশতার নাখায়ি কুফায়, হুকাইম বিন জাবালা বসরায় এবং মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফা মিসরে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল। এদের থেকে কোনো কোনো সরদার হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়েছিল। ফলে তাদেরকে বশীভূত করা কিংবা রাজনীতির অঙ্গনে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করা এতটা সহজ ছিল না। বরং এ পথে হাঁটলে খেলাফতের মসনদও উলটে যেতে পারত এবং গোটা মুসলিমবিশ্বই হয়তো এক নতুন বিপর্যয়ের মুখে পড়ত।

৪. দ্রুত কিসাসের সিদ্ধান্ত নিলে আরেকটি যে সমস্যা হতে পারত তা হলো, অন্যদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, তারা অবশ্যই বিচারিক কার্যক্রমের মধ্যেও বিঘ্ন ঘটাত। আর এর ফলে ষড়যন্ত্রের মূল হোতারা আরো দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত। পরে তারা হয়তো অন্য কোনো বেশ ধরে নতুন ফেতনা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাত।

মোটকথা হজরত উসমান রা. এর কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুধু যে শরয়ি ও আইনি নিয়মের পরিপন্থি এবং ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ হতো তা-ই নয়; বরং এমন সিদ্ধান্ত হতো খোদ মজলুম ও শহিদ খলিফার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থি, যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এজন্য হজরত আলি রা. চাচ্ছিলেন, হজরত উসমান রা. এর কিসাস এমন এক সময় ও পরিবেশে গ্রহণ করবেন, যখন প্রকৃত অপরাধীদের লুকিয়ে থাকারও সুযোগ থাকবে না, আবার সরকারি ও আদালতি ফয়সালার সম্মুখে কেউ অস্বীকার করার দুঃসাহসও পাবে না।

মূলত হজরত আলি রা. মানবীয় স্বভাব ও তার দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন, এজাতীয় মিথ্যা আন্দোলন, ষড়যন্ত্রমূলক গোলযোগ ও লম্ফঝম্ফের অন্তঃসারশূন্য মিছিলের জোয়ার কিছুদিন পর আপনা থেকেই নিস্তেজ হয়ে যায়। কিন্তু যদি বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোলকারীদের সাথে পাল্লা দিয়ে অপর পক্ষও আবেগ বা ক্রোধে উন্মাতাল হয়ে প্রজ্ঞা পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, তা হলে বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে নতুন বাহানা বানিয়ে আরো বেশি দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা ঘটাতে শুরু করবে।

পক্ষান্তরে যদি কল্যাণ ও কৌশলের দাবি অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা হয়, তা হলে অজ্ঞ সাধারণ মানুষের সাময়িক জোশ ও আবেগ এক সময় উবে যায় এবং মিথ্যে স্লোগানের উসকানিতে জড়ো-হওয়া-জনতাও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাদের সংঘবদ্ধ অবস্থা ভেঙ্গে যাওযার পর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তাদের দিকে হাত বাড়ানো যেমনি সহজ হয়ে থাকে, তেমনি এর দ্বারা সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও অধিক হয়ে থাকে।

কিসাসের বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের চার স্তর

হজরত উসমান রা. এর কিসাসের ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. এর চিন্তা ও সহনশীলতা ওই সময় তেমনি ছিল, যেমন ছিল স্বয়ং আল্লাহর নবীর ইনতেকালের সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর অবস্থা। পক্ষান্তরে অন্য সবাই ছিলেন আবেগে উদ্বেলিত। সকলের মোকাবেলায় হজরত আলি ছিলেন দুর্ভেদ্য পাথরের ন্যায় অটল। আবেগ ও বেদনার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি আঁকড়ে ধরে ছিলেন শরিয়ত ও সুস্থ চিন্তার বাগডোর। তার কর্মপন্থা ছিল সূক্ষ্ম দর্শন ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার উপর স্থাপিত। কিন্তু অন্যদের কর্মপন্থা ছিল প্রবল আবেগের বহিঃপ্রকাশ। তাই তারা হজরত আলি রা. এর কর্মপন্থা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। এ কারণে ওই সময় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে চারটি মত সৃষ্টি হয়েছিল। যথা:

১. একটি দল হজরত আলি রা. এর কথা মেনে নিলেন।
২. একটি দল হজরত আলির হাতে বাইয়াত হয়ে নির্জনবাসী হয়ে গেলেন।
৩. একটি দল হজরত আলির হাতে বাইয়াত করেও ইনসাফের দাবিতে অস্ত্র ধারণ করলেন।
৪. আর একটি দল বাইয়াতই মুলতবি রাখলেন।

এদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহর কল্যাণকামনা। কারো সম্মুখেই ব্যক্তিস্বার্থ ছিল না। নিম্নে বিষয়টি বিস্তারিত পেশ করা হলো।

প্রথম স্তর

প্রথম স্তরে ছিলেন তারা, যারা হজরত আলি রা. এবং তার কর্মকৌশলের সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা পোষণ করেছিলেন, যারা কিসাস গ্রহণের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতেন, কিন্তু তার আগে তারা বিষয়টির পূর্ণ যাচাই-বাছাই, শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং মুসলমানদের হৃত ঐক্য ফিরিয়ে আনা আবশ্যক মনে করতেন। এ দলে ছিলেন হজরত আম্মার বিন ইয়াসির, হজরত উসমান বিন হুনাইফ, হজরত সাহল বিন হুনাইফ, হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হজরত হাসান, হজরত হুসাইন এবং হজরত কা'কা বিন আমর রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবি।

দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন ওই সকল সাহাবি, যারা হজরত আলির হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন বটে; কিন্তু তারা মনে করতেন হজরত আলির জন্য দ্রুত বিদ্রোহীদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা উচিত। যদি তিনি এটা করতে অক্ষম হন, তা হলে আমরা নিজেরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নেব। এটি ছিল হজরত তালহা, হজরত যুবাইর এবং হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর মত।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তরের নিকট হজরত উসমান রা. এর কিসাস গ্রহণের বিষয়টি বাইয়াতের চেয়ে অগ্রগণ্য ছিল। তাদের মতে বিদ্রোহীদের থেকে কিসাস নেওয়া ছাড়া হজরত আলির অবস্থান সংশয়পূর্ণ। তাই তাদের দাবি ছিল, হজরত আলি যদি কিসাস গ্রহণ করেন, তা হলে আমরা তার হাতে বাইয়াত হব, নতুবা নয়। এটি ছিল হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং শামের অধিবাসীদের মত।

চতুর্থ স্তর

চতুর্থ ছিলেন ওই সকল সাহাবি, যারা মুসলমানদের পারস্পরিক রাজনৈতিক বিরোধ ও বিতর্ক থেকে নিবৃত্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাতে নিজের জবান ও মুখ থেকে অন্যদের কষ্ট দেওয়ার সুযোগই না ঘটে। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবি থেকে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হজরত সাঈদ বিন যায়েদ-সহ হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত উসামা বিন যায়েদ এবং অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবির মত এটিই ছিল।[৩৫১]

---

[৩৫১] এ ছাড়াও হজরত সুহাইব রুমি, হজরত আবু মুসা আশআরি, হজরত হাসসান বিন সাবেত, হজরত বুরাইদাহ বিন হুসাইব, হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা, হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ, হজরত সালামা ইবনে আকওয়া, হজরত কা'ব বিন মালেক, হজরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ, হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ, হজরত আবু সাঈদ খুদরি, হজরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, হজরত নুমান বিন বাকির, হজরত যায়েদ বিন সাবিত, হজরত রাফে বিন খাদিজ, হজরত ফাজালা বিন উবাইদ, হজরত আবু সা'লাবা, হজরত কা'ব বিন উজরা প্রমুখ রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে বিচ্ছিন্নতা

মূলত এসব ব্যক্তির সামনে ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফেতনা বিষয়ক বিভিন্ন হাদিস, যাতে এ ধরনের পরিস্থিতিতে নীরবতা ও পৃথকতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা. এর ন্যায় প্রখ্যাত অসিযোদ্ধা ওই সময় স্বীয় তরবারি ভেঙ্গে ফেলে মদিনা থেকে দূরে রাবজা নামক গ্রামে তাঁবু গেড়ে নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। কেউ যদি তাকে বলত, মানুষকে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করুন, তিনি বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, 'যখন বিরোধ, বিশৃঙ্খলা এবং মতপার্থক্যের সময় হবে, তখন নিজের তরবারি ভেঙ্গে ফেলবে, তির ভেঙ্গে ফেলবে, কামানের রশি কেটে দেবে এবং ঘরের ভেতর বসে থাকবে।' আমি তা-ই করেছি।[৩৫২]

ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে সাধারণত অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অনুল্লেখ থেকে যান। এজন্যই হয়তো হজরত উসমান রা. এর শাহাদাত-পরবর্তী

অবলম্বন করেছিলেন। এদের থেকে অধিকাংশ ব্যক্তিই জীবনের শেষ পর্যন্ত এ মতাদর্শের উপরই ছিলেন।

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, রাজনীতি থেকে পৃথক থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা বাইয়াতও করেননি। বরং সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী নির্জনবাসী অধিকাংশ মুহাজির ও আনসার সাহাবি হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। অবশ্য এদের থেকে কেউ কেউ কার্যত হজরত আলিকে সহযোগিতা করেননি। (আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, পৃষ্ঠা : ১৫০) আবার কিছু এমনও ছিলেন, যারা বাইয়াতই হননি। কিন্তু এরই সাথে হাদিসের কিতাবে একাধিক বর্ণনা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বাইয়াত বা সহযোগিতা থেকে বিরত থাকা সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তীতে হজরত আলি রা. এর মতই সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করেছিলেন। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. পরে বলতেন,

والله انه لرأى رأيته وأخطأ رأيي

আল্লাহর কসম, সেটি ছিল একটি অভিমত, যা আমি গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল। (মুসতাদরাকে হাকিম, বর্ণনা নম্বর : ৪৬০১)

এমনিভাবে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. সম্পর্কেও বর্ণিত আছে, জীবনের শেষদিকে তিনি তার মতকে ভুল মনে করে ভীষণ অনুতপ্ত ছিলেন। তিনি বলতেন:

ما آسى على شيئ الا انى لم اقاتل مع على رضى الله الفئة الباغية.

আমি কোনো কিছুর জন্য আফসোস করি না। তবে শুধু এজন্য আফসোস হয় যে, হজরত আলি রা. এর সঙ্গে আমি বিদ্রোহীদের বিপক্ষে লড়াই করিনি। (মুসতাদরাকে হাকিম, বর্ণনা নম্বর : ৬৩৬০)

[৩৫২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬০২৯

ইতিহাসে বিশিষ্ট সাহাবিদের উল্লিখিত দলটির আলোচনা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। অথচ এরা ঘটনার পরও বহু বছর জীবিত ছিলেন। তবে তাদের অধিকাংশ সময় কেটেছে ইলমি ব্যস্ততা, জিকির, ইবাদত ও দীনি খেদমতে। এ কারণেই হাদিস ও ফিকহের তথ্যভাণ্ডারে তাদের নাম অমর হয়ে আছে। এটাই হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, শরিয়ত সংরক্ষণ করার জন্য একটি দল নিবেদিতপ্রাণ থাকবে এবং এ ধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর অস্থিরতা এবং হজরত আলি রা. এর পরামর্শ

মদিনার বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত হজরত তালহা ও যুবাইর রা. হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হওয়া সত্ত্বেও কিসাসের বিষয়ে তার চিন্তা ও নীরবতার কারণে খুব চিন্তিত ছিলেন। তারা হজরত আলির অপারগতার বিষয়টি বুঝতে পারছিলেন না। অবশেষে একদিন তারা হজরত আলির নিকট উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহীদের নির্বিঘ্নে সর্বত্র ঘুরে বেড়ানোর কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

আমিরুল মুমিনিন বিজ্ঞোচিতভাবে বললেন, দেখুন, এই বিদ্রোহীদের সাথে মানুষের গোলাম ও গ্রাম্য লোকেরাও শামিল আছে। তারা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনাদেরকে কোণঠাসা করে রেখেছে। তা হলে বলুন, আপনারা যা চাচ্ছেন, তার শক্তি ও সামর্থ্য কি আপনাদের আছে?

তারা দুজন একযোগে বললেন, না।

তখন আমিরুল মুমিনিন তাদেরকে শান্ত করে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি এর একটি সমাধান দেখতে পাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, সময় হলে আপনারা তা দেখতে পাবেন।'

তারপর হজরত আলি রা. ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, কিসাসের বিষয়টি নিয়ে যদি এখন নাড়াচাড়া করা হয়, তা হলে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কিছু মানুষ আপনাদের মতের সাথে একাত্ম হবে, আর কিছু বিরুদ্ধে চলে যাবে। আর কিছু মানুষ আপনাদের পক্ষেও যাবে না,

বিরোধীদের পক্ষেও থাকবে না। সুতরাং মানুষকে শান্ত হতে দিন, মানুষের হৃদয় স্থির হতে দিন।[৩৫৩]

হজরত আলি রা. এর কথার মর্ম এই ছিল যে, এখন পরিস্থিতি গোলযোগপূর্ণ। মানুষের কান নিত্যনতুন খবরের জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোনো পদক্ষেপ নিলেই ফেতনাবাজরা পূর্বের ন্যায় আবার গুজব, অপপ্রচার ও বানোয়াট কথার মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হলে গোলযোগ সৃষ্টি করা এত সহজ হবে না।

ইতিহাস সাক্ষী, আমিরুল মুমিনিনের এই আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

গোলাম ও দাঙ্গাবাজদের মদিনা থেকে বহিষ্কার

মদিনার দুষ্কৃতিকারীদের সিংহভাগ ছিল সাধারণ গ্রাম্য, অজ্ঞ ও গোলাম, যারা হট্টগোল পাকানো এবং লুটতরাজে ভাগ বসানোর জন্য মদিনায় এসেছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য হজরত আলি রা. অনতিবিলম্বে এদেরকে মদিনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন। তিনি এদের উপর কোনো অপরাধের শাস্তি প্রয়োগ করলেন না, যাতে তারা নিশ্চিন্ত মনে দল ছেড়ে দেয়। অবশেষে তা-ই হলো। তাদের একটি বড় সংখ্যা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেল। কুফা, বসরা ও মিসরের বিদ্রোহীরাও ফিরে গেল। শুধু সাবায়িদের একটি ক্ষুদ্র দল মদিনায় থেকে গেল, যারা নেতাদের প্রতি ভীষণ ভালোবাসার দাবি করত।[৩৫৪]

হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর কর্তৃক ইরাক থেকে বাহিনী ডেকে পাঠানোর পরামর্শ

এ সময় হজরত তালহা রা. এবং হজরত যুবাইর রা. এর সঙ্গে হজরত আলি রা. এর আরো বিভিন্ন পরামর্শ হয়। হজরত তালহা রা. বসরায় এবং হজরত যুবাইর রা. কুফায় গমনের অনুমতি প্রার্থনা করেন, যাতে সেখান থেকে সৈন্যবাহিনী এনে খেলাফতের ভিত্তি আরো দৃঢ় এবং

---

[৩৫৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩৭ সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৫৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩৮ সাইফ থেকে বর্ণিত।

দাঙ্গাবাজদের ভীত করে রাখা যায়। কিন্তু হজরত আলি রা. অনুমতিও দেননি, নিষেধও করেননি। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, 'চিন্তা করে বলব।'[৩৫৫]

মূলত সাময়িক সময়ের জন্য কুফা ও বসরা থেকে সৈন্য ডেকে আনা হজরত আলি রা. এর মতে সমস্যার সমাধান ছিল না। কেননা মদিনায় আলাদাভাবে সৈন্য মজুদ রাখলে মদিনা হয়ে যেত সেনাছাউনি। ফলে দেখা যেত, মদিনাবাসীকে সৈনিকদের প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধার স্বার্থে অনেক নিয়ম-নীতি পালন এবং নানান ঝামেলা পোহাতে হতো। আর এই আশঙ্কার কারণেই হজরত উসমান রা.-ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষ থেকে মদিনায় শামের সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। হজরত আলি রা. এর সম্মুখেও ঠিক এটিই ছিল।

ইরাকে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত কেন নিলেন?

হজরত আলি রা. এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মদিনায় সৈন্যবাহিনী মজুদ রাখার চেয়ে কোনো সেনা-চৌকির দিকে সরে গিয়ে সেটিকেই খেলাফতের রাজধানী বানিয়ে নেওয়া উত্তম। আর এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান ছিল ইরাক। কেননা সেখান থেকে দুটি সেনা-চৌকি– কুফা ও বসরা ছিল কাছাকাছি।

ইরাকে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ চিন্তাও ক্রিয়াশীল ছিল যে, যেভাবে হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, সেভাবে যদি ভবিষ্যতেও কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয় এবং মদিনাতেই তার হাঙ্গামা দেখা দেয়, তা হলে দ্বিতীয়বারের মতো এ পবিত্র শহরের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। অতএব, মদিনার পবিত্রতা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এটাই ছিল যে, একে পরিপূর্ণভাবে একটি 'ধর্মীয় কেন্দ্র' হিসেবে অক্ষত এবং রাজনৈতিক দেন দরবার থেকে একে সর্বদা পৃথক রাখতে হবে। কেননা রাজনীতি যেকোনো সময় ঝগড়া ও লড়াইয়ের রূপ লাভ করতে পারে।

এ সিদ্ধান্তের পেছনে আরো যে কারণটি কার্যকর ছিল তা এই যে, ইরাক থেকে দূরদূরান্তের রণক্ষেত্রে ইসলামি বাহিনী প্রেরণ ও যোগাযোগ রক্ষা

---

[৩৫৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩৮; সাইফ থেকে বর্ণিত।

সহজ হবে। কেননা তৎকালীন মদিনা ছিল চারদিকে মরুভূমি-বেষ্টিত একটি দূরবর্তী নগরী। অন্যদিকে কুফা ছিল প্রচুর সেনাসংবলিত এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় অধিক উপযুক্ত একটি জনবহুল শহর। আর ইসলামের ন্যায় একটি বিশ্বব্যাপী শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক অবকাঠামো এবং বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য নিঃসন্দেহে এটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মদিনার পরিবর্তে কুফাকেই রাজধানী নির্বাচন করা হবে। কিন্তু সবকিছু নিয়ে কুফায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার জন্য হজরত আলি রা. একটি উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন।[৩৫৬]

হজরত আলি রা. বিদ্রোহীদের পদে বসালেন কেন?

হজরত আলি রা. আরো চাচ্ছিলেন, যেসব লোক মদিনায় বিশৃঙ্খলা ঘটানোর অপরাধে জড়িত ছিল, তারা যেন আবার কোনো হট্টগোলে জড়াতে না পারে। আর এর পদ্ধতি এটাই হতে পারত যে, এদেরকে

---

[৩৫৬] এখানে একটি সম্ভাবনা ধরে নেওয়া যায় যে, হজরত আলি রা. কে কুফায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেখানকার নেতৃবর্গ, যেমন আশতার নাখায়ি এবং সাবায়িদের পরামর্শের ভূমিকা ছিল। কিন্তু আমি (লেখক) এর পক্ষে কোনো সহিহ বর্ণনা পাইনি। কেবল একটি দুর্বল বর্ণনা আছে, যেখানে হজরত হাসান রা. হজরত আলি রা.কে বলছিলেন,

قد كنت انهاك عن هذا المسير، فغلبك على رأيك فلان وفلان.

আমি আপনাকে এ যাত্রা থেকে বারণ করেছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক আপনার মতের উপর প্রবল হয়ে পড়েছিল। (মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৪৫৫৭)

কিন্তু এ বর্ণনার সমস্যা হলো, এতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে নানারকম দোষচর্চা করা হয়েছে। তা ছাড়া হাফেজ জাহাবি রহ. সংযুক্তির মধ্যে এর বর্ণনাকারী 'বাশ্শার বিন মুসা'কে বলেছেন 'অদ্ভুত ব্যক্তি'।

হজরত আলি রা. এর প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা প্রমাণ করে বুঝাতে হয় না। সুতরাং সাবায়িদের ক্ষুদ্র একটি দলের পক্ষে হজরত আলি রা. এবং তার সঙ্গে হাজার হাজার অভিজ্ঞ সাহাবি ও তাবেয়িকে আঙুলের ইশারায় পরিচালনা করাও একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যে কুফায় হজরত আলি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেখানে সাবায়িদের লোকজন ছিল বটে; কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এক থেকে দেড় শতাব্দী পর্যন্ত কুফানগরী সাহাবি ও তাবেয়িদের প্রাণকেন্দ্র ছিল। হানাফি ফিকহ সর্বপ্রথম কুফাতেই সঙ্কলন করা হয়েছিল। তা ছাড়া হজরত আলি রা. এর সেই চিঠি থেকে কুফাবাসীর প্রশংসা জানা যায়, যা যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। আর তার দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, হজরত আলি রা. নিজের ইচ্ছায় কুফা গমন করেছিলেন।

সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে রাখা, শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে তাদের অতীত ভুল থেকে চোখ বন্ধ করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের উপর আস্থা দেখানো।

হজরত আলি রা. এমনটিই করেছিলেন, যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপে।

হজরত উসমান রা. এর কর্মকর্তাদের কেন বরখাস্ত করলেন?

হজরত আলি রা. এর সম্মুখে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল হজরত উসমান রা. এর নিয়োগকৃত শাসকদের বহাল রাখা বা অব্যাহতি দেওয়া। এ সময় হজরত মুগিরা বিন শু'বা রা. হজরত আলি রা.কে পরামর্শ দিয়ে বলেন, হজরত মুয়াবিয়া, হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের এবং হজরত উসমান গনি রা. এর নিয়োগকৃত গভর্নরদের আপনি বহাল রাখুন। যখন এরা এবং এদের সৈন্যবাহিনী বাইয়াত ও অঙ্গীকার করবে, তখন আপনি চাইলে তাদের বহালও রাখতে পারবেন অথবা পরিবর্তনও করতে পারবেন।

হজরত আলি রা. এবারও হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, 'ভেবে দেখব'।

পরে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসও এমনই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু হজরত আলি রা. গ্রহণ করেননি।[৩৫৭]

হজরত মুগিরা রা. এর পরামর্শ আপন স্থানে সম্পূর্ণ সঠিক ও কল্যাণমূলক ছিল। কারণ, কোনো প্রতিষ্ঠানে এমন হয় না যে, নতুন কোনো পরিচালক আসামাত্রই পূর্বের সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হজরত আলি রা. হজরত উসমান

---

[৩৫৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৩৮, সাইফ থেকে বর্ণিত।
এরপর হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. জনবিচ্ছিন্ন হয়ে তার মাতৃভূমি তায়েফে চলে গিয়েছিলেন। 'তাহকিম'-এর ঘটনার পর তিনি শামে গমন করেন এবং সেখানকার শাসনব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩৫৮, হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. র জীবনীর আলোচনা, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/২৯, হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. র জীবনীর আলোচনা।)

রা. এর নিযুক্ত সকল প্রশাসককে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিলেন। এখন যদি তৎকালীন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তা হলে এ সিদ্ধান্তের কয়েকটি কারণ সামনে আসে। যথা:

১. অন্যান্য শাসনব্যবস্থার মতো খেলাফতে রাশেদাকে টিকিয়ে রাখার জন্যও তখন জনবল ও জনসমর্থন অর্জনের প্রয়োজন ছিল। বিশেষত ওইসব মানুষের আস্থা ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যারা প্রথমবারের মতো বনু হাশেমের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে আনন্দিত হয়েছিল। তন্মধ্যে কিছু সরদার এমনও ছিল, যারা হজরত উসমান রা. এর গভর্নরদের থেকে পদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা তাতে বসতে চাচ্ছিল। কেননা এসব গভর্নর ওই লোকদের অর্থ ও পদলিপ্সা চরিতার্থ করার পথে বাধা হয়ে ছিল।

   হজরত আলি রা. তার গভীর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে এসব লোকের চালাকি বুঝতে পারতেন। কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন তারা যেন সেটা টের না পায়। তারপর তিনি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ হজরত উসমান রা. এর গভর্নরদের বরখাস্ত করে তাদের স্থানে অন্যান্য সাহাবিকে নিযুক্ত করলেন। এর ফলে ওই সব গোত্রপতিও একরকম সান্ত্বনা পেল যে, তাদের দাবি পূরণ করা হয়েছে। আবার মূল শাসনব্যবস্থা সাহাবায়ে কেরামের হাতেই রক্ষিত থাকল এবং ঊর্ধ্বতন পদগুলোতে বিশ্বস্ত ব্যক্তিরাই সমাসীন থাকলেন।[৩৫৮]

---

[৩৫৮] হজরত আলি রা. কুফার গভর্নর পদে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কয়েক মাস পর্যন্ত বহাল রাখেন। (আনসাবুল আশরাফ : ২/২৩০) তারপর জঙ্গে জামালের পূর্বে কারাযা বিন কা'ব আনসারি রা. কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর জঙ্গে সিফফিনের পূর্বে এ দায়িত্ব হজরত আবু মাসউদ আনসারি রা. কে অর্পণ করেন।
এমনিভাবে মক্কায় প্রথমে খালেদ ইবনুল আস রা. র স্থলে হজরত আবু কাতাদা আনসারি রা. কে, এবং পরে কুসাম বিন আব্বাস রা. কে নিযুক্ত করেন।
ইয়ামানে সুমামা বিন আদি রা. এর স্থলে উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কে নিযুক্ত করেন।
বসরা থেকে আবদুল্লাহ বিন আমের রা. কে বরখাস্ত করে উসমান বিন হুনাইফ রা. কে নিযুক্ত করেন। জঙ্গে জামালের পর এ দায়িত্ব হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কে ন্যস্ত করেন। (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২০০-২০১)
মোটকথা, পূর্বনিযুক্ত সাহাবিদের স্থলে অন্য সাহাবিদেরকেই নবনিযুক্ত করে হজরত আলি রা. একটি ভারসাম্যপূর্ণ যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যা তৎকালীন

২. তা ছাড়া হজরত উসমান রা. এর গভর্নরদের থেকে হজরত আলি রা. আশঙ্কা করছিলেন, পূর্ববর্তী খলিফার অস্বাভাবিক ভক্তি ও ভালোবাসা এবং তার নির্মম শাহাদাতের দরুন অসহনীয় দুঃখ-যাতনার ফলে তারা কোনো আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত বা তাড়াহুড়া করে কোনো পদক্ষেপ নিয়ে ফেলতে পারে, যার ফলে শরিয়তের সীমা লঙ্ঘিত হবে। অথবা হতে পারে এর ফলে অন্যদের ক্রীড়নক হয়ে কাজ-করা কিছু অপরাধী মারা পড়বে; আর আসল অপরাধী আরো অন্তরালে চলে যাবে।

৩. দাঙ্গাবাজরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে চাউড় করে দিয়েছিল যে, হজরত উসমান রা. এর হত্যার পেছনে হজরত আলি রা. এর পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। বিভিন্ন এলাকার গভর্নর, যারা ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে ছিল, তারা এসব গুজব থেকে প্রভাবিত না হয়ে পারছিল না।[৩৫৯]

সময়ে এতটাই সফল উদ্যোগ ছিল যে, এর পরে অর্থ ও পদলিপ্সু দুষ্ট লোকেরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। আশতার নাখায়ি শেষ পর্যন্ত আশাবাদী ছিল যে, আর কিছু না হোক, বসরার গভর্নরের পদটি অন্তত সে পাবে।

কিন্তু হজরত আলি রা. যখন সেখানেও হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.কে নিযুক্ত করলেন, তখন আশতার নাখায়ি একদিন এক ভরা মজলিসে একটি ক্রূর হাসি দিয়ে বলেছিল, তাহলে কে জানে, আমরা মদিনার সেই মহান ব্যক্তিকে কেন হত্যা করেছিলাম? (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৫৭.) তার কথার মর্ম ছিল, আমাদের দলটি অনর্থক গুনাহর বোঝা মাথায় চাপিয়ে নিল। হাতে কিছুই পেল না।

[৩৫৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪২, সাইফ থেকে বর্ণিত; ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বর্ণনা করেন,

ان اقواما شهدوا عليه بالزور عند اهل الشام انه شارك في دم عثمان.

কিছু মানুষ শামবাসীর কাছে হজরত আলি রা. র বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল যে, হজরত আলি হজরত উসমানের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৪০৬) কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী এসব মিথ্যুকের মধ্যে 'হাজ্জাজ বিন খুজাইমা' নামক জনৈক ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সে মদিনা থেকে শামে গিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সম্মুখে এ শোকগাথা পাঠ করল :

ان بني عمك عبد المطلب ...... هم قتلوا شيخكم بغير الكذب.

নিঃসন্দেহে আপনার চাচা আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা আপনার শায়েখ (হজরত উসমান রা.) কে হত্যা করেছে। এ কথায় কোনো মিথ্যা নেই। (আল আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা : ১৫৫)

এই অবস্থায় হজরত আলি রা. নিশ্চিত ছিলেন যে, সাবেক প্রশাসনের গভর্নরগণ বর্তমান খেলাফতের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারবে না। ফলে তাদের দিয়ে শাসন পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এ চিন্তা থেকেই হজরত আলি রা. শাম ও ইরাকের বর্তমান গভর্নরদের অব্যাহতির আদেশ জারি করে তাদের স্থানে এমন কিছু লোক নিযুক্ত করেন, যারা তার প্রতি আস্থাশীল ছিল। এর দ্বারা সাবেক গভর্নরদের মনোভাবও যাচাই হয়ে যেত যে, তারা হজরত আলির প্রতি আস্থাশীল কি না। যদি আস্থাশীল প্রমাণিত হতো, তা হলে তাদেরকে ভিন্ন কোনো দায়িত্বও দেওয়া যেত।

কিন্তু পরে দেখা গেল, হজরত আলি রা. এর আশঙ্কাই সত্য। প্রবীণ গভর্নরদের অব্যাহতিপত্র পৌঁছার পূর্বেই শাম, মিসর ও ইরাকে গুজবের বাজার গরম হয়ে উঠেছে। বহু মানুষ বিশ্বাস করে নিয়েছিল হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধান দিয়েছেন হজরত আলি রা.। মদিনার দাঙ্গা তারই ইশারায় হয়েছে। এমনতরো বহু গুজব তখন মুখে মুখে রটে গিয়েছিল। বিষয়টা কত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, তা বোঝার জন্য শুধু এই ঘটনাই যথেষ্ট যে, তখন উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. ছিলেন মক্কায়। এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল হজরত উসমান রা. তার বাড়ি অবরোধকারী সকল মিসিরকে হত্যা করেছেন (অথচ এটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা)। হজরত আয়েশা রা. এ সংবাদ শুনে বড় অস্থির হলেন। তবে কিছুক্ষণ পর অন্য এক মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন, হজরত উসমান রা. শাহাদাত বরণ করেছেন। তখন উম্মুল মুমিনিন রা. বললেন, 'বড় অদ্ভুত লোক, নিহতের উপর হত্যার অপবাদ আরোপ করে!'[৩৬০]

ষড়যন্ত্রকারীদের কূটচাল সফল

মূলত তখন ওইসব লোকই গুজব রটাচ্ছিল, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ভেতরেই তাদের সফলতা দেখতে

---

[৩৬০] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪৯, আমর ইবনে শাব্বাহ ও সাইফ বিন উমর থেকে বর্ণিত।

পাচ্ছিল।[৩৬১] একেকটি বিষয়কে তারা বাড়িয়ে-চড়িয়ে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধানো এবং খেলাফতকে দু'টুকরো করতে চাচ্ছিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বিশিষ্ট সাহাবিদের চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও সচেতনতার ফলে ওদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পেয়েছিল বড় ধরনের কোনো ক্ষতি থেকে।

কিন্তু হজরত উসমান রা. এর রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে এ চক্রান্তকারীদের হাতে এমন একটি ছুতা এসে গেল, যার মাধ্যমে তারা উসকানিমূলক গুজব রটিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাতে সফল হয়ে গেল। আর তা এভাবে যে, ইরাক, শাম ও মিসরে অবস্থানরত সাহাবিগণ আপন আপন মর্যাদা সত্ত্বেও গায়েব জানতেন না। সুতরাং এসব দূরদূরান্তের অঞ্চলে বসে প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে এসব অঞ্চলে নানা রকম সন্দেহ ও গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সবার মধ্যে এমন একটি মনোভাব গড়ে ওঠে যে, হজরত আলি রা. বর্তমানে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সত্য; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি হজরত উসমান রা. এর হত্যার দায় থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ না করবেন, ততক্ষণ তার উপর কোনোভাবেই আস্থা রাখা যাবে না। আর এর প্রমাণ কেবল এভাবেই দেওয়া সম্ভব যে, দ্রুত থেকে দ্রুততরো সময়ের মধ্যে তিনি হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সমস্ত অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনবেন।

এই জনমতের কারণেই হজরত আলি রা. এর প্রেরিত সকল প্রশাসক শাম ও কুফা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। অবশ্য মিসরের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হজরত কায়েস বিন সা'দ রা. সাময়িক কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হওয়ার পর সেখানকার দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কারণ, সেখানকার অধিকাংশ মানুষ ছিল তার পক্ষে আর কিছু ছিল তার বিপক্ষে। অন্যদিকে বসরায় হজরত উসমান বিন হুনাইফ

---

[৩৬১] বিভিন্ন আলমত দেখে মনে হয়, চক্রান্তকারীরা শামেও বেশ সবল ছিল। হয়তো ইবনে সাবা শামে কিছুটা বৈচিত্রময় পরিবেশ তৈরি করে গিয়েছিল। এ ধরনের চক্রান্তকারী ও কট্টরপন্থি লোকেরাই হজরত আলি রা. সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে তাকে নিশ্চিত সত্যরূপে ছড়িয়ে দিয়েছিল। শামবাসীকে হজরত আলির প্রতি আস্থাশীল হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে যুদ্ধে আগ্রহী করে তুলেছিল।

রা. বিনাপ্রতিবন্ধকতায় সেখানকার শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে সাধারণ জনমত সেখানেও বিপরীতমুখী ছিল।[৩৬২]

আলি রা. এর সঙ্গে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর কথোপকথন এবং উমরার অনুমতি প্রদান

চলমান পরিস্থিতি দেখে হজরত আলি রা. হজরত তালহা ও যুবাইর রা. কে বললেন, 'আমি যে বিষয়ের আশঙ্কা করছিলাম, তা সামনে এসে গেছে। ফেতনার দৃষ্টান্ত আগুনের মতো। যত খোঁচাবে ততই জ্বলবে।'

এ কথার উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষকে খেলাফতের মূল কেন্দ্রের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলার যে আশঙ্কা ছিল, তা এখন বাস্তব আকার ধারণ করেছে। এ অবস্থায় যদি কিসাস গ্রহণের কোনো দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা হলে তা হবে ফেতনার আগুন আরো খুঁচিয়ে তোলার সমতুল্য। কিন্তু হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর রা. এ কথায় তৃপ্ত হতে পারলেন না। তাই তারা নিজেদের মতো করে এ সমস্যার সমাধান করার অনুমতি চাইলেন। হজরত আলি বললেন, 'যতক্ষণ সম্ভব হবে, এ ব্যাপারে আমি সহনশীলতা অবলম্বন করব। তবে যদি কোনো উপায় না থাকে, তা হলে অস্ত্রই হবে শেষ চিকিৎসা।'[৩৬৩]

পরিশেষে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. উমরার সফরের অনুমতি চান। হজরত আলি রা. তাদেরকে বাধা দেননি।[৩৬৪]

পুনরায় শামীদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের চেষ্টা

এ সময় হজরত আলি রা. দূত পাঠিয়ে শামবাসীদের থেকে আরেকবার বাইয়াত গ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার প্রতিউত্তরে তারা যে খাম পাঠিয়েছিল, তাতে ছিল একটি সাদা কাগজ। অর্থাৎ বুঝানো হয়েছিল যে, তাদের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ের সূচনা হবে না। তাদের পত্র-বাহক

---

[৩৬২] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪২, সাইফ বিন উমর থেকে বর্ণিত।

[৩৬৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪৩, সাইফ থেকে বর্ণিত। হজরত আলির এ কথায় এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, শরয়ি আইনে যতদূর পর্যন্ত ছাড় থাকবে, ততক্ষণ তা দিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যখন শরয়ি অবকাশ নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন ক্ষমতা ব্যবহার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

[৩৬৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪৪, সাইফ থেকে বর্ণিত।

এসে হজরত আলি রা. কে বলল, শামবাসীরা হজরত উসমান রা. এর কিসাস দাবি করছে। পত্র-বাহকের ভাষ্য ছিল এরকম : 'আমি ৬০ হাজার মানুষকে হজরত উসমান রা. এর রক্তমাখা জামার পাশে ক্রন্দরত অবস্থায় রেখে এসেছি। তারা সবাই শহিদের খুনের বদলা চায়।[৩৬৫]

পত্র-বাহকের কথা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, শামে এ গুজব বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে, হজরত আলি রা. হজরত উসমান রা. এর হত্যাকাণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এ কারণেই হজরত আলি রা. তখন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য এ জঘন্য অপরাধ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত করে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার সম্মুখে উসমানের খুন থেকে আমরা আমাদের নির্দোষিতা প্রকাশ করছি।'[৩৬৬]

কিন্তু শামবাসী এতে তৃপ্ত হলো না। কারণ সেখানে বিরাজ করছিল আবেগঘন পরিস্থিতি। হজরত উসমান রা. এর রক্তমাখা জামা এবং হজরত নায়েলার কর্তিত আঙুল দামেশকের জামে মসজিদে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। মানুষ হজরত উসমান রা. এর খুনের বদলা নেবার জন্য তরবারি ধারালো করছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. পূর্ণ ইখলাস এবং পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি সহকারে বুঝতে পারছিলেন যে, হজরত উসমানের হত্যাকারীদের থেকে বদলা নেওয়া ছাড়া উম্মাহ তার দায়িত্ব থেকে হতে পারবে না। আর এক্ষেত্রে তিনি নিজের দায়িত্ব বেশি মনে করছিলেন। এর প্রথম কারণ, তিনি ছিলেন মজলুম শহিদের নিকটাত্মীয় এবং বনু উমাইয়া বংশের প্রধান। দ্বিতীয়ত নিজের কাছে বিদ্যমান শক্তি ও সামর্থ্যের কারণে তিনি অনুভব করছিলেন যে, হজরত আলি রা. যদি এ কিসাস গ্রহণ না করেন, তা হলে যেসব মুসলমানের হাতে জনবল ও রাজনৈতিক শক্তি আছে, তাদের উচিত এ মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করা।[৩৬৭]

---

[৩৬৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪৩, ৪৪৪

[৩৬৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪৪, সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৬৭] শিয়া মতাদর্শী রাবি সুলাইম বিন কায়েসের বরাত দিয়ে কেউ কেউ বলে থাকেন, হজরত উসমান রা. এর বড় পুত্র হজরত আবান বিন উসমানও শামবাসীদের সাথে ছিল। (কিতাবু সুলাইম বিন কায়েস আল হিলালি : ৭৩৮)

কিন্তু এ উদ্ধৃতিকে রাফেজিদের বিরুদ্ধে আপত্তিমূলক দলিল হিসেবে পেশ করা গেলেও খোদ সুলাইম বিন কায়েস এবং তার কিতাবের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

পবিত্র মক্কানগরীতেও প্রায় একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। সেখানে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. উপস্থিত ছিলেন এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরামর্শ করছিলেন। হজরত আলি রা. এর নীরবতা ও চিন্তাশীল কর্মপন্থার সাথে তারা একমত ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল, এক্ষেত্রে যত বিলম্ব হবে, অপরাধী ততই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। অন্যদিকে গুজব রটনাকারীরা তাদের সম্মুখে এই গুজবও রটিয়েছিল যে, হজরত আলি রা. হজরত উসমানের হত্যাকাণ্ডে সম্মত ছিলেন।[৩৬৮]

এসব কারণে এদের পক্ষে হজরত আলির উপর কিসাসের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। কারণ, হজরত উসমান রা. এর নির্মম শাহাদাতের ফলে এরা এতটাই ব্যথিত ছিলেন যে, পাহাড়ের জন্যও সে ব্যথা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। হজরত উসমানকে অবরোধের সময় যথাযথ সাহায্য করতে না পারার কারণেও তারা ব্যথিত ছিলেন। হয়তো তখনকার প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন ছিল। বিশেষ করে হজরত উসমান রা. এর পক্ষ থেকে বারবার হাত গুটিয়ে নেওয়ার জন্য তাগিদ প্রদান করার পর তারা কী করবেন, বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু এখন তাদের মনে ক্ষোভের আর সীমা নেই। কারণ, এখনো তারা হজরত উসমান রা. এর পক্ষে কিছু করতে পারছেন না। এ সম্পর্কে হজরত তালহা রা. এর মনের অবস্থা বোঝার জন্য তার কয়েকটি উক্তি লক্ষ করুন।

রাফেজিরা সুলাইম বিন কায়েসকে হিজরি প্রথম শতাব্দীর অতি সুখ্যাতিসম্পন্ন তাবেয়িরূপে পেশ করে থাকে। আর তার রচিত কিতাবকে ইসলামের ইতিহাসে রচিত প্রথম কিতাব বলে মনে করে। অথচ বাস্তবতা হলো, সুলাইম বিন হিলালি নামের কোনো ব্যক্তির উল্লেখ তাবেয়িদের মধ্যে তো দূরের কথা, তাবেতাবেয়িদের মধ্যেও পাওয়া যায় না। সুতরাং রাফেজিরা বহু শতাব্দী পরে তার নামে কিতাব বানিয়েছে। যার প্রমাণ হলো, এ কিতাবে হজরত আবু বকর ও উমর রা. সম্পর্কে সরাসরি গালমন্দ করা হয়েছে, যা শিয়াদের সমাজে হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। হিজরি প্রথম শতাব্দীতেও হাতেগোনা কয়েকজন সাবায়িও গোপনে এমনটা করত।

[৩৬৮] ইমাম বাইহাকির আল ই'তিকাদ কিতাবে আছে-

ان بعض الناس صور لهما ان عليا كان راضيا بقتل عثمان. (الاعتقاد للبيهقي، ص : ٣٧١)

- তিনি বলতেন, এতদিন আমরা উসমানের ব্যাপারে (বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে) নীরবতা অবলম্বন করে এসেছি। কিন্তু এখন এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে।[৩৬৯]
- কখনো বলতেন, হজরত উসমানের খুনের বদলা এ ছাড়া কিছুই বুঝে আসে না যে, তার কিসাসের চেষ্টায় আমার রক্ত প্রবাহিত হয়ে যাবে।[৩৭০]
- আবার কখনো বলতেন, হে আল্লাহ, আমার দেহের সমস্ত রক্তও কি হজরত উসমানের এক ফোটা রক্তের বদলা হতে পারবে?[৩৭১]

ঠিক একই অবস্থা ছিল উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকার। হজ থেকে ফেরার পথে তিনি হজরত উসমানের শাহাদাতের সংবাদ পেয়েছিলেন। খবর শুনে তিনি মদিনায় না গিয়ে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। তিনি এই দুর্ঘটনার কারণে ভীষণভাবে চিন্তিত ছিলেন। এক সময় হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর চিন্তার সাথে তিনিও একমত হন। তারপর মসজিদে হারামের খোলা চত্বরে পর্দা টাঙিয়ে মুসলমানদের সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন। সে বক্তব্যে হজরত উসমানের হত্যাকারীদের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'ওদের কাছে যখন হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে কোনো বাহানা এবং কোনো প্রমাণ থাকল না, তখন তারা প্রকাশ্যে জুলুম ও নির্যাতনে মেতে উঠল।

---

[৩৬৯] কয়েকটি কিতাবের পাঠ দেখুন-

كنا قد داهنا فى أمر عثمان فلا نجد بدا من المبالغة (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٧٨١، مسيرة عائشة وعلى وطلحة والزبير، بسند صحيح، ط الرشد)

وعن حكيم بن جابر قال قال على لطلحة أنشدك الله الا رددت الناس عن عثمان، قال : لا والله حتى تعطى بنو امية الحق من انفسها. (تاريخ الطبرى : ٤٠٥/٤ بسند صحيح)

قال الذهبى : الذى كان منه فى حق عثمان تمفعل وتاليب فعله باجتهاد ثم تغيرمنه عند ما شاهد مصرع عثمان فندم على ترك نصرته. (سير أعلام النبلاء : ٣٥/١، ط الرسالة)

[৩৭০] মুসতাদরাকে হাকিমে আছে-

كان منى فى امر عثمان رضـ ما لا أرى كفارته الا ان يسفك دى فى طلب دمه (مستدرك حاكم، ح : ٥٥٩٥بسند صحيح)

[৩৭১] তারিখুল মাদিনাতে আছে-

.أنبأنا العوام بن حوشب : قال قال طلحة : اللهم هل يجزئ دمى كله بقطرة من دم عثمان؟ (تاريخ المدينة لابن شبة : ١١٦٩/٤)

অবশেষে তাকে খুন করল। মদিনার পবিত্রতা বিনষ্ট করল। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে লুটপাট করল। পবিত্র যিলহজ মাসের সম্মান হানি করল। আল্লাহর কসম, যদি ওদের মতো মানুষ দিয়ে গোটা দুনিয়াও ভরে যায়, হজরত উসমান রা. এর একটি আঙুল ওদের চেয়ে উত্তম। এখন মুক্তির পথ কেবল এটিই যে, তাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে অন্যদের জন্য ওদেরকে শিক্ষার দৃষ্টান্ত বানিয়ে নাও।[৩৭২]

এই উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তব্যে মক্কার পরিবেশে কিসাসের আন্দোলন শক্তিশালী করে তুলল। হজরত আয়েশা রা. ছিলেন এ আন্দোলনের তত্ত্বাবধায়িকা। তবে মূল নেতৃত্বে ছিলেন হজরত তালহা ও যুবাইর রা.। হজরত তালহা ও যুবাইর রা. সিদ্ধান্ত নিলেন, কুফা বা বসরা গিয়ে সেখানকার ভক্ত ও সমমনা লোকদের একত্র করবেন।[৩৭৩]

মূলত তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জনমত ও সামরিক ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে দাঙ্গাবাজদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। সেই সাথে জালেমদেরকেও যেন উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনা যায়। যদিও এ ধরনের চেষ্টাপ্রচেষ্টার একপর্যায়ে শাসকদের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টির সমূহ আশঙ্কা ছিল, তবু হজরত তালহা ও যুবাইর রা. পারতপক্ষে প্রশাসনের সাথে সংঘর্ষে যেতে চাচ্ছিলেন না। তখন পর্যন্ত তারা হজরত আলি রা. কে কেবল শরয়ি আমির বলেই স্বীকার করতেন না; বরং অন্যদেরও এ ব্যাপারে তাগিদ করতেন।

এ কারণেই বসরার প্রশাসক আহনাফ বিন কায়েস যখন প্রথমে হজরত তালহা ও যুবাইর এবং পরে হজরত আয়েশা সিদ্দিকার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং জানতে চাইলেন যে, কার হাতে বাইয়াত হবো, তখন তিনজন একই উত্তর দিয়েছিলেন, 'আলি রা. এর হাতে'।[৩৭৪]

---

[৩৭২] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪৮, ৪৪৯; সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৭৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪৯, ৪৫০; সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৭৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৯৭, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩০৬২৯ সংক্ষেপে এবং সহিহ সনদে সাইফ থেকে বর্ণিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

আমরা মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার 'মাকতাবাতুর রুশদ'-এর নতুন নুসখা ব্যবহার করছি. যা সাত খণ্ডে মুদ্রিত। কিন্তু এ স্থানে এ নুসখায় মুদ্রণের কিছু মারাত্মক ভুল

যাই হোক, হজরত তালহা ও যুবাইর রা. যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তার সাথে আরো অনেকেই একত্মতা পোষণ করলেন। যেমন মক্কায় হজরত সাঈদ ইবনুল আস রা. ও ওয়ালিদ বিন উকবা রা., ইয়েমেনের সাবেক গভর্নর ইয়ালা বিন উমাইয়া এবং বসরার সাবেক গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা.। অবশেষে ৬০০ মানুষের এক বিরাট কাফেলা নিয়ে তারা মক্কা থেকে সুদূর ইরাকে পাড়ি জমান।[৩৭৫]

হজরত আলি রা. এর শাম যাত্রা মুলতবি ও ইরাক গমনের সিদ্ধান্ত

হজরত আলি রা. শামবাসীর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তার নৈকট্যভাজন ব্যক্তিদের মতপার্থক্যও তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তুতির তেমন কোনো কার্যক্রম এ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। ফলে সফরের তারিখ ক্রমেই পেছাতে থাকে। অবশেষ মক্কা থেকে সংবাদ এলো, হজরত তালহা, যুবাইর ও উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বিশাল বাহিনী নিয়ে বসবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।[৩৭৬]

এ খবর শুনে হজরত আলি রা. হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর রা. এর পিছু ধাওয়া করে তাদের গতিরোধ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। সুতরাং শামের পথ পরিহার করে তিনি মক্কাগামী রাজপথের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। হজরত আলির নৈকট্যভাজন ব্যক্তিবর্গ এ পদক্ষেপ থেকে তাকে বারণ করলেন। এমনকি স্বীয় পুত্র হজরত হাসানও আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন, হজরত তালহা ও যুবাইর রা. কে হজরত উসমানের হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করতে দিন।[৩৭৭]

এমনিভাবে হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রা. ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললেন, আমিরুল মুমিনিন, দয়া করে আপনি মদিনা থেকে যাবেন না। আপনি যদি চলে যান, তা হলে আর কোনো দিন এখানে মুসলমানদের

আছে। তাই সুধী পাঠক এখানে 'দারুস সালাফিয়্যাহ' থেকে মুদ্রিত পনেরো খণ্ডবিশিষ্ট প্রাচীন নুসখাটি দেখবেন। সেখানে এ বর্ণনাটি আছে ১১/১১৮, ১১৯ পৃষ্ঠায়।

[৩৭৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪৯, ৪৫০ সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৭৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৫৫ সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৭৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৫৬ সাইফ থেকে বর্ণিত।

শাসক ফিরে আসবেন না। কিন্তু হজরত আলি রা. কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না।[৩৭৮]

পবিত্র মদিনা শহর থেকে বেরিয়ে মক্কাগামী রাজপথ ধরে তিন মাইল (পৌনে পাঁচ কিলোমিটার) অগ্রসর হয়ে 'রাবজা' নামক স্থানে হজরত আলি যাত্রাবিরতি করেন। পাঁচ-ছয় দিন পর জানতে পারেন মক্কার কাফেলা বসরার উদ্দেশে যাত্রা করেছে। তখন তিনি সোজা কুফা গমনের সংকল্প করেন।

এ পর্যায়ে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কুফা গমনের ফলে সম্ভাব্য বিভিন্ন আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। হজরত আলি রা. তার সব আশঙ্কা স্বীকার করা সত্ত্বেও কুফায় গমন করা উত্তম মনে করেন।[৩৭৯] কেননা ইরাকের পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল যে, মদিনায় বসে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব ছিল।

অন্যদিকে মক্কার কাফেলার কর্মপন্থা সম্পর্কে হজরত আলি রা. আক্ষেপ করে বলতেন, 'এই ভদ্রমহোদয়গণ যদি এ পন্থাই গ্রহণ করে, তা হলে মুসলিম উম্মাহর নিয়ম-শৃঙ্খলা সব তছনছ হয়ে যাবে'।[৩৮০]

---

[৩৭৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৫৫ সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৭৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৫৯, ৪৬০ সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৮০] তারিখুত তাবারিতে আছে-

فان فعلوا هذا فقد انقطع نظام المسلمين

তারা এটা করলে মুসলমানদের নিয়ম-নীতি ভেঙ্গে পড়বে।

(তারিখুত তাবারি : ৪/৪৪৬ সাইফ থেকে বর্ণিত।)

জঙ্গে জামাল ও তার প্রেক্ষাপট

ইরাকের পথে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর যাত্রা হজরত আলি রা. এর শাসনক্ষমতা বিলুপ্ত করার মানসে ছিল না, বরং ছিল ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করার লক্ষ্যে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিল পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঈমানি প্রেরণা। হজরত আলি রা. নিজেও হজরত যুবাইর ও হজরত তালহা রা. এর আন্তরিকতার কথা বিশ্বাস করতেন। তাদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাও তিনি কখনো ভুলতে পারতেন না এবং তাদের সাথে তার আন্তরিক ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতাও কোনো অংশে কম ছিল না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও হজরত আলি রা. এর মত ছিল, নিজেদের পক্ষ থেকে ইনসাফের দাবিতে কোনো শহরকে কেন্দ্র বানিয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং অপরাধীদের শাস্তির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মূলত শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ ও উম্মাহর একতায় বিঘ্ন ঘটবার কারণ হতে পারে। তাই তিনি চাচ্ছিলেন, শাস্তির দাবিদার ব্যক্তিবর্গকে তার পক্ষে সমবেত করে একটি সর্বজনীন পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বসরায়

এদিকে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর কাফেলা বসরার সন্নিকটে 'খাফির' নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। ধারণা করা হয় যে, তিনি ৩৬ হিজরির মহররম মাসের শেষদিকে এ সফর শুরু করেন এবং দীর্ঘ ৭৬ মাইল (৪৮ মনজিল বা ১২৩৪ কিলোমিটার) পথ অতিক্রম করে রবিউল আউয়ালের শেষদিকে বসরার উপকণ্ঠে গিয়ে উপনীত হন। তারপর দীর্ঘ ২৬ দিন সেখানে আলোচনা-পর্যালোচনা ও পরামর্শ চলতে থাকে। প্রথমে বসরার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নামে চিঠি পাঠিয়ে তাদেরকে হজরত আয়েশা রা. তার আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করেন, যাতে তারা কোনো ভুল ধারণার শিকার না হন। বসরার শাসক

হজরত উসমান বিন হুনাইফ রা. হজরত ইমরান বিন হুসাইন রা. এবং হজরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি রা. কে উম্মুল মুমিনিনের কাছে প্রেরণ করেন।[৩৮১]

হজরত আয়েশা রা. তাদের সাথে যে কথাবার্তা বলেছিলেন, তার প্রতিটি শব্দ থেকে ইখলাস, কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতা ঝরে পড়ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন, আমার মতো একজন নারী কোনো গোপন উদ্দেশ্যে সফর করতে পারে না। আর আমি নিজ সন্তানদের থেকে প্রকৃত অবস্থা গোপনও করতে পারি না। শহরের বদমাশ লোকেরা এবং বিভিন্ন গোত্রের বখাটে যুবকেরা আল্লাহর রাসুলের পবিত্র শহরে আক্রমণ করেছিল। ফলে তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের অভিশাপের যোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, মুসলিম উম্মাহর শাসককে কোনো অপরাধ ও কারণ ছাড়া তারা শহিদ করে দিয়েছে। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তার রক্ত ঝরিয়েছে, তার সম্পদ লুটপাট করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা মানুষের ঘরে ঘরে এমনভাবে অবস্থান করছে যে, মানুষ তাদের অবস্থানের কারণে কোণঠাসা, দিশেহারা ও আতংকগ্রস্ত হয়ে আছে। তারা নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারছে না, আবার তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তাও ছিল না। পরিশেষে আমি মুসলমানদেরকে বলতে বেরিয়েছি যে, এই সন্ত্রাসীরা কী বিপদ ঘটিয়েছে এবং আমাদের পেছনে সাধারণ মানুষের অবস্থাই-বা কী? এবং এই অবস্থার সংশোধনের জন্য এখন সবার কী করা উচিত।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

ওইসব লোকের অধিকাংশ পরামর্শ ভালো নয়; তবে হ্যাঁ, ওই ব্যক্তির পরামর্শ ভালো, যে আদেশ করে দানের, কিংবা সৎকাজের, অথবা মানুষের মধ্যে সমঝোতার। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এমনটি করবে অচিরেই আমরা তাকে মহা প্রতিদানে ভূষিত করব।[৩৮২]

---

[৩৮১] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৬১-৪৬২; সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৮২] সুরা নিসা, আয়াত ১১৪

সুতরাং আমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ অনুসারে উম্মাহর সংশোধনের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বেরিয়েছি। আমরা তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করছি এবং সৎপথের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি। গুনাহ থেকে বাধা প্রদান করছি এবং তার পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করছি।[৩৮৩]

বসরার উক্ত দুই প্রতিনিধি হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানার পর তারা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আপনারা তো হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হয়েছেন।

হজরত তালহা ও যুবাইর রা. উত্তর দিলেন, 'যদি হজরত আলি রা. আমাদের এবং হজরত উসমানের হত্যাকারীদের মধ্যে অন্তরায় না হন, তা হলে আমরা আমাদের বাইয়াতের উপরই অবিচল থাকব।'[৩৮৪]

এদিকে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর অবস্থান জানার জন্য বসরার বিরাট সংখ্যক জনগণ শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। মক্কার কাফেলা যে ময়দানে ছাউনি ফেলেছিল, সেখানে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। হজরত তালহা ও যুবাইর রা. সেখানে উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করলেন। পরিশেষে বললেন, মজলুম খলিফার কিসাস গ্রহণ করা মূলত আল্লাহর একটি দণ্ডবিধি। সুতরাং এটি বাস্তবায়ন করলে আপনার শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খলতা লাভ করবে আর যদি তা না করেন, তা হলে আপনার শক্তি ও ক্ষমতা ধুলোয় মিশে যাবে, গোটা শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।'

সবশেষে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. সকলকে সম্বোধন করে বলেন, 'মানুষ হজরত উসমান রা. এর নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ করে। মদিনায় এসে বহু মানুষ আমাদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে। কিন্তু আমরা দেখেছি, হজরত উসমান রা. ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান শাসক এবং প্রতিশ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠাতো, আজ তাদের অপকর্ম ও মিথ্যাচার সকলের সম্মুখে

---

[৩৮৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৬১-৪৬২; সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৮৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৬২; সাইফ থেকে বর্ণিত।

স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরা সংখ্যায় ভারী হয়ে হজরত উসমান রা. এর বাড়ি অবরোধ করেছিল এবং অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করেছিল।

সুতরাং এখন আমাদের করণীয় হলো, হজরত উসমানের হত্যাকাণ্ডে জড়িত সকলকে গ্রেফতার করা এবং এ সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের বিধান বাস্তবায়ন করা। এ ছাড়া অন্যকিছু করা এখন সমীচীন নয়।'[৩৮৫]

এ বক্তব্যে সাড়া দিয়ে বসরার বহু মানুষ তাদের পক্ষে থাকার ঘোষণা করে। শহরের সাধারণ মানুষ এ আন্দোলনের অত্যন্ত শক্তিশালী সমর্থকে পরিণত হয়। ফলে পরিস্থিতি তৎকালীন গভর্নর হজরত উসমান বিন হুনাইফ রা. এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অবশ্য একটি দল এই বলে তার সাথেই ছিল যে, আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হওয়ার পর হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর পক্ষে হজরত এ ধরনের আন্দোলন চালানোর অধিকার নেই।

হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর বিরোধীদের অনেকেই ছিলেন নেককার ও সম্ভ্রান্ত। তারা এজন্য তাদের পক্ষ পরিহার করেছিলেন যে, খলিফার আনুগত্য স্বীকার করা আবশ্যক। আইন হাতে তুলে নেওয়া অন্যায়। কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে সাবায়িদেরও একটি বড় অংশ ছিল, যারা হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। হজরত উসমানকে অবরোধকারীদের একটি দল গিয়েছিল বসরা থেকে। তাদের সরদার ছিল হুকাইম বিন জাবালা এবং হুরকুস বিন যুহাইর। হজরত আলির হাতে বাইয়াত হওয়ার পর এরা বসরায় ফিরে এসেছিল। তারপর কোনো কারণ ছাড়াই এখানকার পরিবেশ উত্তপ্ত করা এবং নিজেদের ক্ষমতা মজবুত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছিল। এরা সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর বিরুদ্ধে নানা অশালীন মন্তব্য করে প্রচার করছিল যে, হজরত আলির বিশ্বস্ত অনুসারী কেবল তারাই। অবশেষে হুকাইম বিন জাবালা তার চেলাদের নিয়ে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।[৩৮৬]

---

[৩৮৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৬৩-৪৬৪; সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৮৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৬৬

এ অসভ্য বদমাশগুলো এ পর্যন্ত হুমকি দিল যে, তারা -নাউযু বিল্লাহ- উম্মুল মুমিনিন রা.কে বন্ধক রাখবে।[৩৮৭]

বসরার সম্ভ্রান্ত লোকেরা এ অশ্রাব্য কথা সহ্য করল না। ধিক্কার দিয়ে বলল, 'খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উসমান রা. কে হত্যা করেও তোদের তৃষ্ণা মেটেনি? এখন আল্লাহর রাসুলের পুণ্যবতী স্ত্রীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছিস? তিনি তোদেরকে সৎ ও সত্যের আদেশ করছেন! ব্যস, শুধু এই অপরাধে তাকে এবং বিশিষ্ট সাহাবিদের রক্ত ঝরাতে, হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিস?

কিন্তু সেই পাষাণ-হৃদয় মানুষগুলোর মধ্যে এসব কথার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নামে প্রেরিত চিঠিতে এ পরিস্থিতিকে এভাবে তুলে ধরেছেন- 'সৎ লোকেরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু যাদের মধ্যে কল্যাণের কোনো ছিঁটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই, তারা অস্ত্র উঁচিয়ে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে এবং বলছে, আমরা তোমাদেরকেও উসমানের পেছনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা চাচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা আবারও পদদলিত করবে। নিছক শত্রুতার বশে আমাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে এবং আমাদের সম্পর্কে অশালীন কথা বলেছে। যখন আমরা এ আয়াত পড়ি,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

(তোমরা কি ওইসব লোককে দেখোনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান দান করা হয়েছে, এবং আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করে, তখন তাদের একটি দল অগ্রাহ্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।)[৩৮৮]

---

[৩৮৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭১

[৩৮৮] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ২৩

তখন তাদের কিছু মানুষ আমার কথায় বিশ্বাস করে। ফলে তাদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। আমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এরপরও তাদের প্রথম দলটি আমাদের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা থেকে বিরত হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের চক্রান্ত তাদেরই বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমরা দীর্ঘ ২৬ দিন তাদেরকে আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি; কিন্তু তারা কেবল অস্বীকারই করেছে।[৩৮৯]

বসরার চূড়ান্ত যুদ্ধ : সাবায়িদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ

হুকাইম বিন জাবালার মতাদর্শী সাবায়িদের চক্রান্তের ফলে ৩৬ হিজরির ২৪ ও ২৫ রবিউস সানিতে বসরার মাটিতে মক্কার কাফেলা ও বসরার সন্ত্রাসীদের মধ্যে পর পর দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হজরত উসমানের হত্যাকারী ও সাবায়িরা ছাড়া আবদুল কায়েস ও রবিয়া গোত্রের কিছু লোকও না-বুঝে বিশৃঙ্খলাকারীদের সাথে যুক্ত হয়েছিল।[৩৯০]

প্রথমদিন হুকাইম বিন জাবালা তার অশ্বারোহীদের নিয়ে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর বিশ্রামাগারের দিকে ছুটে যায়, যা ছিল বসরার জনপদে মসজিদের সন্নিকটে অবস্থিত। মক্কার কাফেলা অশ্বারোহী দলকে ছুটে আসতে দেখেও নিজেদের পক্ষ থেকে আক্রমণ করেননি। বরং বর্শা তাক করে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হুকাইম বিন জাবালা উত্তেজিত করে তার অশ্বারোহীদের সম্মুখে অগ্রসর করে। উম্মুল মুমিনিনের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদেরকে কেবল আত্মরক্ষা করতে দেখে সে বড় পণ্ডিতসুলভ ঢংয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আজ কুরাইশরা তাদের ভীরুতা ও ক্রোধের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে'।

এভাবে হজরত আয়েশার জানবাজ দেহরক্ষীদের ক্ষিপ্ত করে তারা খোলা ময়দানে যুদ্ধের জন্য উসকানি দিতে থাকে। কিন্তু মক্কার বাহিনী অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে একইভাবে আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করলেন।

---

[৩৮৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭৩

[৩৯০] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭০; সাইফ থেকে বর্ণিত।

লড়াই চলছিল জামে মসজিদের গলির মধ্যে। চারদিক থেকে প্রস্তরবর্ষণও হলো। শত্রুরা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।[৩৯১]

উম্মুল মুমিনিন রা. কুফাবাসীদের নামে প্রেরিত তার চিঠিতে লিখেছেন, 'শেষরাতের অন্ধকারে ওরা আমি ও আমার সঙ্গীদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে হামলা চালাল। ওরা আমার বিশ্রামাগারের বারান্দা পর্যন্ত এসে পড়ল। ওদের সাথে এক পথনির্দেশক ছিল, যে আমার অবস্থান দেখিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু আমার দরজার কাছে ওরা কিছু মানুষকে প্রস্তুত অবস্থায় পেল। তখনই ঘুরতে শুরু করল যুদ্ধের চাকা। মুসলমানরা তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং মারতে শুরু করল।'[৩৯২]

এই অতর্কিত কিন্তু ব্যর্থ আক্রমণের পর প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বসরার সাবায়িরা উম্মুল মুমিনিন এবং তার সঙ্গীদের জীবন নাশ করতে চায়। সুযোগ পেলেই তারা আবার আক্রমণ করবে, আর তা নিশ্চয় আগের চেয়ে পরিকল্পিত ও ভয়াবহ হবে। তাই সে-রাতে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. স্থানীয় লোকদের পরামর্শে তাদের ছাউনি স্থানান্তরিত করে সরকারি খাদ্যভাণ্ডারের পাশে স্থাপন করলেন, যার সম্মুখে ছিল একটি খোলা ময়দান। তারপর সারারাত তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। শহর থেকে উম্মুল মুমিনিনের জানবাজ ভক্তরা এসে তাদের কাতারে শামিল হতে লাগল।[৩৯৩]

হুকাইম বিন জাবালার আশপাশে হজরত উসমানের হত্যাকারী ছাড়া অধিকাংশ ছিল বিভিন্ন গোত্রের বিতাড়িত ও বখাটে যুবক। তারা ভালো করেই জানত, শক্তি দেখাতে না পারলে বসরার মাটিতে তাদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।[৩৯৪]

দ্বিতীয় দিন হুকাইম বিন জাবালা খুব ভোরে সাবায়িদের সঙ্গে নিয়ে বর্শা তাক করে বের হলো। আর উম্মুল মুমিনিনের নামে চিৎকার করে সে এমন ধৃষ্ঠতাপূর্ণ কথা বলতে লাগল, যা শোনামাত্র যে কেউ কেঁপে উঠত। এক ব্যক্তি সহ্য করতে না পেরে সামনে এসে হুঙ্কার দিয়ে বলল, কাকে

---

[৩৯১] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৬৬
[৩৯২] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭৪
[৩৯৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৬৬
[৩৯৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭০

গালি দিচ্ছিস? হুকাইম বিন জাবালা বর্শার এক আঘাতে তাকে শেষ করে দিল।

তারপর তারই গোত্র আবদুল কায়েসের এক নারী তার ধৃষ্ঠতাপূর্ণ কথায় উত্তেজিত হয়ে ছুটে এসে বলল, 'হে অপবিত্র নারীর সন্তান, তুই মুসলিম উম্মাহর জননীকে গালি দিচ্ছিস, তুই নিজেই এসব গালির উপযুক্ত।'

হুকাইম বিনা জাবালা তাকেও বর্শার শিকারে পরিণত করে ফেলল।

আসলে সে ভেবেছিল, এভাবে ত্রাস সৃষ্টি করে স্থানীয়দের প্রভাবিত করে ফেলবে, যারা হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর দলে শরিক হয়েছিল। কিন্তু তার এই নির্বুদ্ধিতার আচরণে তারই গোত্র আবদুল কায়েসের বহু মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে তার দল ছেড়ে চলে যায়। তারা বলছিল, 'তোর প্রতিশোধ নেবেন স্বয়ং আল্লাহ'।[৩৯৫]

যেহেতু সাবায়িরা ছাড়া বহু সাধারণ মুসলমান কেবল হজরত উসমান বিন হুনাইফ রা. এর পক্ষাবলম্বনের কারণে এ যুদ্ধে শামিল হয়েছিল; তাই মক্কার কাফেলা শুরু থেকেই খুব সতর্কতাপূর্ণ পথ অবলম্বন করল। উম্মুল মুমিনিন রা. তার জানবাজ অনুসারীদের আদেশ করলেন, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসবে, তোমরা কেবল তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এই আদেশ শুনে তারা ঘোষণা করে দিলেন, হজরত উসমানের হত্যায় যারা জড়িত ছিলেন না, তারা হাত গুটিয়ে নিন। আমরা কেবল সেই হত্যাকারীদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই। সুতরাং আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কারো সাথে যুদ্ধ শুরু করব না।[৩৯৬]

এদিকে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. মুসলমানদেরকে রক্তপাত থেকে রক্ষা করার জন্য অবিরাম ঘোষণা করাতে লাগলেন, দুশমনের সারিতে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষ হাত গুটিয়ে নিন। কিন্তু হুকাইম বিন জাবালার সাঙ্গপাঙ্গরা একটি কথাও শুনল না। আর তাদেরই উদ্যোগে সৃষ্ট এই অবস্থা হজরত তালহা ও যুবাইর রা. কে প্রকাশ্যে জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ করে দিল। তাই তিনি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দোয়া করলেন,

---

[৩৯৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭০; সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৩৯৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭০; সাইফ থেকে বর্ণিত।

الحمد لله الذى جمع لنا ثأرنا من اهل البصرة، اللهم لا تبق منهم احدا، واقد منهم اليوم فاقتلهم.

(সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি বসরায় হজরত উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ, এদের একজনকেও জীবিত ছাড়বেন না। আজ এদের থেকে কিসাস নিয়ে নিন এবং এদেরকে হত্যা করুন।)[৩৯৭]

তারপর উম্মুল মুমিনিনের জানবাজ অনুসারীদল পূর্ণ শক্তি দিয়ে পালটা আক্রমণ চালালেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। হজরত উসমানের হত্যাকারীদের চার গুরু- হুকাইম বিন জাবালা, জুরাইহ বিন আব্বাদ, ইবনুল মুহতারিশ এবং হুরকুস বিন যুহাইর নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। মক্কার কাফেলা থেকে হজরত তালহা রা. হুকাইমকে, হজরত যুবাইর রা. যুরাইহ বিন আব্বাদকে, আবদুর রহমান বিন ইতাব রা. ইবনুল মুহতারিশকে এবং হজরত আবদুর রহমান বিন হারেস রহ. হুরকুসের মোকাবেলা করলেন।

হুকাইম তিন শত সাবায়িকে নিয়ে হজরত তালহার মোকাবেলা করল। হজরত তালহা হুকাইমের মোকাবেলার জন্য পাঠালেন হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.কে। হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর তার জানবায সাথিদের নিয়ে এত ক্ষিপ্রতার সাথে হুকাইমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে একের পর এক শত্রুদের লাশ পড়ে স্তূপ হতে লাগল। হুকাইমের ভাই রি'ল, পুত্র আশরাফ এবং অন্য এক সাবায়ি নেতা নিহত হলো। খোদ হুকাইমের পা কাটা গেল এবং সে অধোমুখী হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। তার নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী এক মুজাহিদ তাকে বললেন, হে খবিস, আল্লাহর প্রতিশোধের স্বাদ দেখ, কেমন লাগে। এর একটু পর জুখাইম নামক জনৈক মুজাহিদ এক আঘাতে তার মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।[৩৯৮]

---

[৩৯৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭০
[৩৯৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭১

মক্কার কাফেলা থেকে কেবল একজন মুজাহিদ, হজরত মুজাশি' বিন মাসউদ রা. শাহাদাত বরণ করেন।[৩৯৯]

সরকারি গুদামের সম্মুখস্থ মাঠ শত্রুদের লাশের স্তূপে পরিণত হল। জুরাইহ সদলবলে নিহত হল। সাবায়ি নেতাদের থেকে কেবল হুরকুস বিন যুহাইর তার কয়েকজন সাঙ্গসহ জীবন নিয়ে ফিরে যেতে সক্ষম হল।[৪০০] আর অবশিষ্ট লোকেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল। হজরত তালহা ও যুবাইর রা. অকারণে রক্তপাত ঘটাতে চাচ্ছিলেন না। তাই প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।[৪০১]

অবশেষে এ অঙ্গীকার নিয়ে যুদ্ধ সমাপ্ত হল যে, আল্লাহপ্রদত্ত দণ্ডবিধি কার্যকর করা হবে। হজরত উসমানের বদলা গ্রহণের পথে কেউ আর বাধা সৃষ্টি করবে না।[৪০২]

এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হল যে, বসরার গভর্নর ভবন, জামে মসজিদ ও বাইতুল-মাল হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর হজরত উসমান বিন হুনাইফের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। আর মক্কার কাফেলা বসরার যেকোনো স্থানে অবস্থান করতে পারবে। হজরত আলি রা. এর আগমন পর্যন্ত উভয় পক্ষ সব ধরনের উত্তেজনা ও মারামারি পরিহার করবে।[৪০৩]

এ যুদ্ধ থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে যেসব সাবায়ি এদিকে-সেদিকে পালিয়ে গিয়েছিল, শহরের লোকেরা তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল। কেউ তাদেরকে আশ্রয় দিতে সম্মত ছিল না।[৪০৪]

হজরত তালহা ও যুবাইর রা. বসরার অলি-গলিতে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, 'কোনো গোত্রে যদি এমন কোনো লোক থাকে, যারা মদিনায় গিয়ে হত্যা ও অরাজকতায় লিপ্ত হয়েছিল, তা হলে তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন।'

---

[৩৯৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৮৩
[৪০০] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭১
[৪০১] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৬৬, সাইফ থেকে বর্ণিত।
[৪০২] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭৩
[৪০৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৮৩
[৪০৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭৩

এ ছাড়া প্রসিদ্ধ সন্ত্রাসীদের নাম লিখে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। তখন বসরার লোকেরা ঠিক কুকুরের মতো টেনে-হিঁচড়ে কয়েকজনকে ধরে আনল। হজরত উসমানের হত্যার দায়ে তাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো।[৪০৫]

মুজাহিদদের এই বিজয় এবং সন্ত্রাসীদের এই ভয়াবহ পরিণতির ফলে ঈমানদারদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করল। হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এই সুসংবাদ লিখে মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন শহরে পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'আমরা যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সকল স্তরে আল্লাহর কিতাবের বিধান কার্যকর করার লক্ষ্যে বেরিয়েছি। বসরার সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ এই লক্ষ্যে আমাদের হাতে বাইয়াত হয়েছে। তবে সন্ত্রাসী ও বখাটেরা আমাদের বিরোধিতা করে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বার বার তাদেরকে মুসলমানদের জীবনাদর্শে ফিরে আসার সুযোগ দান করেছেন। কিন্তু যখন তাদের কাছে কোনো বাহানা ও ওজর থাকল না, তখন হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীরা দিশেহারা হয়ে উঠল এবং নিজ উদ্যোগেই রণাঙ্গনে হাজির হলো। কিন্তু তাদের থেকে হুরকুস বিন যুহাইর ছাড়া কেউ বাঁচতে পারেনি। মহান আল্লাহ তার থেকেও প্রতিশোধ নেবেন। সুতরাং আমরা আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনারাও আমাদের মতো জেগে উঠুন, যাতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিতিকালে ক্ষমাপ্রার্থনার কোনো বাহানা আমাদের হাতে এসে যায় এবং আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করি।'[৪০৬]

তারপর থেকে বসরার সবকিছু মক্কার কাফেলার নিয়ন্ত্রণে ছিল। অবশ্য একটি আশঙ্কা বাকি ছিল। তা হলো, হুরকুস বিন যুহাইরের সম্পর্ক ছিল বনু সা'দ গোত্রের সাথে। আর সে তার গোত্রকে জাহিলি কট্টরতা ও পক্ষপাতিত্বের উসকানি দিতে সক্ষম হয়েছিল। একইভাবে হুকাইম বিন জাবালার গোত্র আবদুল কায়েসের বহু লোক বসরার যুদ্ধে তাদের গোত্রীয় লোকদের নিহত হওয়ার কারণে ক্ষেপে উঠেছিল। অথচ প্রথমে তারাও উম্মুল মুমিনিনের পক্ষে ছিল। কিন্তু যখন তাদেরই গোত্রের কয়েকজন

[৪০৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭২
[৪০৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭২

শাস্তি পেল, তখন তাদের অন্তরে গোত্রীয় পক্ষপাতের চেতনা জেগে উঠল। ফলে তারা বসরা ছেড়ে চলে গেল।[৪০৭]

হজরত আলি রা. কুফার পথে অবিচল

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, হজরত আলি রা. আগে থেকেই কুফা নগরীকে তার শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র বানাতে চাচ্ছিলেন। তাই তার জন্য ইরাক গমন করা অপরিহার্য ছিল।

তা ছাড়া তিনি প্রবলভাবে আশঙ্কা করছিলেন যে, কিসাসের ব্যাপক আন্দোলনের তোড়ে এমন মানুষও হয়তো শাস্তির আওতায় এসে পড়তে পারে, যারা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষ্পাপ; যদিও তারা অতীতে বিদ্রোহে জড়িত ছিল। কিন্তু বাইয়াতের পরে ইসলামি শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ হিসেবে সব ধরনের অধিকার তাদের প্রাপ্য ছিল। যদি তারা অমুসলিমও হতো, তবু তাদের জীবন ও সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হজরত আলি রা. এর নৈতিক দায়িত্ব হয়ে গিয়েছিল।

বসরায় যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার ফলে গোটা মুসলিমবিশ্বে একটি গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই হজরত আলিকে মদিনা থেকে বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ ইরাক গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল, যাতে সেখানকার সব বিষয় আইনের আওতায় নিয়ে আসা যায়। যদিও সঙ্গের সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, হজরত আলি হয়তো হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওনা হয়েছেন। কিন্তু তিনি তার একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকদের জানিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের ইচ্ছা তার কখনোই ছিল না। হজরত রিফাআ বিন রাফে রা. যখন সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন হজরত আলি বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল সংশোধন করা।

তিনি বললেন, যদি তারা মনতে না চায়?

হজরত আলি বললেন, আমরা অপারগ ভেবে তাদেরকে ছেড়ে দেব। তাদের অধিকার তাদেরকে বুঝিয়ে দেব। আর নিজেরা সবর করব।

তিনি বললেন, যদি তারা তাতেও রাজি না হয়?

---

[৪০৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭২

হজরত আলি বললেন, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কিছু বলব না; যতক্ষণ তারা আমাদেরকে উত্তেজিত না করবে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা যদি আমাদেরকে না ছাড়ে?

হজরত আলি বললেন, আমরা তাদেরকে কেবল প্রতিহত করব।[৪০৮]

এ কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, হজরত আলি রা. যথাসাধ্য যুদ্ধ এড়াবার পক্ষে ছিলেন এবং সমঝোতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

কুফাবাসীর নামে হজরত আলি রা. এর চিঠি

হজরত আলি রা. এই প্রথম কুফানগরীকে খেলাফতের কেন্দ্র বানানোর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, কুফাবাসী আমাকে দারুণ ভালোবাসে। সেখানে আরবদের শীর্ষ নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাস করেন।'

তারপর তিনি কুফাবাসীদের নামে চিঠি প্রেরণ করেন। তাতে লেখা ছিল, 'আমি তোমাদের মধ্যে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেননা তোমাদের আল্লাহপ্রেম এবং ইশকে রাসূল সম্পর্কে আমি জানি। যে আমার কাছে এসে সহযোগিতা করবে, সে তার দায়িত্ব পূর্ণ করবে। তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও। আর এর দ্বারা আমাদের হাত শক্তিশালী কর। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল সংশোধন করা, যাতে উম্মাহ আবার ভাই ভাই হয়ে যায়।[৪০৯]

হজরত আলি রা. এর ঐতিহাসিক ভাষণ

হজরত আলি রা. এ বিষয়ে খুব লক্ষ রাখছিলেন যে, তার সাথিদের মধ্যে যারা কেবল সরদারদের প্রতি অতিভক্তির কারণে অস্বাভাবিক মানসিকতার শিকার হয়েছে, তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও রাসুলের সুন্নাতের বাতলানো ন্যায়-ইনসাফের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। মুসলমানদেরকে এক উম্মাহ ও এক জাতি হওয়ার বিস্মৃত পাঠ আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। সফর শুরু করার পূর্বে তিনি একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, যা আজও মানুষকে দলাদলি থেকে মুক্তির পথ

---

[৪০৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭৯, সাইফ থেকে বর্ণিত।
[৪০৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭৭

দেখায়। তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত ও সমুন্নত করেছেন। লাঞ্ছনা, সংখ্যালঘুতা এবং পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষের যুগ থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়ে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যতদিন চেয়েছেন, মানুষ এই অবস্থায় ছিল। ইসলামই তাদের দীন এবং আল্লাহর কিতাব তাদের পথপ্রদর্শক ছিল। কিন্তু তারপর হজরত উসমান রা. এমন কিছু মানুষের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করলেন, যাদেরকে শয়তান উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য প্ররোচিত করেছিল। মনে রাখবে, এ উম্মাহ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবেই। যেমনিভাবে অতীতের সকল উম্মাহ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আগামীতে যা ঘটবে, তার অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। শুনে রাখ, অচিরেই এ উম্মাহ ৭৩ দলে বিভিক্ত হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই দল, যারা নিজেদেরকে আমার সাথে সম্পৃক্ত করবে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসরণ করবে না। নিশ্চয়ই আমি এমন লোকদেরকে দেখেছি, চিনেছি। সুতরাং তোমরা নিজেদের দীন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলো। তার সুন্নাত আপন করে নাও। পবিত্র কুরআনের যে বিষয় বুঝে আসে না, তা রেখে দাও। যা যা বুঝে আসে, তা গ্রহণ করো। কুরআন যাকে প্রত্যাখ্যান করে, তা বর্জন করো। আল্লাহকে রব, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল, ইসলামকে দীন এবং কুরআনকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়ে যাও।[৪১০]

এই অবিস্মরণীয় ভাষণের পর ৩৬ হিজরির ৩০ রবিউল আখিরে হজরত আলি রা. মদিনা থেকে কুফা-অভিমুখে যাত্রা করেন।[৪১১]

জনবল কম হওয়ার কারণ

মদিনা থেকে হজরত আলির সাথে যাওয়ার জন্য কোনো সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হয়নি। তাই কেবল ৭৬০ জন মানুষ তার সঙ্গে ছিল।[৪১২] এর কারণ এই ছিল যে, এ সফরে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা ছিল। অথচ হিজাজের অধিকাংশ মানুষ কোনো রাজনৈতিক বিবাদের অংশ হতে সম্মত ছিল না।

---

[৪১০] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭০

[৪১১] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৭৩-৪৭৮, সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৪১২] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮০

হজরত আলির হাতে বাইয়াত হওয়া সত্ত্বেও কোনো পক্ষ গ্রহণ না করাকে প্রাধান্য দিচ্ছিল। এ কারণেই হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. হজরত আলি রা. কে বলেছিলেন, 'আপনি যদি সিংহের চোয়ালের মধ্যেও থাকতেন, তবু আমি আপনার পক্ষ গ্রহণ করাটাই উত্তম মনে করতাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মত এটা নয়।'[৪১৩]

হজরত যুবাইর রা. এর সমঝোতা পছন্দ করা

হজরত আলি রা. কুফার পথে চলছিলেন। এমন সময় বসরায় কোনো এক সরদার হজরত যুবাইর রা.কে প্রস্তাব দিল যে, এখন ইচ্ছা করলে হজরত আলি রা.কে কেবল এক হাজার অশ্বারোহী দ্বারা প্রতিহত করা যায়। তা হলে এ সুযোগ কেন গ্রহণ করবেন না?

হজরত যুবাইর রা. বললেন, যুদ্ধের মারপ্যাঁচ আমি খুব ভালো করেই জানি। কিন্তু এখানে তো আমরা দাঈ হয়ে এসেছি। এটা এমন বিষয়, যার কোনো অতীত দৃষ্টান্ত নেই। আমার আশা, সন্ধি হয়ে যাবে, তোমরা সবর কর'।[৪১৪]

এ ঘটনা থেকে বিশিষ্ট সাহাবিদের সতর্কতা এবং সমঝোতার পথ অনুসন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়।

কুফার ফকিহগণ স্বাগত জানালেন

হজরত আলি রা. যখন কুফায় পৌঁছেন, তখন চার হাজার ফকিহ তাকে স্বাগত জানান। এরা ছিল হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ছাত্র,। হজরত আলি রা. আনন্দিত হয়ে বলেন,

رحم الله ابن ام عبد، قد ملأ هذه القرية علما وفقها

> আল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি তো এ জনপদকে ইলম ও ফিকহ দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন।[৪১৫]

---

[৪১৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১১০, কিতাবুল ফিতান, বাবু কওলিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিল হাসান : ইন্না হাযা ইবনি সাইয়েদুন।

[৪১৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৯৫

[৪১৫] আল মাবসুত লিস সারাখসি : ১৬/৬৮, আরো দেখুন, নাসবুর রায়াহ।

সাহাবিদের মধ্যে যারা রাজনৈতিক মতবিরোধ থেকে দূরে ছিলেন

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. কুফার উপকণ্ঠে 'যি কার' নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। তারপর কুফার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, আমির এবং সেনাপতিকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন যে, আজকের এ সঙ্কটময় মুহূর্তে গোটা মুসলিমবিশ্ব এক দুর্যোগ ও অশান্ত অবস্থার শিকার। অতএব, সবাই যেন খেলাফত-ব্যবস্থার উপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি উদ্যোগের সমর্থন জানায়।

তারপর তিনি হজরত কারাযা বিন কা'ব আনসারি রা. কে কুফার নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন। সাথে সাথে কয়েকজনকে প্রতিনিধি বানিয়ে কুফার দিকে পাঠিয়ে দেন, যেন তারা নগরবাসীকে হজরত আলির পক্ষাবলম্বনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাদের মধ্যে ছিলেন হজরত আম্মার বিন ইয়াসির, হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং হজরত হাসান বিন আলি রা.।[৪১৬]

হজরত আলির প্রেরিত এ প্রতিনিধিদলকে নানা ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কেননা হজরত আলির সমর্থনে পূর্ণ উদ্যোমী কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি বিরোধীদলের নেতাদের সম্পর্কে অশালীন কথা বলা থেকে বিরত হচ্ছিলেন না। ফলে সাধারণ মানুষ ভুল ধারণার শিকার হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আশঙ্কা করছিলেন, মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাই ইরাকের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবি সাধারণ মানুষকে এ মতপার্থক্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

হজরত ইমরান বিন হুসাইন রা. এবং হজরত আহনাফ বিন কায়েস রা. হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে ভীষণ সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। ফলে হজরত ইমরান বিন হুসাইন রা. বসরার জামে মসজিদে ঘোষণা করিয়ে যাচ্ছিলেন, কোনো

---

[৪১৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮২, ৫০২, ৫০৩

পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে বকরি ও দুম্বা চরানো বিবদমান দুই পক্ষের কারো গায়ে হাত তোলার চেয়ে উত্তম।[৪১৭]

---

[৪১৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০২, ৫০৩

নোট : এ সকল সাহাবি মূলত ঐসব হাদিসের আলোকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছিলেন, যাতে মুসলমানকে হত্যা করার ব্যাপারে কঠোর থেকে কঠোরতর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। তা ছাড়া বহু হাদিসে ফেতনার সময় গৃহকোণে অবস্থান করারও আদেশ করা হয়েছে।

তবে এখানে যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে তা এই যে, এ সকল হাদিস হজরত আলি রা. এর সম্মুখেও ছিল। তবে হাদিসভাণ্ডারের প্রতি তার দৃষ্টি ছিল আরো অনেক গভীর। ফলে তার সম্মুখে ঐসব হাদিসও ছিল, যাতে ফেতনার সময় গৃহকোণে বসে থাকার আদেশ এ শর্তে করা হয়েছে, যখন মুসলমানদের কোনো ইমাম থাকবে না। যেমনটি হজরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার সম্মুখে ফেতনার যুগের কথা আলোচনা করলেন। তখন তিনি জানতে চাইলেন, এমন সময়ের জন্য আপনার নির্দেশনা কী?

আল্লাহর নবী ইরশাদ করলেন, تلزم جماعة المسلمين وامامهم মুসলমানদের জামাত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে।

হজরত হুযাইফা রা. আরজ করলেন, যদি মুসলমানদের জামাতও না থাকে, ইমামও না থাকে, তাহলে কী করবে?

আল্লাহর নবী ইরশাদ করলেন,

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك.

তাহলে সব দল থেকে পৃথক হয়ে যাবে; যদিও তাতে তোমাকে কোনো গাছের শেকড় কামড়ে থাকতে হয়। যতদিন পর্যন্ত তোমার মৃত্যু না হবে, ততদিন তুমি এ অবস্থায়ই থাকবে।

(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৬০৬, কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিন নুবুওয়াহ)

এজাতীয় বর্ণনাসমূহের আলোকে হজরত আলি রা. মনে করতেন, এখন যেহেতু মুসলমানদের খলিফা বিদ্যমান আছে, সুতরাং মুসলমানদের উচিত খেলাফত ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করা এবং খেলাফতের শক্তিশালী সমর্থক হওয়া। কোনো কোনো ফকিহ যে লিখেছেন যে, ফেতনার সময় গৃহকোণে বসে থাকা উচিত, এর অর্থও এটাই। আল্লামা কাসানি রহ. লিখেছেন,

وما روى عن ابى حنيفة رضى الله عنه انه اذا وقع الفتنة بين المسلمين فينبغى ان يعتزل الفتنة ويلزم بيته، محمول على وقت خاص وهو ان لا يكون امام يدعوه الى القتال، واما اذا كان فدعاه يفترض عليه الاجابة لما ذكرنا.

ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে যে কথা বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের মধ্যে যখন ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে, তখন মানুষের উচিত সে ফেতনা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং নিজের গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে থাকা, এটা মূলত এক বিশেষ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ যখন এমন কোনো ইমাম থাকে না, যিনি যুদ্ধের জন্য আহ্বান

হজরত ইমরান বিন হুসাইন রা. তার ঘনিষ্ঠ অনুসারী হুজাইর বিন রাবিকে বললেন, যাও, তোমার গোত্রের লোকদের নিষেধ করো, যেন তারা এই পরীক্ষায় নিপতিত না হয়।

সে বলল, আমি গোত্রের একজন সাধারণ মানুষ, কোনো নেতা নই।

তিনি বললেন, যাও, আমার পক্ষ থেকে পয়গাম দিয়ে নিষেধ করো।

হজরত ইমরান বিন হুসাইন রা. আরো বলতেন, আমি যদি একজন নিম্নশ্রেণির হাবশি গোলাম হয়ে কোনো পাহাড়ি ঝর্নার পাশে চাষাবাদ করি, আর সেই অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করি, তা হলে এটা এর থেকে উত্তম যে, বিবদমান উভয় পক্ষের কারো দিকে তির নিক্ষেপ করব, তা লক্ষ্য ভেদ করুক বা না করুক।[৪১৮]

এমনিভাবে হজরত আহনাফ বিন কায়েসও তার বাহিনী নিয়ে বসরা থেকে ৬ মাইল (সাড়ে ৯ কিলোমিটার) দূরে গিয়ে উভয় দল থেকে পৃথক হয়ে অবস্থান করেছিলেন; অথচ তিনি ছিলেন ৬ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর কমান্ডার।[৪১৯]

দুটি সশস্ত্র দলের মুখোমুখি হওয়ার পর, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সতর্কতা এবং সন্ধি-চেষ্টার পরও যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল।[৪২০]

করেন। সুতরাং যদি এমন কোনো ইমাম থাকে এবং তিনি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন, তাহলে প্রত্যেকের জন্য তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া ফরজ হয়ে যাবে। যার দলিল আমরা পেছনে উল্লেখ করে এসছি। (বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতীবিশ শারায়ে' : ৭/১৪০)

[৪১৮] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৮/১০৫

[৪১৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৯৮

[৪২০] সহিহ বুখারিতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসও বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে, যেখানে ইরশাদ হয়েছে,

عن ابی بکرة رضی الله عنه قال : لقد نفعنی الله بکلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بعد ما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة.

আবু বাকরা রা. বলেন, জঙ্গে জামালের সময় আমার হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করার উপক্রম হয়েছিলাম। কিন্তু তখন আল্লাহ তায়ালা একটি বাক্যের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করেছেন, যেটি আমি শুনেছিলাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন

বসরার লোকেরা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর আদেশে জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। হজরত ইমরান বিন হুসাইন রা. যখন তাদেরকে উভয় দল থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার আহ্বান করলেন, তখন বসরাবাসী তার কথা মানতে অপারগতা প্রকাশ করল। তাদের শীর্ষ নেতারা বলল, 'আমরা আল্লাহর রাসুলের সম্মানকে কোনো কিছুতেই নিরাশ্রয় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না।'[৪২১]

যাই হোক, হজরত আলি রা. জনবল বৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকলেন। এ বিষয়ে তার পক্ষ থেকে প্রেরিত কুফাগামী প্রতিনিধিদলের কার্যবিবরণী সহিহ বুখারি ও ইতিহাসের কিতাবের আলোকে পেশ করা হচ্ছে।

সংবাদ পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার কন্যাকে তাদের বাদশাহ বানিয়েছে, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, 'সেই জাতি কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না, যারা কোনো নারীর হাতে তাদের দায়িত্ব অর্পণ করে'।
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪২২৪, কিতাবুল মাগাযি, বাবু কিতাবিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা কিসরা)
হজরত আহনাফ বিন কায়েস রহ. কে পৃথক রাখার ক্ষেত্রেও হজরত আবু বাকরা রা. এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। আহনাফ রহ. নিজে বলেছেন, আমি হজরত আলি রা. এর সহযোগিতার জন্য যাচ্ছিলাম। এমন সময় হজরত আবু বাকরা রা. র সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারিসংবলিত এ হাদিস শুনিয়ে সেখানে যেতে নিষেধ করলেন,
اذا توجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار. (صحيح مسلم، ح : ٧٤٣٤، كتاب الفتن، ط دار الجيل)

তবে ইমাম নববি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ হুঁশিয়ারি মূলত তাদের জন্য, যারা কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে লড়াই করে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব রক্তপাত হয়েছে, তা এ হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত নয়।
আহলে সুন্নাতের আকিদা এবং সঠিক কথা এই যে, উক্ত মত পোষণকারী সাহাবিদের মধ্যে সুধারণা রাখতে হবে। কেননা তারা মুজতাহিদ ও ব্যাখ্যাকারী ছিলেন। পাপ কিংবা পার্থিব কোনো স্বার্থ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। (ইমাম নববিকৃত মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, কিতাবুল ফিতান)
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪২২৪, কিতাবুল মাগাযি, বাবু কিতাবিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা কিসরা)

[৪২১] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৩ সনদ সহিহ, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/২৮৮, সনদ হাসান।

কুফায় হজরত আলি রা. এর প্রতিনিধিদল

হজরত আলি রা. হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে কুফাবাসীদের নিকট পাঠালেন, যাতে তিনি সাধারণ মানুষকে বর্তমান খেলাফতের আনুগত্য স্বীকার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. একেবারে ইসলামের সূচনালগ্নে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মদিনায় হিজরতও করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'সে সর্বদা শয়তানের আসর থেকে সুরক্ষিত থাকবে।'[৪২২]

আরো ইরশাদ করেছিলেন, আম্মারকে যখনই দুটি বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে, তখন সে অধিক হেদায়েতসংবলিত দিকটি গ্রহণ করবে'।[৪২৩]

যাই হোক, হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. কুফায় পৌঁছলেন। কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবু মাসউদ এবং হজরত আবু মুসা রা.। তারা হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর কাছে এলেন। পরস্পর কথাবার্তা শুরু হলো। হজরত আবু মুসা রা. হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে বললেন, 'আমি আপনার সাথিদের থেকে যে-কারো সম্পর্কে কথা বলতে পারি; কিন্তু আপনার সম্পর্কে কিছু বলব না। আপনার ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে কোনো কাজ আমার কাছে এত খারাপ লাগেনি, যতটা লেগেছে চলমান বিতর্কিত বিষয়ে আপনার তাড়াহুড়ার কাজটি।

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. বললেন, 'আমার কাছেও আপনি এবং আপনার এই সাথি (আবু মুসা আশআরি রা.) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এ বিষয়ে আপনাদের ঢিলেমির কাজটি যত খারাপ লেগেছে, আপনাদের আর কোনো কাজ এত খারাপ লাগেনি।

---

[৪২২] বর্ণিত আছে-

الذى اجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعنى عمار بن ياسر (صحيح البخارى، ح : ٦٢٧٨، كتاب الاستيذان، باب من اتقى له وسادة)

[৪২৩] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৯৯ সনদ সহিহ।

অবশেষে হাসি-খুশি পরিবেশে তাদের আলাপচারিতা সমাপ্ত হয়। হজরত আবু মুসা আশআরি রা. ছিলেন বেশ বিত্তশালী। তিনি তার এ দুই বন্ধুকে এক জোড়া করে দামি কাপড় উপহার দেন। তারপর জুমার নামাজের জন্য এরা জামে মসজিদে গমন করেন।[৪২৪]

কুফার জামে মসজিদে পরামর্শসভা

জামে মসজিদে গিয়ে হজরত হাসান বিন আলি রা. মিম্বরের সবচেয়ে উঁচু আসনে বসেন। তার নিচে বসেন হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা.। অল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে ঘিরে বহু মানুষের সমাগম ঘটে।[৪২৫]

প্রথমে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কুফার সাবেক গভর্নর হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর নিকট আবেদন করেন, যেন উপস্থিত শ্রোতাদের সম্বোধন করে হজরত আলি রা. এর পক্ষাবলম্বনের প্রতি উৎসাহমূলক কিছু কথা বলেন। কিন্তু হজরত আবু মুসা রা. ছিলেন দ্বিধান্বিত। তাই কেবল এতটুকু বলতে পারলেন, 'হে লোকসকল, এটি এমন এক ফেতনা, যাতে কিছুই শোনা যায় না। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।'

তখন হজরত আলি রা. এর পক্ষাবলম্বনকারী হজরত যায়েদ বিন সুহান রহ. উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকার ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। উত্তরে হজরত শাবাস বিন রিবই নামের কুফার জনৈক সরদার বলেন, 'উম্মুল মুমিনিন আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী বের হয়েছেন এবং উম্মাহর সংশোধনের কাজ করছেন'।

একপর্যায়ে উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। চারদিক থেকে বিভিন্ন শোরগোল উঠতে থাকে। শোরগোল কিছুটা থামলে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. বলতে লাগলেন, 'হে লোকসকল, ফেতনা যখন আসে, মানুষকে সংশয় ও সন্দেহে ফেলে দেয়। তবে ফেতনা যখন কেটে যায়, তখন সবার কাছে তার রহস্য স্পষ্ট হয়ে যায়। চলমান বিতর্কটি

---

[৪২৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১০০, কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতিন তামুজু কাল বাহরি।

[৪২৫] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১০২, কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতিন তামুজু কাল বাহরি।

এমনই এক ফেতনা, বুঝমান মানুষও এখানে গতকালের শিশুটির মতো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর আমাদের ভাইদের রক্ত এবং সম্পদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তরবারি কোষবদ্ধ রাখো এবং যার যার ঘরে বসে যাও। আমার এ উপদেশ যদি মানতে পারো, তা হলে দীন ও দুনিয়া উভয় জগতে নিরাপদ থাকবে।'

হজরত আবু মুসা আশআরির বক্তব্য শেষ হতেই যায়েদ বিন সুহান রহ. আবার চিৎকার করে হজরত আলি রা. এর পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন এবং হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর বিরোধিতা করা আবশ্যক বলে দাবি করেন। তারপর সরাসরি হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে লক্ষ করে বলেন, 'যেমনিভাবে আপনি ফুরাত নদীর গতিপথ ফেরাতে পারবেন না, তেমনিভাবে আপনি যা চাচ্ছেন, তাও করতে পারবেন না।'

তারপর তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, লোকসকল, সবাই মিলে আমিরুল মুমিনিনের কাছে চলো।

যায়েদ বিন সুহান রহ. এর এমন জ্বালাময়ী বক্তব্যের প্রভাবে মজলিসজুড়ে আবারও হইচই শুরু হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু তার আগেই কুফার সেনাপতি হজরত কা'কা বিন আমর রা. দাঁড়িয়ে অত্যন্ত চিন্তাশীল ভঙ্গিতে বললেন, 'আসলে মূল কথা সেটি-ই, যা বলেছেন আমাদের আমির আবু মুসা আশআরি রা.। হায়, আমরা যদি তার কথা অনুযায়ী আমল করার কোনো উপায় খুঁজে পেতাম! তবে যায়েদ বিন সুহানের কথা অর্থহীন। আসল বিষয় হলো, এমন একটি শাসনব্যবস্থা থাকা জরুরি, যা লোকজনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করবে, অত্যাচারীকে দমন করবে এবং নির্যাতিতের পাশে দাঁড়াবে। এখন এর জন্য হজরত আলি রা. শাসক নিযুক্ত হয়েছেন। তার আহ্বান ইনসাফের আহ্বান। তিনি সংশোধনের দিকে আহ্বান করছেন। সুতরাং এ বিষয়ে পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলতে হবে।[৪২৬]

যায়েদ বিন সুহানের কঠোর বক্তব্যের বিপরীতে হজরত কা'কা বিন আমর রা. এর সুচিন্তিত বক্তব্য শ্রোতাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলল। কেউ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করল না।

---

[৪২৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮২, ৪৮৩

এ পর্যায়ে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য হজরত হাসান রা. দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমিরুল মুমিনিনের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ভাইদের কাছে চলুন। এ কাজের জন্য মানুষ তো পাওয়াই যাবে; তবে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা যদি খেলাফতের পক্ষাবলম্বনের সূচনা করে, তা হলে এর ফল খুবই সুন্দর হবে।'

ইত্যবসরে আশতার নাখায়ি আরেকবার মানুষের হৃদয় ও আবেগকে নেতিবাচকভাবে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে। হজরত উসমান রা.র উপর নানারকম অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপন করতে থাকে। তার কথা সহ্য করতে না পেরে হজরত মুকাত্তি বিন হাইসাম আমেরি চট করে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহর কসম, আমাদের মহান ব্যক্তিদের সমালোচনা করলে আমরা কিন্তু কিছুতেই সহ্য করব না।

হজরত হাসান রা. সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থন করে বলেন, তিনি সত্য বলেছেন।

এরপর সবাই নীরব হয়ে যায়। তারপর হুজর বিন আদি রা. এবং আম্মার বিন ইয়াসির রা. বক্তব্য রাখেন।[৪২৭]

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর বক্তব্য

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. তার বক্তব্যে চলমান প্রেক্ষাপট এবং উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা.-র মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর আলোকপাত করে বলেন, 'নিঃসন্দেহে আমাদের মা হজরত আয়েশা রা. বসরায় চলে গেছেন। আল্লাহর কসম, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরীক্ষা করছেন যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তোমরা (শরিয়তসম্মত খলিফা হজরত) আলির আনুগত্য করো, নাকি হজরত আয়েশার।[৪২৮]

---

[৪২৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮৫

[৪২৮] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১০০, কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতিন তামুজু কাল বাহরি, হাদিস : ৩৭৭২, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফাজলি আইশা রা., মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৮৩,

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.র সম্মান ও মর্যাদার প্রতি পূর্ণ লক্ষ রেখে কুফার মানুষকে হজরত আলি রা. এর পক্ষাবলম্বনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি এটিকে একটি ইজতিহাদি বিষয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ মানুষ এ সঙ্কটময় মুহূর্তে নিজ ইচ্ছা ও আবেগ অনুযায়ী চলে, না শরিয়তের বিধান দেখে চলে?

একবার হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা.-এর সম্মুখে কেউ উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর বিরুদ্ধে কিছু বললে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'চুপ কর দুরাচার, বাচাল কোথাকার, তুই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছিস'![৪২৯]

আমিরুল মুমিনিনের খেদমতে কুফাবাসী

হজরত হাসান বিন আলি এবং হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. কুফাবাসীকে হজরত আলি রা. এর পক্ষে আসার প্রতি উৎসাহিত করতে সফল হন। ৯ হাজার মুসলমানের এক বিরাট কাফেলা নিয়ে তারা আলি রা. এর নিকট পৌঁছেন।[৪৩০] সেই কাফেলায় ৮০০ আনসারি এবং ৪০০ বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সৌভাগ্যবান সাহাবি শামিল হয়েছিলেন।[৪৩১]

হজরত আলি রা. মুসলমানদের এ বিরাট বাহিনীর সম্মুখে নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে একটি ভাষণ দেন। তাতে বলেন, 'হে কুফাবাসী, আমি তোমাদের এজন্য ডেকেছি, যাতে তোমরা আমাদের সাথে আমাদের বসরার ভাইদের কাছে যাও। তারপর বসরার ভাইয়েরা যদি তাদের মত থেকে ফিরে আসে, তবে তো আমরা তা-ই চাই। আর যদি

---

৪২৯ সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৮৮৮, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু ফাজলি আইশা রা.; ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

৪৩০ তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮৫; এটিই বিশুদ্ধতম মত। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। (তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৮) যুহরি পর্যন্ত এর সনদ সহিহ।

৪৩১ তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৮৪, হাসান সনদে সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত।

ফিরে না আসে, তবু আমরা তাদের সাথে নম্র আচরণ করব। অকল্যাণের স্থলে আমরা এমন বিষয় গ্রহণ করব, যাতে সন্ধির পথ সুগম হয় ও কল্যাণ সাধিত হয়।'[৪৩২]

বসরাবাসীকে পক্ষে আনার জন্য হজরত আলি রা. এর প্রচেষ্টা

আলি রা. চাচ্ছিলেন এবার তার পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলমানদের এই বাহিনীর সহযোগিতায় বসরার বাহিনীকেও পক্ষে নিয়ে আসবেন। তারপর মুসলমানদের এ বিরাট জনশক্তি ও চিন্তাশক্তি একত্র হয়ে সব সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু এর জন্য প্রথমে হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর রা. এর পক্ষ থেকে খলিফার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশ করা আবশ্যক। নতুবা সমস্যা একই রকম থেকে যাবে এবং কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে একই গন্তব্যের পথিক এ দুটি দল আবারও ভিন্ন পথে চলতে শুরু করবে।

হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর রা. এর সংশয়

ইতিমধ্যে হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর রা. কিছুটা ধারণা করেছিলেন যে, তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তাই এ সময় হজরত যুবাইর রা. বলতেন, এটি সেই ফেতনা, যার সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

কেউ বলল, আপনি একে ফেতনাও বলছেন, আবার এতে লড়াইও করছেন।

তিনি বললেন, আসলে আমি অনেক চিন্তা করেছি; কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পাইনি। ইতিপূর্বে এজাতীয় কোনো ঘটনা ঘটেনি। এর আগে যেকোনো বিষয়ে আমরা আগে থেকে জানতে পারতাম যে, পরবর্তী পদক্ষেপে কী করতে হবে। কিন্তু চলমান বিষয়ে এতদূর এসেও বুঝতে পারছি না, আমরা সামনে অগ্রসর হচ্ছি, না পেছনে সরে যাচ্ছি।[৪৩৩]

এ দোদুল্যমানতা মূলত এজন্য ছিল যে, এ সকল সাহাবি দীনের গভীর জ্ঞান ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে হজরত আলি রা. এর সমকক্ষ ছিলেন না।

---

[৪৩২] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮৭

[৪৩৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮৬

আর এটা ছিল আদালত ও রাজনীতির এক জটিলতরো বিষয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে গভীর জ্ঞান ছিল হজরত আলি রা. এর। তাই তিনি কোনো দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই শরয়ি দলিল, নিজস্ব ইজতিহাদ এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করছিলেন। আর অন্যরা বারবার দ্বিধা ও সংশয়ের শিকার হচ্ছিলেন।

হজরত কা'কা বিন আমর রা. এর সফল দূতিয়ালি

হজরত আলি রা. হজরত কা'কা বিন আমর রা.-এর দূতিয়ালি-যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তদুপরি উম্মাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ও কল্যাণকামিতার গুণ সম্পর্কেও তিনি জানতেন। তাই হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর রা. এর কাছে হজরত কা'কা বিন আমর রা. কে দূত বানিয়ে পাঠালেন। বললেন, 'তাদেরকে মহব্বত ও ঐক্যের প্রতি আহ্বান জানাবেন এবং বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের ক্ষতি থেকে ভীতিপ্রদর্শন করবেন।

হজরত কা'কা বিন আমর রা. প্রথমে উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকার কাছে গেলেন এবং আরজ করলেন, আম্মিজান, আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছেন?

তিনি বললেন, বেটা, মানুষের সংশোধন এবং দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য।

হজরত কা'কা রা. তার উদ্দেশ্যের সাথে একাত্মতা পোষণ করে হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর রা.কেও তাদের মজলিসে আগমনের জন্য আহ্বান করলেন। তারপর তাদেরকে বললেন, উম্মুল মুমিনিন বলেছেন, তার আগমনের উদ্দেশ্য মানুষের সংশোধন করা। আপনারাও কি এ ব্যাপারে একমত?

উভয়ে বললেন, আমরা একমত।

হজরত কা'কা রা. তৎক্ষণাৎ বললেন, তা হলে এ সংশোধনের উপায় কী হতে পারে?

তারা উভয়ে বললেন, এর উপায় হজরত উসমান রা.র হত্যাকারীদের আটক করা। কেননা এ বিষয়টিকে পেছনে ফেলা কুরআনকে বর্জন করার নামান্তর। আর এটিকে সমাধান করা মূলত কুরআনের নির্দেশকেই বাস্তবায়ন করা।

হজরত কা'কা রা. এবার ধীর-শান্ত গলায় বলতে লাগলেন, দেখুন, আপনারা বসরার অধিবাসীদের থেকে হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের হত্যা করেছেন। তবে তাদের ৬০০ জনকে হত্যা করেছেন সত্য; কিন্তু পরিণামে প্রায় ৬ হাজার মানুষ আপনাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। আর তাদের নেতাদের থেকে বেঁচে যাওয়া একমাত্র হুরকুস বিন যুহাইরের সহযোগিতায় ওই ৬ হাজার তার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এখন যদি আপনারা ওই এক ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন, তা হলে আপনারাই কিন্তু কিসাসের মাসআলা পেছনে ছুঁড়ে ফেলছেন। আর যদি ওই এক ব্যক্তির পক্ষে যারা গেছে, তাদের সাথেও যুদ্ধ করেন, তা হলে যে গৃহযুদ্ধ থেকে উম্মাহকে বাঁচানোর জন্য আপনারা বের হয়েছেন, নিজেরাই তাতে জড়িয়ে পড়ছেন।[৪৩৪]

বস্তুত এটিই ছিল সেই তিক্ত সত্য, যার অনুভূতি খোদ হজরত তালহা, হজরত যুবাইর এবং উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এরও ছিল। তাই হজরত কা'কা বিন আমর রা.-এর বাস্তবমুখী মন্তব্য শুনে উম্মুল মুমিনিন জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে আপনি বলুন কী বলতে চাচ্ছেন?

তিনি বললেন, আমি মনে করি, এই সমস্যার সমাধান এই যে, পরিস্থিতি শান্ত হতে দিতে হবে। পরিস্থিতি যদি শান্ত হয়, তা হলে দাঙ্গাবাজদের মধ্যে

---

[৪৩৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮৮, ৪৮৯

এ সকল সাহাবির মতে হজরত উসমানের উপর প্রাণঘাতী আঘাতকারীরাই কিসাসস্বরূপ হত্যার উপযুক্ত ছিলেন না; বরং হত্যাকারীদের সহযোগী, সমর্থক সকলের উপরই কিসাস আবশ্যক ছিল। এ কারণেই বসরায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়েছিল, যারা হাঙ্গামার জন্য মদিনায় গিয়েছিল, তারা সরাসরি হত্যায় জড়িত থাক বা না থাক।

হজরত কা'কা রা. এর কথার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি হত্যাকারীদের সহযোগীদের থেকেও কিসাস নেওয়া শরিয়তি দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব ধরা হয়, তাহলে তাদের নবীন সহযোগীদের প্রতিও কিসাসের বিধান আরোপ করা উচিত; তাদের সংখ্যা যত হাজার বা যত লক্ষই হোক না কেন। আর যদি নতুনদের ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা ও বিবেচনার সুযোগ থাকে, তাহলে হজরত আলির জন্য সে সুযোগ কেন থাকবে না?

বাহ্যিকভাবে মনে হয়, হজরত কা'কা রা. কে দূত হিসেবে প্রেরণের সময়ই হজরত আলি মুরতাজা রা. তাকে এমন সুদৃঢ় দলিল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। নতুবা হজরত কা'কা রা. নিজে তো ইলম ও মর্যাদার দিক থেকে জান্নাতি দশ সাহাবি এবং উম্মুল মুমিনিনের সমকক্ষ ছিলেন না। অবশ্য বাকপটুতা ও সমরবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

কোন্দল সৃষ্টি হবে। আপনারা যদি বাইয়াত হন, তা হলে সেটা কল্যাণের নিদর্শন এবং রহমতের সুসংবাদ হবে। তখন হজরত উসমান রা. এর কিসাস নেওয়া সম্ভব হবে। আপনারা যদি একমত না হন, হজরত উসমানের রক্ত বৃথা যাবে। এটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এ তো কোনো একজন মানুষের হত্যা নয়, যাকে এক ব্যক্তি, অথবা একটি দল, অথবা একটি গোত্র হত্যা করেছে।

উম্মুল মুমিনিন এবং হজরত তালহা ও যুবাইর রা. হজরত কা'কা রা. এর এ যৌক্তিক কথার সাথে পূর্ণ একমত পোষণ করে বললেন, যদি হজরত আলি রা. আসেন এবং এই মতই পোষণ করেন, তা হলে ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে।

হজরত কা'কা বিন আমর রা. ফিরে এসে হজরত আলি রা. কে ঘটনা জানালে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন।[৪৩৫]

সাবায়িদের সাথে হজরত আলি রা. এর সম্পর্কহীনতার ঘোষণা

হজরত উসমান রা. এর কিসাস বিষয়ে বসরাবাসীর সাথে সন্ধির সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, বিষয়টি হয়তো এখন সমাধান হয়ে যাবে। হজরত আলি অনুভব করলেন, এখন আর নিষ্ঠাবানদেরকে কোনো ভুল ভাবনায় এবং দুষ্কৃতিকারীদেরকে কোনো খুশির চিন্তায় ফেলে রাখা ঠিক হবে না। বসরা থেকে লোকজন এসে কুফাবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করছিল এবং একতা ও ঐক্যের এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

এহেন হৃদয়জুড়ানো পরিবেশে একদিন হজরত আলি রা. এক উন্মুক্ত মজলিসে বাধা-বন্ধনহীনভাবে বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি বললেন, 'প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ, হজরত উসমান রা.কে হত্যার যে নির্মম ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য আসলে এমন কিছু মানুষ দায়ী, যারা দুনিয়াদার। যারা কিছু মানুষের খোদাপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে হিংসা করছিল। শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক শৃঙ্খলাকে তারা ওলট-পালট করে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সিদ্ধান্তকে পূর্ণতা না দিয়ে ছাড়বেন না। তিনি যদি দিতে চান, তবে সে বিপদ না এসে উপায় নেই। যাই হোক, কাল আমি (বসরার ভাইদের কাছে) যাচ্ছি। তোমরাও আমার

---

[৪৩৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮৯

সাথে যাবে। তবে, যারা হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে যেকোনোভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তারা যেন কখনোই আমার সাথে না যায়। এই নির্বোধরা যেন নিজেদেরকে আমার থেকে পৃথক মনে করে।'[৪৩৬]

হজরত আলি রা. এর এ ঘোষণার ফলে একদিকে যেমন খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল, অন্যদিকে তেমনি খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা হকচকিয়ে উঠল।

ইবনে সাবার গোপন পরামর্শ এবং নতুন ষড়যন্ত্র

উক্ত মজলিসের শ্রোতাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন সাবাও উপস্থিত ছিল। হজরত আলি রা. এর ঘোষণা শুনেই সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গোল পাকিয়ে বসল।[৪৩৭] কারণ, এ ঘোষণার ফলে তারা জীবন নিয়ে শঙ্কিত

---

[৪৩৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৮৯

[৪৩৭] আবদুল্লাহ বিন সাবার গোপন পরামর্শ সম্পর্কিত এ বর্ণনাটি সনদের বিচারে দুর্বল। কেননা সঙ্গতভাবেই এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, এত গোপন পরামর্শের খবর বর্ণনাকারীই-বা জানল কী করে?

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় সকল ঐতিহাসিক এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। কারণ, এর পর যা যা ঘটেছে, তা এমন কোনো ষড়যন্ত্রের কথাই প্রমাণ করে। আর হতে পারে যে, ঐ অপরাধীদেরই কোনো একজন পরে তাওবা করে এ ঘটনা বর্ণনাকারী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

তবে এখানে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে। তা হলো, তাবারির এ দুর্বল বর্ণনায় ঐসব চক্রান্তকারীর তালিকায় হজরত আদি বিন হাতেম রা. এর নামও আনা হয়েছে। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল। সাবায়িদের সাথে হজরত আদি বিন হাতেম রা. এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি তো বরং সাবায়িদের চরমভাবে ঘৃণা করতেন। কুফা ছেড়ে তিনি এজন্যই করকেসিয়া গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন যে, কুফায় এজাতীয় লোকেরা হজরত উসমান রা. এর প্রতি নানা ধরনের অপবাদ আরোপ করত। (তারিখে বাগদাদ : ১/২০৪)

বিষয়টি হলো, যেহেতু এ বর্ণনার সনদে দুর্বল বর্ণনাকারী আছে, তাই হতে পারে তাদেরই একজন হজরত আদি বিন হাতেম রা. এর নাম জুড়ে দিয়েছে।

সনদের দুর্বলতা ছাড়াও এ বর্ণনার আরেকটি প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাপার হলো, এতে আশতার নাখায়ির নামও আছে। কেননা 'বর্ণনাকারীদের পর্যালোচনা'বিষয়ক অধিকাংশ আলেম আশতার নাখায়িকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলে গণ্য করেছেন। এটা সত্য যে, তার মাথায় কিছুটা সমস্যা ছিল। কিন্তু তাই বলে আবদুল্লাহ বিন সাবার সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শেও সে যুক্ত ছিল, এটা দুষ্কর মনে হয়। কেননা সে যদি আবদুল্লাহ বিন সাবার এতটা ঘনিষ্ঠ হতো, তাহলে হজরত আলি রা. তাকে

হয়ে পড়েছিল। তাদের একজন বলল, আলি এটা কী বলল? আল্লাহর কসম, উসমানের কিসাসের দাবিদার সমস্ত মানুষের মধ্যে আলিই পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বড় আলেম এবং আমলদার। আর সে যা বলে গেল, তা তো তোমরা শুনেছ। এখন তার সঙ্গে কেবল তারাই যেতে পারবে, যারা উসমানের কিসাসের দাবিদার। সবাই যখন আমাদের লক্ষ্যস্থল বানাবে, তখন আমাদের এই অল্প সংখ্যক লোকের কী পরিণতি হবে!

আরেকজন বলল, তালহা ও যুবাইর আমাদের সম্পর্কে যা চিন্তা করে, তা আমরা আগে থেকেই জানি। কিন্তু আলির মতামত সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল না। আল্লাহর কসম, এদের সকলের মত আমাদের সম্পর্কে একই। আলি যদি তাদের সাথে সন্ধি করে ফেলে, তবে সে সন্ধি হবে আমাদের রক্ত প্রবাহিত করার শর্তে। সুতরাং এখন করণীয় হলো, আলিকেও উসমানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া।

আবদুল্লাহ বিন সাবা এ প্রস্তাব নাকচ করে বলল, সম্পূর্ণ ভুল। আলিকে যদি হত্যা করা হয়, তা হলে আমাদের সকলকে হত্যা করা হবে। তোমরা তো এখানে কেবল পঁচিশ বা ছাব্বিশ শ' লোক। আর ওদিকে তালহা ও যুবাইর ৫ হাজার মানুষ নিয়ে প্রস্তুত, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে হত্যা করা। তাদের মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই।

আলবা' বিন হাইসাম বলতে লাগল, চলো, আমরা অন্য কোনো দেশে পালিয়ে যাই, যেখানে অন্যদের নিয়ে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব।

এ কথা শুনে আবদুল্লাহ বিন সাবা বলল, একদম বাজে কথা। এমনটা করলে মানুষ তোমাদেরকে বেছে বেছে শেষ করবে।

শুরাইহ বিন আউফা পরামর্শ দিয়ে বলল, যে কাজ দ্রুত করতে হয়, তাতে বিলম্ব করো না। আজ আমরা মানুষের চোখে সবচেয়ে নিকৃষ্ট

সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতেন না। তাই সম্ভবত কোনো সাবায়ি বর্ণনাকারী আশতার নাখায়ির নাম উক্ত বর্ণনায় যুক্ত করে দিয়েছে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরকে নিজেদের দলীয় লোক বলে প্রচার করা সাবায়িদের এক বিশেষ ফন্দি।

দল। জানি না, সবাই একমত হয়ে কাল আমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে।

সালেম বিন সা'লাবা বলল, এখন তো এটাই করতে হবে যে, মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাদের উপর তরবারি চালাতে হবে। তরবারির ধার দিয়েই তাদের সব পরিকল্পনা টুকরো টুকরো করে দিতে হবে।

এবার ইবনে সাবা খুশিতে নেচে উঠল এবং বলল, 'এবার বলেছ আসল কথা'।

তারপর সে সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল যে, মানুষের মধ্যে মিশে থাকার মধ্যেই আমাদের নিরাপত্তা। তারপর যখন সব মানুষ পরস্পরে মিলে যেতে শুরু করবে, তখন হঠাৎ যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। ওদেরকে চিন্তাভাবনার জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে বসারই সুযোগ দেবে না। তা হলে মানুষের জন্য যুদ্ধ থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। ফল এই হবে যে, আলি, যুবাইর, তালহা এবং তাদের অনুসারীদের জন্য এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণেরই সুযোগ হবে না, যা আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হবে।

ইবনে সাবার এই কূটচালে সবাই একমত হলো। তারপর এটা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা স্থির করে সবাই যার যার পথে চলে গেল।[৪৩৮]

বসরার বাহিনীতে অতি আবেগী ও স্বার্থান্বেষীদের অনুপ্রবেশ

কিছু অতি আবেগী ও স্বার্থান্বেষী লোক হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর রা. এর আশপাশেও জড়ো হয়েছিল, যাদের উদ্দেশ্য ছিল হাঙ্গামা ও যুদ্ধ বাধিয়ে নিজেদের স্বার্থ কুড়ানো।

একদিন হজরত তালহা রা. এমন লোকদের হইচইয়ে বিরক্ত হয়ে চুপ থাকার আদেশ করলেন। লোকেরা যখন বিরত হলো না, তখন অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আফসোস, শত আফসোস, এরা তো লোভাতুর মাছি এবং আগুনে ঝাঁপ দেওয়া পতঙ্গেরই মতো।'[৪৩৯]

বস্তুত এ ধরনের লোকেরাই উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধানোর কারণ হয়েছিল।

---

[৪৩৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৯৩, ৪৯৪

[৪৩৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৮২

একটি সংশয় ও তার নিরসন

হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে সাবায়িদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণার পর থেকে ইবনে সাবা ও তার দোসররা নতুন করে যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তা দেখলে আজ অবশ্যই মনে হতে পারে, আমিরুল মুমিনিন যদি আরো কিছুদিন তার মনের অবস্থা গোপন রাখতেন, তা হলে কী অসুবিধা হতো? এ ঘোষণা শুনে তো সাবায়িরা সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এবং তাদের অনুসারীদের সাথে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য সৃষ্টি হওয়ার পর যদি তিনি ঘোষণা করতেন, তা হলে কী ক্ষতি হতো?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে উন্মুক্ত মজলিসে এমন ঘোষণা আসা ছাড়া একতা ও ঐক্যের ব্যাপক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া বড় দুঃসাধ্য ছিল। কেননা এমন প্রকাশ্য সম্পর্কহীনতার ঘোষণা ছাড়া বসরার লোকেরা হজরত আলি রা. এর উপর আস্থাশীল হতে পারছিল না।

তা ছাড়া বিষয়টি ততদিনে কেবল হজরত আলি, হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর রা. এর মতবিরোধ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং মুসলমানদের দুটি বড় দলের মতবিরোধ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। সুতরাং এহেন প্রেক্ষাপটে হজরত আলি রা. যদি প্রকাশ্যভাবে এমন ঘোষণা না দিতেন, তা হলে হয়তো সাধারণ জনমত হজরত তালহা ও যুবাইর রা. কে হজরত আলি রা. এর সাথে সন্ধি করতে দিত না।

হজরত আলি রা. কুফা থেকে বসরার পথে

হজরত কা'কা বিন আমর রা. এর মধ্যস্থতায় বিরোধপূর্ণ দুটি পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও সন্ধির সম্ভাবনা ও আশা পরিপক্বতা লাভ করেছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত রীতিমতো সন্ধিচুক্তি হয়নি। এই অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে হজরত আলি রা. স্বয়ং কুফা থেকে রওনা করলেন এবং জুমাদাল আখিরাতে বসরার উপকণ্ঠে গিয়ে উপনীত হলেন।[৪৪০]

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এ সফরে হজরত আলি রা. এর সাথে ৯ হাজার ৭০০ মানুষ ছিল। হজরত আলির পুত্র মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া বলেন,

---

[৪৪০] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৬

মদিনা থেকে আমরা কেবল ৭০০ ব্যক্তি রওনা করেছিলাম। কুফা থেকে ৭ হাজার মানুষ আমাদের সাথে চলতে শুরু করে। এ ছাড়া পথিমধ্যে আশপাশ থেকে আরো ২ হাজার সফরসঙ্গী হয়। এদের অধিকাংশই ছিল বকর বিন ওয়ালের গোত্রের সদস্য।[৪৪১]

উভয় পক্ষ সামনা-সামনি হলো। তখন হজরত আলি রা. হজরত যুবাইর রা. কে ডেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দেন। নবীজি বলেছিলেন, 'যুবাইর একদিন অন্যায়ভাবে আলির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে'।

হজরত যুবাইর রা. এর হাদিসটি স্মরণ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার মত পরিত্যাগ করার কসম করেন এবং সেখান থেকে চলে যেতে শুরু করেন।[৪৪২]

হজরত যুবাইর রা. এর পুত্র আবদুল্লাহ রা. এ সংবাদ জানতে পেরে পিতাকে বললেন, আপনি তো হজরত আলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এখানে আসেননি। আপনার উদ্দেশ্য তো অবস্থার সংশোধন করা। সুতরাং এখানেই থাকুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার মাধ্যমে উম্মাহর দুটি দলকে একত্র করে দেবেন।

তিনি বললেন, আমি তো কসম করেছি, তার বিরোধিতা করব না।

হজরত আবদুল্লাহ রা. উম্মাহর অবস্থা সংশোধনের গুরুত্ব তুলে ধরলেন। তারপর বললেন, কসমের কাফফারাস্বরূপ একটি গোলাম আজাদ করে দিন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে কার্যকরভাবে একতা ও ঐক্য গড়ে না ওঠে, ততক্ষণ এখানেই অবস্থান করুন।

হজরত যুবাইর রা. এর কাছে এই পরামর্শটি পছন্দ হয়। তাই তিনি সেখানে অবস্থান করেন।[৪৪৩]

উভয় দল সামনা-সামনি শিবির স্থাপন করে। উভয় পক্ষের মুসলমানরা একে অপরের তাঁবুতে এসে সাক্ষাৎ করতে থাকে।[৪৪৪]

---

[৪৪১] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৫, হাসান সনদে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহ. থেকে বর্ণিত।... এ সংখ্যা দুর্বল বর্ণনাগুলোতে বেশ অতিরঞ্জিত।

[৪৪২] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৫৭৪। ইমাম জাহাবি একে বিশুদ্ধ বলেছেন।

[৪৪৩] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৫৭৫।

বিশিষ্ট সাহাবিদের পরস্পর সাক্ষাৎ এবং সন্ধির ঘোষণা

হজরত আলি রা. তৎক্ষণাৎ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.কে পাঠিয়ে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, এমন কোনো বিষয় আছে কি, যার কারণে আপনারা আমার খেলাফতের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? যেমন কোনো সিদ্ধান্তে বে-ইনসাফি, অথবা বেতন-ভাতায় কারো হক নষ্ট হওয়া, কিংবা অন্যকিছু?

তারা উভয়ে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উত্তর দিলেন, এগুলোর কিছুই নয়।[৪৪৫]

তখন উভয় তাঁবুর মধ্যখানে আরেকটি তাঁবু স্থাপন করা হয়। সেখানে হজরত তালহা, হজরত যুবাইর এবং হজরত আলি রা. পরস্পর সাক্ষাৎ করেন। তিনদিন পর্যন্ত তারা সেখানে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করতে থাকেন। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমাদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো যুদ্ধ হবে না। বরং সন্ধি ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে আমরা আমাদের শরয়ি দায়িত্ব সম্পাদন করব।[৪৪৬]

এভাবে সন্ধি ও ঐক্যের ঘোষণা আসার পর উভয়পক্ষের মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

কিন্তু দাঙ্গাবাজ ও দুষ্কৃতিকারীরা ইতিমধ্যে তাদের নতুন চক্রান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, যদি শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ আরো উন্নত হতে থাকে, তা হলে তারা কোথাও দাঁড়াবারও জায়গা পাবে না। তাই তাদের কিছু লোক গোপনে রাতের আঁধারে হজরত আলি রা. এর বাহিনী থেকে বের হয়ে হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর রা. এর তাঁবুতে চলে যায়। যেহেতু উভয় পক্ষের লোকদের জন্য আসা-যাওয়াতে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না, তাই তাদের জন্য অপর তাঁবুতে গিয়ে স্থান করে নিতে কোনো বেগ পেতে হয়নি।[৪৪৭]

---

[৪৪৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৬

[৪৪৫] ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. কৃত ফাজাইলুস সাহাবা, হাদিস : ১০১৫, সনদ হাসান।

[৪৪৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৭৭, তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৬

[৪৪৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৬, সাইফ থেকে বর্ণিত।

জঙ্গে জামাল

তার পরের দিনই হঠাৎ উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। অথচ বাহ্যিকভাবে কোনো কারণ বা ইঙ্গিতই দেখা যাচ্ছিল না। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে 'জঙ্গে জামাল' বা উটের যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, এতে একপর্যায়ে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. উটের পিঠে বসেছিলেন এবং তার পাশেই যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ লড়াইটি হয়েছিল।

জঙ্গে জামালের যে বিষয়গুলো সহিহ সনদে প্রমাণিত

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণের আগে জেনে রাখা ভালো যে, হাদিসের সহিহ বর্ণনাগুলোর আলোকে এ যুদ্ধের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। যথা :

১. হজরত আলি রা. এই যুদ্ধ থেকে সাধ্যানুযায়ী বিরত ছিলেন। অবশেষে হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর রা. এর বাহিনীর পক্ষ থেকে হাঙ্গামা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।[৪৪৮]

২. তবে বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। বরং চাক্ষুষ সাক্ষী অনুযায়ী উভয়পক্ষেই সন্ধির পরিবেশ বিরাজ করছিল। এমন সময় হঠাৎ উভয় দল থেকে কিছু যুবক বের হয় এবং একে অপরকে গালমন্দ করতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে উভয় দিক থেকে তির ছোঁড়া শুরু হয়। উভয় পক্ষের গোলামরাও ছুটে আসে এবং সাধারণ অজ্ঞ লোকেরাও উত্তেজিত হয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[৪৪৯]

---

[৪৪৮] শরহু মাআনিল আসার লিত তহাবি, হাদিস : ৫১১২, কিতাবুস সিয়ার, এ বর্ণনাটি হজরত আলি রা. এর এক অনুসারী থেকে বর্ণিত, যিনি ছিলেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তার নাম যায়েদ ইবনে ওয়াহব রা.।

[৪৪৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৫৭, সনদ সহিহ। বর্ণনাটিও হজরত আলি রা. এর এক অনুসারী থেকে বর্ণিত, যিনি ছিলেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তার নাম

৩. মূল যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর। কিছুক্ষণের মধ্যে যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন হজরত আলি রা.-ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার আদেশ দেন। তারপরই উভয়পক্ষ থেকে বর্শা ও তরবারির মাধ্যমে তুমুল লড়াই শুরু হয়।[৪৫০]

৪. যুদ্ধটি খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হয়েছিল। জোহর থেকে আসর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সূর্য ডোবার আগেই শেষ হয়ে যায়।[৪৫১]

ইতিহাসের আলোকে জঙ্গে জামালের বিস্তারিত বিবরণ

ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী বসরার বাহিনীতে অনুপ্রবেশকারী সাবায়িরা তাদের পরিকল্পনা মাফিক হজরত আলি রা. এর তাঁবুর উপর হঠাৎ হামলা চালায়। ঠিক একইভাবে হজরত আলির দলে লুকিয়ে থাকা সাবায়িরা হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর রা. এর অনুসারীদের উপর আক্রমণ করে। অল্প সময়ের মধ্যে উভয়পক্ষ থেকে তিরবৃষ্টি শুরু হয়। প্রত্যেকেই মনে করতে থাকে যে, অপরপক্ষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে হঠাৎ আক্রমণ করেছে। ধীরে ধীরে উভয় পক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে।[৪৫২]

হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর রা. হাঙ্গামার দৃশ্য দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তাদেরকে বলা হয় যে, কুফার লোকেরা হঠাৎ আক্রমণ চালিয়েছে।

আসেম ইবনে কুলাইব। আরো দেখুন, তারিখুত তাবারি : ৪/৪৯২, আসেম ইবনে কুলাইব থেকে বর্ণিত।

[৪৫০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৭৭৭৭, সনদ সহিহ। এটি হজরত আলি রা. এর বিশিষ্ট অনুসারী থেকে বর্ণিত, যার নাম আবদে খায়ের। বর্ণনটির শব্দ, অর্থাৎ জমা মুতাকাল্লিমের সিগাহ প্রমাণ করে যে, সে যুদ্ধে শামিল ছিল।

[৪৫১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৩৩, বাবু মাসিরি আয়েশা ও আলি এবং তালহা ও যুবাইর রা.। যায়েদ ইবনে ওয়াহব থেকে বর্ণিত, হাদিস : ৩৭৭৫৪, সনদ সহিহ, বর্ণনাটিও হজরত আলি রা. এর এক অনুসারী থেকে বর্ণিত, যিনি ছিলেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তার নাম আসেম ইবনে কুলাইব।

[৪৫২] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৬, ৫০৭ সাইফ থেকে বর্ণিত। প্রকাশ থাকে যে, এ বর্ণনায় উল্লেখ আছে, সাবায়িরা খুব ভোরে আলো ফোটার আগেই হামলা করেছিল। অবশ্য সহিহ বর্ণনার সাথেও এর সমন্বয় করা সম্ভব। সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

আসলে সাবায়িরা ভুল খবর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত করে রেখেছিল। তারা একজনকে হজরত আলি রা. এর আশপাশে থাকার জন্যও নিযুক্ত করেছিল, যাতে সে হজরত আলিকে ভুল সংবাদ দেয়। এ কারণেই হাঙ্গামার হইচই শুনে যখন হজরত আলি রা. ব্যাপার কী জানতে চান, তখন তিনি এই উত্তরই শুনতে পান যে, বসরার লোকেরা হঠাৎ আমাদের উপর গুপ্ত হামলা চালিয়েছে।

এই সংবাদ শোনার পর হজরত আলি রা. সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুদ্ধের ছুটোছুটি বন্ধ করার জন্য তিনি ঘোষণা করে দেন যে, হে লোকসকল, শান্ত হোন।[৪৫৩]

কিন্তু যে তরবারি খাপমুক্ত, তা আবার খাপবদ্ধ হওয়া সহজ নয়। যদিও উভয় পক্ষের বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ খুব সাবধান ছিলেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে হজরত যুবাইর রা. হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর বর্শার আওতায় এসে পড়লে হজরত যুবাইর বলে ওঠেন, আপনি আমাকে হত্যা করতে চান?

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. বলেন, না, আপনি সরে যান।[৪৫৪]

মোটকথা, এভাবেই বহু মানুষ তাদের হাত বিরত রাখার চেষ্টা করছিল; কিন্তু সাবায়ি, দাঙ্গাবাজ এবং অজ্ঞ ও ক্ষিপ্ত লোকেরা উভয় দলেই তুমুল বেগে যুদ্ধে মেতে উঠেছিল। তাই বাধ্য হয়ে বহু মানুষকে আত্মরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল।[৪৫৫]

হজরত যুবাইর রা. যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়লেন

হজরত যুবাইর রা. যুদ্ধের ক্রমবর্ধান পরিস্থিতি দেখে রণক্ষেত্র ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই কঠিন হাঙ্গামার সময় তার হাতে কোনো মুসলমানের রক্ত ঝরতে পারে; তাই পুত্র হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.কে ডেকে বললেন, আজ যারা

---

[৪৫৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৭; সাইফ থেকে বর্ণিত।
[৪৫৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৫১২; আমর ইবনে শাব্বাহ থেকে বর্ণিত।
[৪৫৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৭ সাইফ থেকে বর্ণিত।

জীবন হারাবে, তারা প্রত্যেকেই হয়তো জালেম হবে, নয়তো মজলুম। আর আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমি নির্যাতিত হয়ে নিহত হব।'[৪৫৬]

একথা বলে তিনি যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান।[৪৫৭]

হজরত তালহা রা. র শাহাদাত

যুদ্ধের শুরুর দিকেই আচমকা কোথা থেকে একটি তির এসে হজরত তালহা রা. এর মাথায় বিদ্ধ হয়। এ তিরের আঘাতেই তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।[৪৫৮] তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বা ৫৮ বছর।[৪৫৯]

---

[৪৫৬] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩১২৯, কিতাবুল জিহাদ, বাবু বারাকাতিল গাজি ফী মালিহি। এ বর্ণনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি রহ. বলেন, হজরত যুবাইর রা. যখন যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখতে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, মানুষ যুদ্ধ না করে এখান থেকে যাবে না, তখন তিনি বললেন, 'আমি মজলুম অবস্থায় নিহত হব'। তার কারণ, তিনি যুদ্ধের কোনো ইচ্ছায়ই করেননি। (উমদাতুল কারী : ১৫/৫১)

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, দুর্বল বর্ণনাগুলোতে বলা হয়েছে, যুদ্ধ চলাকালে হঠাৎ কেউ এসে হজরত যুবাইর রা. কে বলল, হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. হজরত আলি রা. এর দলে আছেন। হজরত যুবাইর রা. আচমকা এ খবরে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. যে হজরত আলি রা. এর বিশেষ বন্ধু ছিলেন, সে কথা সকলেরই জানা ছিল।

[৪৫৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৩৪ সাইফ থেকে বর্ণিত।

[৪৫৮] বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, হজরত তালহা রা. উপর তির নিক্ষেপ করেছিল মারওয়ান। কেননা তার সন্দেহ হয়েছিল যে, হজরত তালহা রা. হয়তো হজরত উসমান রা. এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। বর্ণিত আছে,

رمى مروان بن الحكم يوم الجمل طلحة بسهم (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٧٧٠ باسناد صحيح، ط الرشد)

এক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী বর্ণনা হচ্ছে, হজরত উসমান রা. এর কিসাস আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রসিদ্ধ তাবেয়ি কায়েস বিন আবি হাযেমের চাক্ষুষ সাক্ষ্যসংবলিত বর্ণনা। তিনি বলেন,

رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم

ইবনে সা'দ, তাবারানি এবং হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা হাইসামি রহ. এ সম্পর্কে বলেন,

رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد، ح : ١٤٨٢٢)

ইমাম বায়হাকি রহ. আল ই'তিকাদ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, হজরত তালহার মাথায় যখন তির এসে লাগল, তখন প্রাণ বের হওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি হজরত আলি রা. এর দলের এক ব্যক্তিকে ডেকে তার হাতে হাত রেখে হজরত আলি রা. এর পক্ষে বাইয়াত নবায়ন করেন। হজরত আলি রা. যখন এই ঘটনা জানানো হলো, তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে 'আল্লাহু আকবার' বলে ওঠেন এবং বলেন, 'আল্লাহর কাছে কেবল এটাই মঞ্জুর ছিল যে, তিনি আমার বাইয়াত সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।'

এমনিভাবে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, হজরত যুবাইর রা. যুদ্ধ পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, তখন তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি ভীরুতার কারণে চলে যাননি, বরং তাওবা করে ফিরে গেছেন।'[৪৬০]

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর রণক্ষেত্রে আগমন

যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. রণাঙ্গন থেকে দূরে, বসরার জনবসতিতে অবস্থান করছিলেন। বসরার কাজি হজরত কা'ব বিন সুর রহ. এসে তাকে এ হৃদয়বিদারক যুদ্ধের সংবাদ দিয়ে বলেন, 'আপনি সশরীরে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদেরকে তরবারি কোষবদ্ধ করার আহ্বান করুন। হয়তো আল্লাহ তায়ালা আপনার বদৌলতে সন্ধির ব্যবস্থা করে দেবেন।'

হাফেজ ইবনে হাজারও এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে সহিহ বলেছেন। (আল ইসাবাহ : ৩/৪৩২)

হাফেজ ইবনে কাসিরও এ বর্ণনাকেই প্রসিদ্ধ উক্তি বলেছেন। কিন্তু সাথে বলেছেন, হজরত তালহার প্রতি কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি তির নিক্ষেপ করেছিল- এটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪৭২)

কিন্তু দ্বিতীয় মতটিকে ইবনে কাসির রহ. এর অধিক যুক্তিসঙ্গত বলাটা বোধগম্য নয়। কারণ, এর বর্ণনাকারী সাইফ বিন উমর দুর্বল রাবি। (আল ফিতনাতু ও ওয়াকআতুল জামাল : পৃষ্ঠা : ১৫৭, তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৮) খলিফা বিন খাইয়াতও এ দ্বিতীয় মতটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। অথচ প্রথম উক্তির জন্য তিনি সহিহ বর্ণনা এনেছেন। (তারিখে খলিফা : পৃষ্ঠা : ১৮১)

[৪৫৯] ফাতহুল বারি : ৭/৮২

[৪৬০] আল ই'তিকাদ লিল বাইহাকি, পৃষ্ঠা : ৩৭১

উম্মুল মুমিনিন রা. নিজের জীবন শঙ্কার মধ্যে ফেলে উটের পিঠে আরোহণ করে যুদ্ধের ময়দানে আসেন। হজরত কা'ব রা. এর হাতে পবিত্র কুরআনের নুসখা (কপি) দিয়ে বলেন, আপনি আল্লাহর কিতাব হাতে নিয়ে অগ্রসর হোন এবং মানুষকে এর দিকে আহ্বান করুন।

হজরত কা'ব বিন সুর রা. পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠা খুলে ময়দানে অগ্রসর হলেন। তিনি কুরআনের আদেশ অনুযায়ী সন্ধির আহ্বান করলেন। এমন সময় চতুর্দিক থেকে সাবায়িরা তির নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে ফেলে।[৪৬১] আর তারপরই উম্মুল মুমিনিনের উপর তির নিক্ষেপ করতে শুরু করে।[৪৬২] হজরত আয়েশা রা. ছিলেন উটের পিঠে আরোহী অবস্থায়। হাওদার চারপাশে সতর্কতাবশত লৌহবর্ম ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও বিপদের আশঙ্কা ছিল ভীষণ।[৪৬৩]

উম্মুল মুমিনিন নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে তখনো যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ করে চিৎকার বলেছিলেন, 'আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো, হে আমার সন্তানেরা, হিসাবের দিবসকে স্মরণ করো।'

কিন্তু তারপরও মানুষ আক্রমণ থেকে বিরত হলো না। তখন উম্মুল মুমিনিন দু'হাত উঁচু করে, হজরত উসমানের হত্যাকারী ও তাদের সহযোগিতাকারীদের জন্য বদদোয়া করতে শুরু করলেন। আর সবাই সেই দোয়ায় চিৎকার করে আমিন আমিন বলতে লাগলেন।

হজরত আলি রা. এই আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীসের শব্দ?

লোকেরা বলল, উম্মুল মুমিনিন এবং তার সহযোগীরা হজরত উসমানের হত্যাকারী এবং তাদের দোসরদের জন্য বদদোয়া করছেন। এ কথা শুনে হজরত আলি রা. নিজেও চিৎকার করে উঠলেন, হে আল্লাহ, উসমানের হত্যাকারী এবং তাঁদের সহযোগীদের উপর অভিশাপ নাজিল করুন।[৪৬৪]

---

[৪৬১] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ৮৫, তারিখুত তাবারি : ৪/৫১৩

[৪৬২] তারিখুত তাবারি : ৪/৫১৩

[৪৬৩] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৭

[৪৬৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৫১৩, ৫১৪; এখানে এমন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই যে, হজরত আলি রা. একদিকে হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের সঙ্গে রেখেছেন, অন্যদিকে

ততক্ষণে যুদ্ধের বিভিষিকা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ময়দানের যে অংশে উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. উপস্থিত ছিলেন সেখানেই সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল। আক্রমণকারীরা পাহারাদার থেকে উটের লাগাম ছিনিয়ে নিয়ে উম্মুল মুমিনিনকে তাদের ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল; কিন্তু উম্মুল মুমিনিনের চারপাশে জীবন উৎসর্গকারী মহাপুরুষদেরও অভাব ছিল না।

হজরত আয়েশা রা. তখনো যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। হজরত তালহা রা. এর যুবক পুত্র মুহাম্মদ উটের লাগাম আঁকড়ে ধরে ছিলেন। আরজ করলেন, আম্মিজান, কী আদেশ? হজরত আয়েশা রা. বললেন, হজরত আদম আ. এর দুই পুত্র থেকে উত্তম পুত্রের ন্যায় হয়ে যাও।

হজরত মুহাম্মদ বিন তালহা পাপিষ্ঠদেরকে উম্মুল মুমিনিনের উপর উদ্যত হতে দেখে কী করে নিবৃত্ত থাকতে পারেন? তিনি শক্ত পাথরের ন্যায় অবিচল থাকলেন এবং حم لا ينصرون এর স্লোগান তুলে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।[৪৬৫]

তার পরে হজরত আবদুর রহমান বিন ইতাব এবং তার পরে হজরত আসওয়াদ বিন আবুল বাখতারি উটের লাগাম আঁকড়ে ধরেন। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে তারাও আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েন। তখন আঘাতে

তাদের উপর অভিশাপও করেছেন। তাহলে এটা কোনো দ্বিমুখী কৌশল ছিল, নাকি তিনি অপরাধীদের কাছে অসহায় ছিলেন?

আসলে ব্যাপার এই যে, হজরত উসমান রা. এর কিসাসের বিষয়টি ছিল কাযা ও দিয়ানত মিশ্রিত মাসআলা। মূল হত্যাকারীরা তো অবশ্যই অভিশাপ ও কিসাসের উপযুক্ত ছিল। কিন্তু তাদের সহযোগীরা, অর্থাৎ পূর্ববর্তী বিদ্রোহীরা যদিও বাইয়াত হয়ে কাযা হিসেবে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল, তবু যদি খাঁটি মনে তাওবা না করে থাকে, তবে দিয়ানাত হিসেবে তারা শাস্তি, তিরস্কার ও অভিশাপের যোগ্য ছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কাযা দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো মাসআলার ঐ অবস্থা, যা বাহ্যিক দলিল ও সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। বিচারক বা শাসক এর ভিত্তিতেই ফয়সালা করে থাকেন। পক্ষান্তরে দিয়ানাত দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো মাসআলার ঐ অবস্থা, যা মাসআলার ভুক্তভোগীর সাথে সম্পৃক্ত, অথবা যা আল্লাহর জ্ঞানে আছে। যদিও আদালতের পক্ষ থেকে এর কোনো প্রমাণ না থাকে। পরকালে এ অবস্থার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হবে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা ফিকহশাস্ত্রে দেখা যেতে পারে।

[৪৬৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪৬৬

আঘাতে জর্জিত হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. দৌড়ে আসেন এবং লাগাম আগলে রাখেন। অথচ এর আগেই তার গায়ে প্রায় ৩৬টি আঘাত লেগেছিল। এমন সময় তিনি আশতার নাখায়ির মুখোমুখি হন। উভয়ই একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে প্রচণ্ডভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়েন। তখন উভয়ের সহযোগীরা এসে তাদেরকে টেনে নিয়ে যায়।[৪৬৬]

মারওয়ান বিন হাকামও এই যুদ্ধে উম্মুল মুমিনিনের হেফাজতের জন্য হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আঘাত সহ্য করেছিলেন।[৪৬৭]

এ ছাড়া বনু বকর বিন ওয়ায়েল, বনু নাজিয়া, বনু যাব্বার দুঃসাহসিক পুরুষেরা লাফিয়ে লাফিয়ে উটের লাগাম আগলে ধরছিল। কিন্তু যে-ই এই মহান দায়িত্ব হাতে নিত, অভিশপ্ত আক্রমণকারীরা অস্ত্রের আঘাতে তার হাত কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। এভাবে একের পর এক সত্তরজন ভাগ্যবান ব্যক্তি উম্মুল মুমিনিন রা. এর হেফাজতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।[৪৬৮]

উম্মুল মুমিনিন রা.কে রক্ষা করার জন্য বনু যাব্বা গোত্রের সরদার এবং বসরার সাবেক কাজি ইবনে ইয়াসরাবি অসাধারণ দুঃসাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনিনের উটের সম্মুখে ঘোড়ার পিঠে আরোহী ছিলেন। হিন্দ বিন আমর মুরাদী এবং আলবা বিন হাইসাম তার উপর আক্রমণ করেছিল। কাজি ইবনে ইয়াসরাবি তাদের দুজনকেই অগ্র-পশ্চাতে আঘাত করে ফেলে দেন।[৪৬৯]

---

[৪৬৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৫১৯

[৪৬৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৩০

[৪৬৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪৬৩, ৪৬৪

[৪৬৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৫২৯, ৫৩০; কাযি ইয়াসরাবি ঐ সময় এই রণসঙ্গীত আবৃত্তি করছিলেন,

اَلْمَوْتُ أَحْلَى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلْ ...... نَحْنُ بَنُوْضَبَّةَ اَصْحَابُ الْجَمَلْ

نَحْنُ بَنُوْ الْمَوْتِ إِذَا الْمَوْتُ نَزَلْ ...... نَنْعَى ابْنَ عَفَّانِ بِاَطْرَافِ الْأَسَلْ

رُدُّوْا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَجَلْ

মৃত্যু আমাদের কাছে মধুর চেয়েও মিষ্ট,
আমরা বনু যাব্বাহ উট দিবসের মানুষ।

হজরত আলি রা. দেখলেন, যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে, দেহ থেকে একের পর এক মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তখন তিনি অস্থির হয়ে হজরত হাসান রা.কে বললেন, 'আজকের পর আর কী কল্যাণের আশা করা যায়'!

হজরত হাসান বললেন, আমি শুরুতেই আপনাকে এর থেকে নিষেধ করেছিলাম।[৪৭০]

যুদ্ধের সমাপ্তি

একপর্যায়ে হজরত কা'কা বিন আমর রা. হজরত আলি রা.কে পরামর্শ দিলেন যে, যেকোনোভাবে উম্মুল মুমিনিনের উটটি ফেলে দিতে হবে। কেননা বসরার লোকেরা এখন কেবল উম্মুল মুমিনিনের সুরক্ষার জন্য লড়াই করছে। হজরত আলি রা. তার মতটি পছন্দ করলেন। হজরত কা'কা বিন আমর রা. বুজাইর বিন দুলজা নামের এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলেন। সে হজরত আয়েশার দলের সদস্য তার ভাই আমর বিন দুলজাকে ডাক দিল। সে কাছে এলে দুজনে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উটের কাছে গেলেন। হজরত কা'কা রা. চিৎকার করে ঘোষণা দিতে দিতে অগ্রসর হলেন যে, 'তোমাদের সকলকে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে'।

এ ঘোষণা শুনে বসরাবাসী যুদ্ধ বন্ধ করল।[৪৭১] হজরত কা'কা রা. এর সাথে আবদুল্লাহ বিন বুদাইলও ছিলেন। তিনি হাওদার পাশে গিয়ে বললেন, 'উম্মুল মুমিনিন, হজরত উসমান রা.র হত্যার দিন আপনি আমাকে বলেছিলেন, 'হজরত আলির আঁচল আঁকড়ে ধরো'। আল্লাহর কসম, হজরত আলির মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা ভিন্নতা আসেনি'।

উম্মুল মুমিনিন নীরব থাকলেন।

আমরা তো মৃত্যুর সন্তান; যদি মৃত্যু এসে যায়,
আমরা বর্শার ফলা বিঁধিয়ে ইবনে আফ্‌ফানের মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করি।
ফিরিয়ে দাও আমাদেরকে আমাদের শায়েখ
(উসমান বিন আফফান) কে, ব্যস, এইটুকু চাই, আর কিছু নয়।

(আনসাবুল আশরাফ : ২/২৪২)

৪৭০ মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৫৯৮

৪৭১ তারিখুত তাবারি : ৪/৫২৭

হজরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল আদেশ করলেন, 'উটের পাগুলো কেটে দাও'। সঙ্গে সঙ্গে তার সাথিরা আদেশ পালন করল।[৪৭২] মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং আবদুল্লাহ বিন বুদাইল ভূপাতিত হওয়ার পূর্বেই হাওদা ধরে ফেললেন এবং হজরত আলি রা. এর কাছে নিয়ে গেলেন।[৪৭৩]

হজরত আলি রা. উম্মুল মুমিনিন রা.কে হাওদা থেকে বের করে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা সহকারে একটি তাঁবুতে স্থান করে দিলেন। একটু পর তিনি নিজে সেখানে আগমন করলেন এবং উম্মুল মুমিনিনের অবস্থাদি জানতে চাইলেন। বললেন, আম্মিজান, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এবং আপনাকেও ক্ষমা করুন।

উম্মুল মুমিনিনও উত্তরে বললেন, আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাকে ক্ষমা করুন।[৪৭৪]

সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শুরু-হওয়া এই 'জঙ্গে জামাল' তারপরই সমাপ্ত হয়ে যায়। এ যুদ্ধ যেন ছিল একটি দুর্ঘটনামূলক অগ্নিকাণ্ড, যা হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আবার হঠাৎই নিভে গেল।

জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণকারীদের সাথে হজরত আলি রা. এর আচরণ

জঙ্গে জামাল সমাপ্ত হওয়ার পর হজরত আলি রা. অত্যন্ত দয়ালু ও খোদাভীরু শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি আদেশ জারি করেন, কোনো আহতকে যেন হত্যা না করা হয়, কোনো পলায়নকারীকে যেন পিছু ধাওয়া না করা হয়, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে, তাকে যেন নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

মারওয়ান বিন হাকাম বর্ণনা করেন, হজরত আলি রা.-এর চেয়ে অধিক দয়াশীল বিজেতা আমি আর দেখিনি। জঙ্গে জামালে যখন আমাদের পরাজয় হলো, হজরত আলির পক্ষ থেকে এক লোক ঘোষণা করল, পলায়নকারীদের যেন কেউ হত্যা না করে, আহতকে যেন কেউ আঘাত না করে।[৪৭৫]

---

[৪৭২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৩১,

[৪৭৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৩১,

[৪৭৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৩৪

[৪৭৫] কিতাবুল উম্ম, লিল ইমামিশ শাফিয়ি : ৪/২২৯,

হজরত আলি রা. সকল নিহতকে সমান মর্যাদা দান করলেন এবং জানাজা পড়ালেন।[৪৭৬] বিরোধীদের মালপত্র তিনি গনিমতের সম্পদ বলে ঘোষণা করলেন না। বরং হারানো সম্পদের মতো ঘোষণা করলেন, যার যা হারিয়েছে, চিহ্ন বলে নিয়ে যাক।[৪৭৭]

কঠোর মেজাজের লোকদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও হজরত আলি রা. বসরাবাসীর সম্পদ দখলের অনুমতি দেননি। কেউ এ বিষয়ে আপত্তি করে বলল, যাদের রক্ত আমাদের জন্য হালাল, তাদের সম্পদ হারাম কেন?

হজরত আলি রা. ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, কে আছে, যে উম্মুল মুমিনিনকে তার ভাগে নিতে চায়?

এ কথা শুনে সকলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সকলেই উঠল, সুবহানাল্লাহ, তিনি তো আমাদের সম্মানিত মা।'

তারপর আর কারো এমন দাবি করার দুঃসাহ হয়নি।[৪৭৮]

জঙ্গে জামালের তারিখ, সময়কাল ও নিহতদের সঠিক সংখ্যা

সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী জঙ্গে জামাল জোহর থেকে আসর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। সূর্যাস্তের আগেই সমস্ত হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৪৭৯]

وهكذا روى عن عبد خير (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٧٧٩٠)

[৪৭৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৩৮

[৪৭৭] বর্ণিত আছে-

قال : يا قنبر، من عرف شيئا فليأخذه. (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٨٣٣ ح : ٣٧٨١٦، ط الرشد)

[৪৭৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৮০, হাদিস : ৩৭৮৩৩,

[৪৭৯] বর্ণিত আছে-

فقاتلهم بعد صلاة الظهر، فما غربت الشمس وحول الجمل عين تطرف ممن كان يذبه عنه. (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٨٣٣)

অন্যান্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় আছে, সাবায়িরা আক্রমণ করেছিল ফজরের সময়, ফলে সর্বত্র হইচই পড়ে গিয়েছিল। এ বর্ণনার সাথে মূল আলোচনায় উল্লিখিত জোহরের সময়ের বর্ণনার সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আসলে লড়াই দুটি পর্বে হয়েছিল। প্রথম পর্বে ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই সাবায়িরা বিক্ষিপ্তভাবে বিশৃঙ্খলা করতে শুরু করেছিল। দু'এক স্থানে চোরাগোপ্তা হামলাও হয়েছিল। ভোর থেকে ধীরে ধীরে

বলা হয়, যুদ্ধের তারিখ ছিল ৩৬ হিজরির ১০ জুমাদাল উখরা।[৪৮০]

নিহতদের সংখ্যার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীরা অতিরঞ্জন করেছেন। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত উক্তিগুলো প্রসিদ্ধ।

১. কেউ বলেছে, নিহতের সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ হাজার। অথচ এটা সহিহ বর্ণনায় উল্লিখিত উভয় বাহিনীর সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যার চেয়েও বেশি। সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী উভয় দলের লোকসংখ্যা ১৫ হাজারেরও কম ছিল। হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার বর্ণনা অনুযায়ী হজরত আলি রা. এর দলের সদস্যসংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৭০০ জন।[৪৮১]

হজরত যুবাইর রা. এর দলের সদস্যসংখ্যা ছিল ৫০০০।[৪৮২]

এভাবে উভয় দলের মোট সদস্য হয় ১৫ হাজারেরও কম। তা হলে নিহতের সংখ্যা কী করে ২০-২৫ হাজার হতে পারে?

সুতরাং এক্ষেত্রে সহিহ মত এটিই যে, উভয় দলের মোট নিহতের সংখ্যা ৩ হাজারের চেয়ে কিছু কম বা বেশি ছিল। তন্মধ্যে কুফাবাসীর নিহতের সংখ্যা ৫০০ এবং বসরাবাসীর নিহতের সংখ্যা ২ হাজার ৫০০ ছিল।[৪৮৩]

নিহতের সংখ্যা ২০-২৫ হাজার না হওয়ার সম্ভাবনা কয়েকটি কারণে আরো দৃঢ় হয়। যথা :

ক. যুদ্ধের সময়টি ছিল প্রচণ্ড শীতের মৌসুম। সৌরবর্ষ অনুযায়ী এর তারিখ ছিল ৫ ডিসেম্বর। অর্থাৎ তখন দিন ছিল ছোট। মূল যুদ্ধটি

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। এখানে-সেখানে এক দুজনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। হঠাৎ হঠাৎ অজানা দিক থেকে তিরও ছোঁড়া হয়। এভাবে জোহর পর্যন্ত উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়।

তারপর জোহরের পর থেকে, যখন উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ময়দানে আগমন করেন, তখন শুরু হয় যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব এবং তখনই হয় মূল লড়াই। মানুষ কোনোভাবেই বিরত হচ্ছিল না। উম্মুল মুমিনিনের উটের চারপাশে মুখোমুখি লড়াই শুরু হয়।

[৪৮০] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৫৭০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪৭৬

[৪৮১] তারিখুত তাবারি : ৪/৫০৫

[৪৮২] তারিখুত তাবারি : ৪/৪৯৮

[৪৮৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৮৬

সূর্য ঢলে পড়ার পর শুরু হয়েছিল এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই অর্থাৎ আনুমানিক ৫ ঘটিকায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ হিসেবে যুদ্ধের সময় ছিল মাত্র ৩ ঘণ্টা।

খ. অধিকাংশ মানুষ এ যুদ্ধে কোনো আবেগ বা উদ্দীপনাবশত নয়, বরং লড়াই করেছিল আত্মরক্ষার জন্য।

গ. যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর কোনো আহতকে হত্যা করা হয়নি এবং কারো পশ্চাদ্ধাবনও করা হয়নি।

ঘ. রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে সঙ্ঘটিত বড় বড় যুদ্ধেও ২০-২৫ হাজার মুসলমান শহিদ হয়নি। অথচ সেগুলোতে উভয় পক্ষ পূর্ণ শক্তি ও উদ্দীপনার সাথে লড়াই করেছে।

ঙ. এ যুদ্ধে লড়াই হয়েছিল বিশৃঙ্খল ও এলোমেলোভাবে। কেননা বসরাবাসীর নেতৃত্বদানকারী হজরত তালহা রা. যুদ্ধের শুরুতেই শহাদাত বরণ করেছিলেন। হজরত যুবাইর রা.-ও দ্রুত রণাঙ্গন ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং মাত্র তিন ঘণ্টার একটি অনিয়মিত যুদ্ধে এতটা রক্তপাত ঘটা এবং এত অধিক পরিমাণে লাশ পড়া খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার।

জঙ্গে জামালের পর উম্মাহর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের দুঃখ ও বেদনা

যুদ্ধের পর উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এ রক্তপাতের জন্য অত্যন্ত আফসোস করেছেন। তিনি বলতেন, 'হায়, আমি যদি বিশ বছর আগেই মারা যেতাম!'[৪৮৪]

অন্যদিকে হজরত আলি রা.-ও ভীষণ ব্যথিত হন। যখন তিনি কা'ব বিন সুর রা. এর লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি জানি, তুমি সত্যের উপর ছিলে, ইনসাফের ফয়সালা করতে।'[৪৮৫]

আলি রা. এর মুখে হজরত তালহা এবং তার পুত্র মুহাম্মদের প্রশংসা

---

[৪৮৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৩৭

[৪৮৫] তারিখুত তাবারি : ৪/ ৫২৮, সনদ সহিহ।

হজরত তালহা রা. এর লাশ যুদ্ধের ময়দানে পড়ে থাকতে দেখে হজরত আলি নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। বাহন থেকে নেমে পড়েন এবং হজরত তালহাকে কোলে টেনে নেন। তারপর দাড়ি ও চেহারা থেকে মাটি ঝেরে দিতে দিতে বলেন, 'আবু মুহাম্মদ, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। তুমি খোলা আকাশের নিচে এভাবে পড়ে আছ! আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। হে আল্লাহ, নিজেদের ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হওয়ার ফরিয়াদ তোমার কাছেই করছি। আল্লাহর কসম, আমি যদি বিশ বছর আগেই মরে যেতাম তা হলে কত ভালো হতো![৪৮৬]

এ সময় তিনি এই বেদনাবিধুর কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন,

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه..... اذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

كأن الثريا علقت من جبينه ...... وفى خده الشعرى وفى الآخر البدر

এ এমন যুবক, সচ্ছলতা যাকে তার বন্ধুর কাছে নিয়ে যেত, যখন সে বন্ধু-সম্পর্কহীন থাকত এবং দারিদ্র্যের কারণে পৃথক হয়ে যেত। এ ছিল এমন ব্যক্তি, সন্ধ্যাতারা যেন তার ললাটে শোভা পেত, তার এক গণ্ডদেশ ছিল শি'রা-নক্ষত্রের ন্যায়, অপরটি যেন চতুর্দশী চাঁদ।[৪৮৭]

যুদ্ধে হজরত তালহা রা. এর পুত্র হজরত মুহাম্মদ বিন তালহা ওরফে সাজ্জাদ রা.-ও শাহাদাত বরণ করেছিলেন। হজরত আলি রা. তার লাশ দেখে নিজের অজান্তে বলে উঠলেন,

انا لله وانا اليه راجعون

তারপর বললেন, 'আল্লাহর কসম, তুমি সৎ ও পুণ্যবান যুবক ছিলে'।

এ কথা বলে তার লাশের পাশেই বসে পড়লেন। দুঃখ ও বেদনায় তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।[৪৮৮]

---

[৪৮৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৯৬, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪৭৪, হাইসামিও এটি বর্ণনা করেছেন, তার সনদ হাসান। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদিস : ১৪৮২৩)

[৪৮৭] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৬০০

[৪৮৮] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৬০৮

হজরত তালহা রা. ছিলেন বসরার অনেক বড় জমিদার। হজরত আলি রা. সুরক্ষার স্বার্থে তার সমস্ত সম্পদ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। কিছুদিন পর তার পুত্র ইমরান বিন তালহার সাথে সাক্ষাৎ হলে সব সম্পদ তার হাতে সোপর্দ করেন। আর বলেন, এগুলো দখল করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু এ ভয়ে এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম যে, মানুষ অন্যায়ভাবে সব দখল করে নিতে পারে।[৪৮৯]

আরো বললেন, আশাকরি আমি, তালহা ও যুবাইর ওইসব ভাগ্যবান ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ

আমরা তাদের অন্তরসমূহ থেকে পঙ্কিলতা দূর করে দিয়েছি, তারা সিংহাসনে ভাই ভাই হয়ে বসবে।[৪৯০]

হজরত আয়েশা রা. এর মুখে আম্মার বিন ইয়াসির রা.-এর প্রশংসা

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-ও হজরত আলি রা. এর সঙ্গীদের ব্যাপারে পূর্ণ উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. যখন তার খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন উম্মুল মুমিনিন রা. ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি জানি, তুমি সর্বদা সত্য কথা বল।'

হজরত আম্মার বললেন, 'প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আপনার মুখে আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য শুনিয়েছেন।'[৪৯১]

যায়েদ বিন সুহান কে?

হজরত আলি রা. এর দলে হজরত আম্মার বিন ইয়াসির এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম ছাড়াও বড় বড় তাবেয়িও ছিলেন। তাদের থেকে কয়েকজন এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যায়েদ বিন সুহান এবং সাইহান বিন সুহান ছিলেন দুই

---

[৪৮৯] তারিখে দিমাশক : ৪৩/৫০৬

[৪৯০] সুরা হিজর, আয়াত ৪৭। তথ্যসূত্র : মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮২১, ফাজাইলুস সাহাবা, কৃত : ইমাম আহমাদ ইবনে হামবল রহ., হাদিস : ১২৯৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/৩৯

[৪৯১] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪৬

সহোদর। তারা হজরত আলির একান্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। যুদ্ধের তুমুল লড়াই চলাকালে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.র দেহরক্ষীদের হাতে তারা নিহত হয়েছিলেন।[৪৯২]

জঙ্গে জামালে লড়াই ও শাহাদাত বরণকারী অধিকাংশই ছিলেন নেককার। প্রত্যেকেই নিজেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে আল্লাহর দীনের জন্য লড়াই করেছিলেন। তবে সাবায়িরা ছিল এর বিপরীত। তাদের নিয়ত ছিল বাতিল ও ঘৃণ্য। ফলে উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে এবং দলে দলে মরেছে।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. এর শাহাদাত

হজরত যুবাইর রা. যুদ্ধের ময়দান থেকে বেরিয়ে মদিনার পথে রওনা করেছিলেন। জনৈক দুর্ভাগা সাবায়ি আমর বিন জুরমুয এ খবর জানতে পেরে সে তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করে। ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে নিকটে পৌঁছে যায় এবং বর্শা দিয়ে আঘাত করে। হজরত যুবাইর রা. র ঘোড়াটি আহত হয়ে পড়ে যায়। হজরত যুবাইর রা.

---

[৪৯২] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৩০

নোট : মূলত হজরত যায়েদ বিন সুহান রহ. গুজবে প্রভাবিত হয়ে ভুল বুঝে হজরত উসমান রা. এর বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। হজরত উসমান রা. এর কর্মকর্তাদের উপর আপত্তির কারণে তিনি শহর থেকে বহিষ্কারও হয়েছিলেন। জঙ্গে জামালে তিনি হজরত আলির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু নাসেবি সম্প্রদায় তাকে একচেটিয়াভাবে সাবায়ি ও মুনাফিক বলে থাকে। অথচ এটা ভারসাম্য ও ইনসাফ পরিপন্থি। জারাহ-তাদিলের ইমামগণের মতে তিনি সর্বৈকমত্যে একজন বিশিষ্ট তাবেয়ি ছিলেন। (আল ইসাবাহ্ : ২/৫৩৩, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৫২৫)

এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, ইসনা আশারিরা তাকে তাদের ধর্মের লোক বলে এবং তাকে ইসনা আশারিয়া ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করে থাকে। কিন্তু এটা তো তাদের ঘৃণ্য কৌশল যে, সাহাবা, তাবেয়ি এবং তাবে তাবেয়িদের থেকে হাজারো নেক ব্যক্তিকে তারা তাদের ইমাম এবং তাদের ধর্মের বর্ণনাকারী ও ভিত্তি স্থাপনকারীরূপে পেশ করে, যাতে মানুষ মনে করে, এত এত নির্ভরযোগ্য মানুষও ইসনা আশারি ছিল! তাহলে তো এ ধর্মই সত্য মনে হয়।

কিন্তু তাদের অপপ্রচার দেখে যদি আহলে সুন্নাতের অনুসারীরাও এসব পূর্বপুরুষকে রাফেজি মনে করে ঘৃণা করতে থাকে, তাহলে এর চেয়ে কষ্টের কথা আর কী হতে পারে?

তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে পালটা আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে আমর বিন জুরমুযের অন্য সঙ্গীরা ছুটে আসে। তারপর সবাই মিলে আল্লাহর রাসুলের প্রিয় সহচরকে শহিদ করে দেয়।[৪৯৩]

পাষাণ-হৃদয় আমর বিন জুরমুয তার পৈশাচিকতার প্রমাণস্বরূপ হজরত যুবাইর রা. এর কর্তিত মস্তক হজরত আলি রা.-এর খেদমতে পেশ করে। হজরত আলি রা. তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেন, 'সাফিয়ার পুত্রকে যে হত্যা করেছে, তার জন্য জাহান্নামের সুসংবাদ'।

তারপর বলেন, প্রত্যেক নবীর একজন সহচর (একান্ত জানবাজ সঙ্গী) থাকে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর ছিলেন হজরত যুবাইর রা.।[৪৯৪]

আমর বিন জুরমুয হজরত যুবাইর রা. এর তরবারি সঙ্গে নিয়েছিল। সেটি দেখে হজরত আলি বললেন, 'আল্লাহর কসম, এই তলোয়ার বহুবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা থেকে দুঃখ-বেদনার চিহ্ন মুছে দিয়েছিল।'[৪৯৫]

---

[৪৯৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩০৬২৯, হাদিস : ৩৭৭৯৮,

[৪৯৪] ফাজাইলুস সাহাবা, কৃত : ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ., হাদিস : ১২৭২, কানযুল উম্মাল, হাদিস : ৩৬৬১৫

[৪৯৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪৮২, ৪৮৩

ইবনে জুরমুযের পরিণাম

এক বর্ণনায় আছে, হজরত আলির ধিক্কার শুনে ইবনে জুরমুয তৎক্ষণাৎ নিজের পেটে তরবারি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। (আস সিকাত লিবনি হিব্বান : ২/২৮৩)

কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী সে হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিল এবং তার সম্মুখে নিজেকে কিসাসের জন্য পেশ করেছিল। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এই বলে অস্বীকার করেছিলেন যে, তোমার জীবন হজরত যুবাইর রা. এর জুতার ফিতার সমানও নয়।

একথা শুনে ইবনে জুরমুয এতটাই মর্মাহত হয়েছিল যে, আত্মহত্যা করেছিল। (তারিখুল ইসলাম লিয জাহাবি : ৩/৫০৮, ২/৮৭০)

সম্ভবত হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. কিসাস গ্রহণ থেকে এজন্য অস্বীকার করেছিলেন যে, হজরত যুবাইর রা. এর হত্যা এক দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও ইচ্ছাকৃত ছিল; কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ছিল যুদ্ধের ধারাবাহিক লড়াই। ইবনে জুরমুয

আলি রা. এর পক্ষ থেকে আয়েশা রা. কে সম্মান ও মর্যাদা দান

যুদ্ধের পর হজরত আলি রা. উম্মুল মুমিনিন রা. এবং তার কাফেলার লোকদেরকে বসরায় থাকার জায়গায় করে দেন। অনেকেই ছিল আহত। হজরত আলি তাদের দেখাশোনা করেন। উম্মুল মুমিনিন রা. কে শহরের সবচেয়ে দামি বাড়িটিতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন, যেটি হজরত আবদুল্লাহ বিন খালফের মালিকানায় ছিল।[৪৯৬]

হজরত আলি রা. জানতে পারলেন দুই ব্যক্তি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর নামে অশালীন কথা বলেছে। তিনি তাদেরকে ডেকে এনে কাপড় খুলে উদোম গায়ে একশ করে চাবুক মারেন।[৪৯৭]

উম্মুল মুমিনিনের প্রত্যাবর্তন এবং হজরত আলি রা. এর সদাচরণ

হজরত আলি রা. উম্মুল মুমিনিনের সম্মান ও মর্যাদায় কোনো ঘাটতি করলেন না। তিনি রওনা করার পূর্বে তার বাহন, পাথেয় এবং অন্য প্রয়োজনাদির উত্তম ব্যবস্থা করলেন। বসরার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ৪০ জন নারীকে উম্মুল মুমিনিনের সম্মানে সফরসঙ্গী করে পাঠান।[৪৯৮]

তাকে পিছু ধাওয়া করে হত্যা করেছিল। ফলে হত্যাকারীর পক্ষে সন্দেহ বিদ্যমান ছিল।

ঠিক এ কারণেই হজরত আলি রা. ইবনে জুরমুযকে কেবল ধিক্কার দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। তার উপর কিসাস জারি করেননি। হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইরও সতর্কতার দিকটি অবলম্বন করেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় দাবি করা সত্ত্বেও তিনি ইবনে জুরমুযকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করেননি। তবে এমনভাবে অস্বীকার করেছিলেন, যাতে সে অপরাধবোধ থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত না হতে পারে এবং সারা জীবন তাওবা ও ইসতেগফার করতে থাকে। কিন্তু তিনি ধারণা করতে পারেননি যে, সে আত্মহত্যা করে বসবে।

যাই হোক, ইবনে জুরমুযের শেষকর্মটা সেই হুঁশিয়ারির বাস্তবতা প্রমাণ করে দিল, যা হজরত আলি রা. শুনিয়েছিলেন।

নোট : আমর বিন জুরমুযকে কোথাও উমাইর বিন জুরমুযও বলা হয়েছে। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/১১২)

[৪৯৬] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৩৯

[৪৯৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪০

[৪৯৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪৪

হজরত আলি রা. এর এ আয়োজন মূলত ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বিশেষ নির্দেশনা পালনের জন্য। নবীজি তাকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অচিরেই তোমার সাথে আয়েশার কিছু বাদানুবাদ হবে।

হজরত আলি চিন্তান্বিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটা তো আমার দুর্ভাগ্য হবে।

নবীজির উত্তর ছিল, না। তবে যখন এটা ঘটবে, আয়েশাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ো।[৪৯৯]

হজরত আলি রা. এ অসিয়তের উপর পূর্ণ আমল করেছেন। রওনা করার পূর্বে নিজে উম্মুল মুমিনিনের খেদমতে উপস্থিত হয়েছেন। উম্মুল মুমিনিন তখন উপস্থিত লোকদের বলেন, 'আমার সন্তানেরা, অতীতে আলির সাথে আমার যা কিছু হয়েছে, তা দেবরের সাথে একজন নারীর মতবিরোধের চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমার মতে হজরত আলি একজন ভালো মানুষ।

হজরত আলিও তখন বলেন, হে লোকসকল, উম্মুল মুমিনিন সত্য বলেছেন এবং সুন্দর বলেছেন। আমার ও তার মধ্যে এই দুয়েকটি ছোটখাট বিষয় ছাড়া কিছুই হয়নি। তিনি তোমাদের নবীর পুণ্যবতী স্ত্রী, দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও।

এরপর উম্মুল মুমিনিনের কাফেলা রওনা করে। হজরত আলি রা. কয়েক মাইল পর্যন্ত পদব্রজে সাথে সাথে গিয়েছিলেন। তারপর তার দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন রা. কে সম্মানের জন্য এক মনজিল (১৬ মাইল, পৌনে ৩৬ কিলোমিটার) পর্যন্ত সঙ্গে যাওয়ার আদেশ করেন।[৫০০]

---

[৪৯৯] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৭১৯৮, শরহু মুশকিলিল আসার লিত তহাবি, হাদিস : ৫৬১২, আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ১/৩৩২, হাইসামি এ হাদিস বর্ণনা করে বলেছেন, হাদিসটি ইমাম আহমাদ, বাজ্জার এবং তাবারানি বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবিগণ নির্ভরযোগ্য।

[৫০০] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪৪

উম্মুল মুমিনিনের কাফেলা প্রথমে মক্কায় পৌঁছে। ৩৬ হিজরির হজ পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। তারপর মদিনায় নিজের ঘরে ফিরে আসেন।[৫০১]

জীবনের শেষ পর্যন্ত হজরত আয়েশার মধ্যে এ ঘটনার মর্মবেদনা জীবন্ত ছিল। জঙ্গে জামালে মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের নিহত হওয়ার কথা যখনই মনে পড়ত, তিনি এত কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে আঁচল ভিজে যেত। কাঁদতেন আর বলতেন, হায়! যদি আমি বিস্মৃত হতে পারতাম![৫০২]

যখনই জঙ্গে জামালে নিহতদের আলোচনা আসত, হজরত আয়েশা সকলের জন্য রহমতের দোয়া করতেন। হজরত তালহা ও যুবাইরের সাথে যায়েদ বিন সুহানের জন্যও কল্যাণের দোয়া করতেন। অথচ যায়েদ বিন সুহান ছিলেন হজরত আলির পক্ষে। কেউ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তারা একে অপরকে হত্যা করেছিল আর আপনি তাদের সকলের জন্য রহমতের দোয়া করছেন? আল্লাহ কখনোই এদের সকলকে জান্নাতে একত্র করবেন না।

উম্মুল মুমিনিন রা. বললেন, তুমি কি জান না, আল্লাহর রহমত কত ব্যাপক? তিনি তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান'।[৫০৩]

হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর শাহাদাত ও উম্মুল মুমিনিন রা. এর নীরবতার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনও সমাপ্ত হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহর সংশোধন।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী চক্র এ আন্দোলনকে রক্তপাত পর্যন্ত নিয়ে ছাড়ল। যারা এ আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশই উম্মুল মুমিনিনের ন্যায় রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর, হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা, হজরত সাঈদ ইবনুল আস, হজরত ই'লা বিন উমাইয়া, হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের

---

[৫০১] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪৪

[৫০২] আল মুনতাযাম লিবনিল জাওযি : ৫/৯৫

[৫০৩] আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ১৬৭১৮, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক মাআ জামিয়ি মা'মার বিন রাশেদ, হাদিস : ২০৫৬৪

রা. এই ঘটনার পর থেকে আর কখনো হজরত আলির যুগে সৃষ্ট রাজনৈতিক বাদানুবাদে জড়াননি।

ইজতিহাদি মতবিরোধ

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, উপরোক্ত মতবিরোধগুলো ছিল একটি ফিকহি ও ইজতিহাদি বিতর্ক। ক্ষমতা দখল এবং রাজ্য বিস্তারের লড়াই ছিল না। হজরত আলি রা. নিঃসন্দেহে তার প্রতিটি পদক্ষেপে সত্যের উপর ছিলেন। কিন্তু অন্যরাও নিজ নিজ মতে মুজতাহিদ ছিলেন। সে যুগে এ যুগের মতো ইসলামি নীতিমালা প্রণীত হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত তাদের স্মরণে থাকা হাদিস থেকে মর্ম উদ্ধার করে আমল করতেন। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক ও বিচারিক বিষয় অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

তদুপরি হজরত উসমানের কিসাসের বিষয়টি ছিল এমন, পূর্বে যার কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। পূর্বের কোনো আদালতি ফয়সালা বা ফতোয়া তাদের সম্মুখে ছিল না। তাই সাহাবায়ে কেরামের উভয় দল নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেছেন, যা নিঃসন্দেহে ছিল ইজতিহাদ। সুতরাং হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর ভুল কোনো পাপ বা গুনাহ নয়; বরং ইজতিহাদি ভুল বলে আখ্যায়িত হবে। আর এ ধরনের ভুলের জন্য আখেরাতে কোনো জবাবদিহিতা নেই, বরং সাওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে।

এভাবে বলা সঠিক নয় যে, এ মহান ব্যক্তিদের কাছে কোনো ইজতিহাদি দলিল ছিল না। কেননা এমন অনেক বর্ণনা তাদের দলিল হওয়া সম্ভব, যাতে জালেমকে জুলুম থেকে বাধা প্রদানের আদেশ করা হয়েছে।[৫০৪] এ

---

[৫০৪] যেমন ইরশাদ হয়েছে-

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.

তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় দেখবে, সে যেন তা প্রতিহত করে।

(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৮৬, কিতাবুল ইমান)

এমনিভাবে বর্ণিত আছে-

انصر اخاك ظالما او مظلوما .... تحجره او تمنعه من الظلم.

(সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৪৪, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল গাসাব)

কারণেই হজরত আলি তার বিপক্ষের সাহাবিদের ইজতিহাদি অভিমতের দিকটি উপেক্ষা করতেন না। আর এ কারণেই তিনি যখন কাউকে তাদের বিরুদ্ধে কটু কথা বলতে শুনতেন, তখন বলতেন, এভাবে বলো না। কেননা তারা ভেবেছেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, আমরা ভেবেছি, তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। ফলে আমরা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি।[৫০৫]

জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন সম্পর্কে তাকি উসমানির অভিমত

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি এ বিষয়ে আলোকপাত করে লিখেছেন, 'হজরত আলি রা. এর এ সকল বাণী থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বয়ং তার কাছেও হজরত মুয়াবিয়া এবং হজরত আয়েশা রা.র সাথে তার মতবিরোধ ছিল ইজতিহাদি। আর এ মতবিরোধের কারণে তিনি তাদের ফাসেক মনে করতেন না। এমনকি তাদের সম্পর্কে ভালো কথা ছাড়া কিছু বলা বৈধও মনে করতেন না।[৫০৬]

জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন সম্পর্কে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর এ লেখাটিও বারবার পাঠ করার মতো- 'প্রকৃত সত্য এই যে, সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য ক্ষমতার জন্য ছিল না। এমনিভাবে এ যুগের রাজনৈতিক দলগুলোর মতপার্থক্যের মতোও ছিল না। বরং তারা উভয় পক্ষ দীনকেই সমুন্নত করতে চাচ্ছিলেন। দীনের সুরক্ষার জন্যই একপক্ষের সাথে অপর পক্ষের বিবাদ হয়েছিল। তারা নিজেরাও

৫০৫

لا تقولوا، انما هم قوم زعموا انا بغينا عليهم وزعمنا انهم بغوا علينا فقاتلنا.
(تعظيم قدر الصلوة، ابن نصر المروزى م ٢٩٤هـ، ح : ٥٩٤، منهاج السنة لابن تيمية : ٢٤٥/٥) وفى معناه قول عماربن ياسر رضـ فى صفين، قال : ديننا واحد، وقبلتنا واحدة، ودعوتنا واحدة، ولكن قوم بغوا علينا فقاتلناهم. (تعظيم قدر الصلوة، عدد الرواية : ٥٩٩)
وفى رواية : عن ابى البخترى سئل علىٌّ عن اهل الجمل قال : قيل : امشركون هم؟ قال : من الشرك فروا. قيل : امنافقون هم؟ قال : ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا : قيل : فما هم؟ قال : اخواننا بغوا علينا (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٧٦٣، ط الرشد، السنن الكبرى، بيهقى، ح : ١٦٧١٣) وفى رواية سئل علىٌّ عن اهل الجمل فقال : اخواننا بغوا علينا، فقاتلنا هم، وقد فاءوا وقد قبلنا منهم. (السنن الكبرى، بيهقى، ح : ١٦٧٥٢)

৫০৬ হজরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা : ২৪২

একে অন্যের সম্পর্কে এটাই জানতেন ও মনে করতেন যে, প্রতিপক্ষের মতাদর্শ নিষ্ঠাপূর্ণ ইজতিহাদের উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং উভয় পক্ষ অপরপক্ষকে ভিন্নমত পোষণ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুলের শিকার বলে মনে করলেও কেউ কাউকে ফাসেক আখ্যায়িত করতেন না।'[৫০৭]

হজরত আলি রা. এর ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত ও নতুন বিন্যাস

হজরত আলি রা. কিছুদিন পর্যন্ত বসরা ও তার আশপাশের এলাকার ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো নতুন করে সুদৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত থাকেন। মানুষের কাছ থেকে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেন যে, যুদ্ধ ও সন্ধি উভয় অবস্থায় তারা ইসলামি খেলাফতের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকবে। শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে।

এ বাইয়াতে বসরার সমস্ত মানুষ উপস্থিত ছিল। হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর পতাকাতলে লড়াই করেছে এমন লোকেরাও অকুণ্ঠচিত্তে বাইয়াতে অংশ নিয়েছিল। এমনকি তাদের আহতরাও বাদ যায়নি।[৫০৮]

হজরত আলি রা. পরামর্শ করে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কে বসরার আমির এবং জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানকে (যিনি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন) বাইতুল-মালের কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।[৫০৯]

তারপর জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণকারী দুইপক্ষের প্রত্যেকের মাঝে হজরত আলি রা. ৫০০ দিরহাম করে বিতরণ করেন। এর দ্বারা সকলেই তার প্রতি মুগ্ধ ও তার গুণগ্রাহী হয়ে যায়। তবে সাবায়িরা এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয় এবং হজরত আলিকে নিন্দা জানায়। কিন্তু তিনি তাদের কোনো পরোয়া করেন না।[৫১০]

সাবায়িদের পলায়ন

---

[৫০৭] হজরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক, পৃষ্ঠা : ২৪৩
[৫০৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪১
[৫০৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪৩
[৫১০] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪১

এই ঘটনার পর সাবায়িরা অসন্তোষ প্রকাশ করে হজরত আলির আগেই বসরা ত্যাগ করে চলে যায়। তারা অন্য কোথাও গিয়ে আবারো দাঙ্গা বাধাতে পারে এই আশঙ্কায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য হজরত আলি রা. তাদের পেছনে পেছনে রওনা করেন। কিন্তু তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয়বারের মতো রঙ্গমঞ্চে আসার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে।[৫১১]

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এটা ছিল তাদের অসন্তোষ প্রকাশের একটা বাহানা মাত্র। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হজরত আলি রা. থেকে দূরে থাকা, যাতে তার পক্ষ থেকে কোনো ধরপাকড় হলে বাহানা দেখিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে নিতে পারে। কিন্তু হজরত আলি রা. তড়িঘড়ি করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে ছিলেন না। বরং যথেষ্ট চিন্তা ও বিচক্ষণতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করছিলেন।

জঙ্গে জামালের পরবর্তী পরিস্থিতি

জঙ্গে জামাল যদিও ছিল একটি সাময়িক দুর্ঘটনা; কিন্তু তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরবর্তী ইতিহাসের উপর অত্যন্ত গভীরভাবে ছায়াপাত করেছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন হজরত আলি রা.। কেননা তিনি যেকোনোভাবে খেলাফতের মর্যাদা রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। তা ছাড়া এই যুদ্ধে বসরার হাজার হাজার মানুষ হজরত আলির নেতৃত্বে লড়াই করতে গিয়ে কুফার বাহিনীর হাতে নিহত ও আহত হয়েছে। তাদের গোত্রগুলো এই হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য যদিও সরাসরি হজরত আলিকে দায়ী করেনি, বরং বাহ্যিকভাবে তারা তার সম্মুখে নতশিরই ছিল, তবু এখন তাদের জন্য হজরত আলির সাথে পরিপূর্ণ একাত্মতা ও আনুগত্য বজায় রাখা কঠিন ছিল। অথচ হজরত উসমান রা. এর কিসাস আন্দোলনের উদ্যোমী কর্মীরা তাদের নেতাদের প্রতি আগের মতোই নিষ্ঠা ও অবিচলতার সঙ্গে আনুগত্য করে যাচ্ছিল।

হজরত আলি রা. এর পক্ষে যেসব সৈন্য সমবেত হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই কুফা ও বসরার সেনাছাউনির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ের কয়েকটি ঘটনায় এসব সৈন্যের মনোভাব নষ্ট হয়ে

---

[৫১১] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৪৪

যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের সারিতে গিয়ে স্থান নেওয়ার একটি বড় কারণ ছিল জঙ্গে জামালের ঘটনায় তাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। এই রক্তক্ষরণ ইরাকের বিরাট সংখ্যক সিপাহির খেলাফতের পতাকাতলে লড়াইয়ের পথে অন্তরায় হয়েছিল এবং এটাই শামবাসীকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছিল।

জঙ্গে জামালের পরও সাবায়িদেরকে কেন বিচ্ছিন্ন করা হলো না?

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, হজরত আলি রা. জঙ্গে জামালের পূর্বেই তো সাবায়িদেরকে তার দল থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করেছিলেন, তা হলে যুদ্ধের পর তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলেন না কেন?

এর একটি কারণ এই ছিল যে, এ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যেমন শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল, জঙ্গে জামালের পর তা সৃষ্টি হয়নি। কেননা যুদ্ধের পর পরই হজরত আলিকে শামের প্রতি মনোনিবেশ করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় কারণ ছিল, হজরত উসমানের মূল হত্যাকারী ছিল নির্দিষ্ট কয়েকজন। তাদের সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত ও অনুসন্ধানের ইচ্ছা হজরত আলি রা. এর মনে অবশ্যই ছিল। কিন্তু যেসব বিদ্রোহী হজরত আলি রা. এর আশপাশে জড়ো হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল সরল সাধারণ মানুষ। তারা উসমান রা. এর বিরোধিতাকারীদের সহযোগী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। তাই শরিয়তের দৃষ্টিতে এই দলের যারা নিরপরাধ, তারাও শাস্তির আওতায় এসে পড়ে এমন কোনো সিদ্ধান্ত হজরত আলি তড়িঘড়ি করে নিতে চাচ্ছিলেন না।

মাসআলার দুটি দিক এবং হজরত আলির অবস্থান

জঙ্গে জামালের ঘটনায় এ বিষয়টি পরিষ্কার ছিল যে, খেলাফতের বিরুদ্ধে কোনো দল বা গোষ্ঠী সশস্ত্র বিদ্রোহ করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়। কিন্তু যারা বিদ্রোহ থেকে ফিরে এসে খলিফার আনুগত্য স্বীকার করবে, তাদের কী বিধান?

এ ক্ষেত্রে মাসআলাটির দুটি দিক ছিল। যথা :

১. প্রথম দিক হলো, বিদ্রোহ থেকে আত্মসমর্পণকারীরা ন্যায়পরায়ণ, খোদাভীরু এবং মুজতাহিদ হবে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা অস্ত্রধারণ করবে। এই অবস্থায় হজরত আলি রা. এর নিকট মাসআলা পরিষ্কার ছিল যে, এরা আত্মসমর্পণ করলে সকলে নিরাপদ হয়ে যাবে। এ কারণেই তিনি জঙ্গে জামালের পর লড়াইকারীদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করে তাদের সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন।

২. মাসআলার দ্বিতীয় দিক এই ছিল যে, বিদ্রোহীরা মুজতাহিদ নয়, বরং দাঙ্গাবাজ। যেমন ছিল হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে হজরত আলি রা. এর সম্মুখে এমন কোনো শরয়ি দলিল ছিল না, যার আলোকে একথা প্রমাণিত হবে যে, তাদের বিধান ভিন্ন এবং আত্মসমর্পণ করার পরও তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। তাই হজরত আলি রা. এর মতে এই শ্রেণির লোকেরাও নিরাপদ ছিল (পরবর্তীতে এ মাসআলায় সকল সাহাবি ও তাবেয়ির ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল)।

সম্ভবত একারণেই হজরত আলি রা. সাবায়িদের বিষয়ে কালক্ষেপণ করছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, আসলেই যদি তার মতের বিপরীত কোনো শরয়ি দলিল থাকে, তা হলে তা সামনে এসে যাক; আর বিদ্রোহীদের এ দলটি যেহেতু এখন প্রতিমুহূর্তে বনু হাশিমের জন্য জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প ব্যক্ত করছে; তাই যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিপরীত শরয়ি দলিল সামনে না আসে, ততক্ষণ এদেরকে পক্ষে রেখে অবশিষ্ট মুসলিমবিশ্বকে এদের সন্ত্রাস থেকে রক্ষা করা হোক।

যাই হোক, হজরত আলি রা. হজরত উসমান রা. এর কিসাস গ্রহণের কথা ভুলে যাননি। তবে তিনি চাচ্ছিলেন, বিদ্রোহীদের শাস্তির বিষয়টি যদি শরিয়তের বিধান মতেই হয়, তা হলে তা কার্যকর করার পূর্বে বিষয়টিকে সকলের ঐকমত্যের পর্যায়ে নিয়ে যাবেন। তার কর্মপন্থা কখনোই তাড়াহুড়ার ছিল না। মাসআলার তাহকিক, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও পূর্ণ সতর্কতা, এগুলোই ছিল হজরত আলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই জঙ্গে জামালের পরও তিনি সাবায়িদের বিরুদ্ধে কোনো বিধান জারি করেননি।

হজরত আলি এবং শামবাসীদের মধ্যকার মতানৈক্যের নেপথ্য কারণ

জঙ্গে জামালের হৃদয়বিদারক ফল, হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর আন্দোলনের পরিসমাপ্তি এবং হজরত আলি রা. এর সঙ্গে হজরত আয়েশা সিদ্দিকার সন্ধি, এগুলোর কোনোটিই শামবাসীদের মতের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারণ সেখানকার আকাশে-বাতাসে ছেয়ে গিয়েছিল অপপ্রচার ও গুজবের কালো ধোঁয়া। কিছু মানুষ মনে করছিল, হজরত আলি রা. সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে নিজের থেকে কিছু করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। আবার কেউ একধাপ এগিয়ে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, হজরত আলি রা. হজরত উসমান রা. এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত এবং অপরাধচক্রের পৃষ্ঠপোষক। আর তার খেলাফতও এ চক্রের দাপটেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শামবাসীর সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য

শামের পরিবেশ এতটা উত্তপ্ত করার পেছনে মূলত সন্ত্রাসী চক্রের বিরাট ভূমিকা ছিল। তারা কথায় কথায় কসম খেয়ে নানা রকম ভিত্তিহীন কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, 'কিছু মানুষ শামবাসীর সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, হজরত আলি রা. হজরত উসমান রা. এর হত্যায় শরিক ছিল। এ বিষয়টিই শামবাসীকে হজরত আলির খেলাফতের উপর বাইয়াত হতে বিরত থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা তারা বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, হজরত আলি জালেম। হজরত উসমান রা. এর হত্যাকাণ্ডে তিনি জড়িত ছিলেন। তিনিই খুনিদের আশ্রয় দিয়েছেন। কেননা তিনি এ হত্যাকাণ্ডে অপরাধীদের সঙ্গে ছিলেন।'[৫১২]

---

[৫১২] বর্ণিত আছে-

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, হজরত আলি রা. এর বিরুদ্ধে ছড়ানো উপরোক্ত সবকটি অভিযোগ ছিল মিথ্যা ও বানোয়াট। নিঃসন্দেহে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও স্বাধীন শাসক ছিলেন। হজরত উসমানের হত্যার দায় থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ।

কিন্তু তবু নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে শামবাসীর জন্য কোনো ভুল ধারণার শিকার হওয়া কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। তার বড় কারণ ছিল তিনটি। যথা :

১. হজরত উসমান গনি রা. এর শাহাদাতের নির্মম ঘটনা শামের পরিবেশে ব্যথা ও বেদনার ঢেউ সৃষ্টি করেছিল। আর এ ধরনের মুহূর্তে প্রায়ই কিছু কিছু গভীর বিষয় মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, আর কিছু সন্দেহ ও অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়।

২. শামবাসী ছিল ফেতনা ঘটনার থেকে অনেক দূরে। আর বর্তমান যুগে যেখানে সবধরনের যোগাযোগ মাধ্যম হাতের নাগালে, ইউরোপে বসেও মানুষ সরাসরি এশিয়ার দৃশ্য পর্দায় দেখতে পায়, সেখানেও দেখা যায় ঘটনাস্থলে থাকা না থাকার ভিত্তিতে ঘটনা সম্পর্কে ধারণায় অনেক তারতম্য হয়ে যায়। এমনকি একই শহরের কোনো এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে সেই এলাকার লোকেরা যতটা গভীরভাবে জানে ও বোঝে, অন্য মহল্লার লোকেরা তা জানতে বা বুঝতে পারে না।[৫১৩] সুতরাং মদিনায় সৃষ্ট হাঙ্গামা ও ইরাকের মাটিতে ঘটে যাওয়া রক্তপাত সম্পর্কে শামবাসীর কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। আর এটাই হয়েছে।

ان قوما شهدوا عليه بالزورعند اهل الشام انه شارك فى دم عثمان وكان هذا مما دعاهم الى ترك مبايعته لما اعتقدوا انه ظالم وانه من قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. (منهاج السنة : ٤/٤٠٦)

[৫১৩] যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ليس الخبر كالمعاينة.

চোখে দেখা বিষয় ও কানে শোনা বিষয়ের মাপকাঠি কখনো এক হতে পারে না। (মুসনাদে আহমাদ, বর্ণনা: ২৪৪৭)

আরবের লোকেরা বলে থাকে,

صاحب البيت أدرى بما فيه

ঘরের মালিকই ঘরের জিনিস সম্পর্কে অধিক অবগত হয়ে থাকে।

৩. হজরত উসমান রা. এর শাহাদাত এবং জঙ্গে জামালের ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে সন্ত্রাসীরা শামের মানুষদের মধ্যে অন্যায় পক্ষপাত জাগিয়ে তুলেছিল। সেখানে অবস্থানরত সাহাবিদের সদিচ্ছা সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল বটে; কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্যায় পক্ষপাত উথলে ওঠাও অস্বীকার করা যায় না।[৫১৪]

এসব কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে সংলাপ ও সমঝোতার সব পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং যুদ্ধ অবধারিত হয়ে পড়ে।

শামবাসীর অবস্থান

শামবাসী হজরত আলি রা. কে হজরত উসমান রা. এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত কিংবা হত্যাকারীদের পৃষ্ঠপোষক মনে করে তার হাতে বাইয়াত হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল। শামের স্বনামধন্য শাসক হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলি রা. এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতেন না। কিন্তু কিসাস-আন্দোলনের শীর্ষ নেতা হিসেবে তার দাবি ছিল, হজরত উসমানের হত্যার দায় থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য হজরত আলি হয় নিজে হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণ করবেন, অথবা তাদেরকে শামবাসীর কাছে হস্তান্তর করবেন। তা না হলে তিনি কোনোভাবেই শামবাসীর আস্থা কুড়াতে পারবেন না এবং তার খেলাফতও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করা হবে না। বরং তার অবস্থান সেই দলের নেতার মতোই হবে, যাদের সম্পর্কে সাবেক খলিফাকে শহিদ করার অভিযোগ রয়েছে। তাই হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দাবি ছিল, আস্থা অর্জন করার জন্য হজরত উসমানের কিসাস বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তারপরই যেন আমাদেরকে বাইয়াতের আহ্বান করা হয়, তার আগে নয়। হজরত মুয়াবিয়া রা. ভরা মজলিসে বলতেন, 'হজরত আলির সাথে

---

[৫১৪] কট্টরপন্থি সাধারণ মানুষের এই দলটিই পরবর্তীতে 'মারওয়ানি' নামে পরিচিতি লাভ করে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন,

مع معاوية طائفة كثيرة من المروانية وغيرهم كالذين قاتلوا معه.

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথে মারওয়ানি এবং অন্যান্য লোকের একটি বড় দল ছিল, যারা তার পক্ষে লড়াই করেছে। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৩৯৯)

আমার লড়াই কেবল হজরত উসমানের খুনের বদলা গ্রহণ সম্পর্কে, অন্যকোনো বিষয়ে নয়।'[৫১৫]

কিন্তু হজরত আলি রা. এর দৃষ্টিতে শামবাসীর সকল সংশয় ছিল ভিত্তিহীন। তার মতে সমস্যার সমাধান কেবল এটাই ছিল যে, তার হাতে বাইয়াত হওয়ার মাধ্যমে খেলাফতের ভিত্তি আরো দৃঢ় করা হবে। তারপর তার ইজতিহাদি মতের উপর চিন্তাভাবনা করে মাসআলার চুলচেড়া বিশ্লেষণ করা হবে। তারপর শরয়ি আইনের সীমার মধ্যে থেকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়ে যেত।[৫১৬] কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদিনের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনার সময় হজরত আলির যে বিশেষ গুণটির কথা উল্লেখ করেছিলেন, তা হলো وأقضاهم عليٌّ অর্থাৎ সাহাবিদের মধ্যে বিচার ও মীমাংসার কাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে আলি।[৫১৭] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজরত আলির ইজতিহাদ গ্রহণ করার উপযুক্তই ছিল।

এ কারণেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. হজরত আলির হাতে বাইয়াত হওয়া থেকে শামবাসীর দ্বিধা-সংশয়কে ভুল আখ্যায়িত করে লিখেছেন, বরং হজরত আলির হাতে যদি হজরত উসমান রা. এর হত্যাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকত, আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তিনি এ ওয়াজিব বিষয়টি কোনো ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কিংবা গুনাহ করেই বর্জন করেছেন, তা হলে তখনও সেটা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ হওয়া উচিত ছিল না। বরং সর্বাবস্থায় দীনের স্বার্থ রক্ষার জন্য হজরত আলির হাতে বাইয়াত হয়ে যাওয়া, না হওয়ার তুলনায় অধিক উপযোগী

---

[৫১৫] হজরত মুআবিয়া রা. বলেন,

ما قاتلت عليا الا فى امر عثمان.

হজরত উসমানের কিসাস ছাড়া কোনো বিষয়ে আমি আলির সাথে যুদ্ধ করিনি। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩০৫৫২)

[৫১৬] উম্মাহর অধিকাংশ আলেমের মত এটাই যে, হজরত উসমানের কিসাসের বিষয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মত ছিল ইজতিহাদি ভুল। আর হজরত আলি রা. এর মত ছিল সঠিক।

[৫১৭] হজরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত আছে-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ارحم امتى بامتى ابو بكر، واشدهم فى أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم على بن ابى طالب. (سنن ابن ماجة : ١٥٤ بسند صحيح)

ছিল। আর এটাই মুসলমানদের জন্য অধিক উপকারী এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের সর্বাধিক অনুগত হতো। কেননা সহিহ সনদে আল্লাহর রাসুল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমাদের থেকে আল্লাহ তিনটি বিষয় কামনা করেন। এক. তোমরা তার ইবাদত করবে। দুই. তার সাথে কাউকে শরিক করবে না। আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং পরস্পরে মতবিরোধ করবে না। তিন. তোমরা তোমাদের শাসকদের কল্যাণ কামনা করবে।

সহিহ হাদিসে আরো ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহর নবী বলেছেন, মুসলমান ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হচ্ছে শুনবে (শাসকের কথা মান্য করবে) ও আনুগত্য করবে, সুখে থাকুক বা দুঃখে, আনন্দে থাকুক বা কষ্টে এবং তার উপর অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া হলেও। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে গুনাহের আদেশ না করা হবে ততক্ষণ সে অনুগতই থাকবে। যখন কোনো গুনাহের আদেশ করা হবে, তখন শুনবেও না, মানবেও না'।[৫১৮]

শামবাসীর সংশয় দূরীকরণে হজরত আলির পদক্ষেপ

যাই হোক, শামবাসীর সংশয় যখন দূর হলো না, তখন তা দূর করার সম্ভাব্য চেষ্টা হিসেবে হজরত আলি রা. কুফার জামে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'হে বনু উমাইয়া, তোমরা চাইলে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মধ্যখানে দাঁড় করিয়েও আমার থেকে কসম গ্রহণ করতে পারো যে, আমি হজরত উসমান রা. কে হত্যাও করিনি, এবং হত্যাকাণ্ডে শরিকও হইনি'।[৫১৯]

কিন্তু বনু উমাইয়া এই কসমও বিশ্বাস করল না।

---

[৫১৮] বর্ণিত আছে-

بل لو كان قادرا على قتل قتلة عثمان وقدر انه ترك الواجب اما متأولا واما مذنبا، لم يكن ذلك موجبا لتفريق الجماعة والامتناع عن مبايعته ولمقاتلته بل كانت مبايعته على كل حال اصلح فى الدين وانفع للمسلمين واطوع لله ورسوله من ترك مبايعته. (منهاج السنة : ٤١١/٤)

এরপর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. আল্লাহর নবীর সেই বাণীসমূহ উল্লেখ করেছেন, যাতে গুনাহ ব্যতীত সর্বাবস্থায় শাসকদের আনুগত্য বজায় রাখার আদেশ করা হয়েছে।

[৫১৯] তারিখে দিমাশক : ৩৯/৪৫১, হজরত উসমান বিন আফফান রা.র জীবনীর আলোচনা।

সন্ধি ও সমঝোতায় আগ্রহী সাহাবিগণ

শামেও বহু বিজ্ঞ সাহাবি ছিলেন নিরপেক্ষ অবস্থানে। হজরত আলি রা. সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন, তাদেরকে তার সঙ্গে একাত্ম করে নিতে। এমনই একজন নিরপেক্ষ সাহাবি ছিলেন হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রা.। হজরত আলি রা. আশআস বিন কায়েস এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কে তার কাছে পাঠালেন। হজরত জারির রা. শাম ও ইরাকের সীমান্তবর্তী কারকিস নামক এলাকায় বসবাস করতেন। হজরত আলির প্রেরিত প্রতিনিধিদল তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমিরুল মুমিনিন আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। আর বলেছেন, আল্লাহ আপনার অন্তরে উত্তম কথা ঢেলে দিয়েছেন। তাই আপনি মুয়াবিয়া রা. থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। আমার কাছে আপনার মর্যাদা তেমনই, যেমনটি আল্লাহর নবী আপনাকে দিয়েছিলেন।

হজরত জারির রা. উত্তরে বললেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন, যেন আমি সেখানকার লোকদের সাথে যুদ্ধ করি এবং তাদেরকে لا إله إلا الله এর দাওয়াত পেশ করি। এ কালিমা পাঠ তরলে তাদের জান-মাল সুরক্ষিত থাকবে। সুতরাং এখন আমি কালিমা-বলা কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না'।

হজরত জারির রা. এর এই উত্তর শুনে হজরত আশআস বিন কায়েস এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. ফিরে আসেন।[৫২০] এর কিছুদিন পর হজরত জারির রা. উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতার সংলাপ করানোর নিয়তে হজরত আলি রা. এর কাছে যান। হজরত আলি হজরত মুয়াবিয়াকে বাইয়াতের দাওয়াত দিয়ে হজরত জারির রা.কে তার প্রতিনিধি বানিয়ে শামে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও সফলতা লাভ করেনি।[৫২১]

সমস্যা আরো জটিল করেছে যারা

এই সময় কিছু লোক সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলার অপচেষ্টা চালাচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় হজরত জারির রা. এর ব্যর্থ হয়ে ফিরে

---

[৫২০] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ২/৩৩৪

[৫২১] আল মুনতাযাম লিবনি জাওযি : ৫/৯৭

আসার দরুন আশতার নাখায়ি হজরত জারির এবং হজরত আলি রা. কে নানাভাবে তিরস্কার করল এবং সে নিজে শামে গিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথে কথা বলার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করল। সে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন যদি আমাকে শামে পাঠাতেন, তা হলে মুয়াবিয়ার সম্মুখে আমি বোবা হয়ে থাকতাম না। আমি তার হুঁশ হারিয়ে দিতাম'।

তারপর হজরত জারির বিন আবদুল্লাহকে লক্ষ করে বলল, যদি আমিরুল মুমিনিন আমার কথা শোনেন, তা হলে বলব, তোমার মতো লোকদেরকে ততদিন পর্যন্ত কারারুদ্ধ রাখা উচিত, যতদিন এ বিষয়ের সমাধান না হয়'।

এই আশতার নাখায়ির মতো লোকদের অসভ্য আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েই হজরত জারির রা. শেষ পর্যন্ত আবারও শামে ফিরে যান এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সঙ্গে মিলে যান।[৫২২] তবে এটা প্রমাণিত নয় যে, তিনি দুই পক্ষের কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কি না।

আবু মুসলিম খাওলানি রহ. এর মধ্যস্থতা

কতিপয় বিজ্ঞ মানুষ তারপরও হজরত আলি রা. এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানোর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরই অংশ হিসেবে হজরত আবু মুসলিম খাওলানি রহ. একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন, 'আপনি কেন হজরত আলির বিরোধিতা করছেন? তিনি কি আপনার সমপর্যায়ের?

হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, 'কখনোই নয়। আল্লাহর কসম, আমি জানি, নিঃসন্দেহে তিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং খেলাফতের জন্য আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু আপনারা কি জানেন না যে, হজরত উসমানকে কতটা নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে? সুতরাং আপনারা হজরত আলির কাছে গিয়ে বলুন, তিনি হজরত উসমানের হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে ন্যস্ত করেন। ব্যস, তা হলেই আমি তার আনুগত্য স্বীকার করে নেব'।[৫২৩]

---

[৫২২] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৬২

[৫২৩] তারিখে দিমাশক : ৫৯/১৩২, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১৪০,

হজরত আবু মুসলিম খাওলানি রহ. এর দল হজরত মুয়াবিয়া রা. এর এই দাবি নিয়ে হজরত আলির খেদমতে উপস্থিত হলো। কিন্তু হজরত আলির সামনে বিদ্যমান শরয়ি দলিল ও কিছু বাস্তবতার ভিত্তিতে এ দাবি একদম গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই অবস্থা যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গেল।[৫২৪]

শাসনক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার

হজরত মুয়াবিয়া রা. ও শামের অন্যান্য সাহাবি ও তাবেয়ির খাঁটি নিয়ত, উত্তম কর্মপন্থা এবং উচ্চপর্যায়ের যোগ্যতা সম্পর্কে হজরত আলি রা. এর অন্তরে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তার পক্ষ থেকে প্রেরিত গভর্নরকে শাম থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় খেলাফত-ব্যবস্থার কোনো নিয়ন্ত্রণই শামে কার্যকর ছিল না। এর ফলে মুসলিমবিশ্ব যেন দুই টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি মধ্যস্থতার সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন শামের সমস্যা সমাধানের জন্য হজরত আলি রা. ক্ষমতা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন।[৫২৫]

হজরত আলি রা. তার এই ক্ষমতা ব্যবহারের দলিল পেশ করে বলতেন, 'কেউ যদি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর বাইয়াত বিনষ্ট করত, তা

عن ابی مسلم الخولانی، وهذا الاسناد حسنه ابن حجر فقال : وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفی احد شيوخ البخاری فی كتاب صفين فی تاليفه بسند جيد عن ابی مسلم الخولانی (فتح الباری : ٨٦/١٣) وذكر ابو حنيفة الدينوری بسياق آخر (الاخبار الطوال، ص ١٦٢، ١٦٣، ط دار إحياء الكتب العربی)

[৫২৪] তারিখে দিমাশক : ৫৯/১৩২, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১৪০,

[৫২৫] আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন-

"وذهب جمهور اهل السنة الى تصويب من قاتل مع على لامتثال قوله تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية. ففيها الامر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت ان من قاتل عليا كانوا بغاة وهولاء مع هذا التصويب متفقون على انه لا يذم واحد من هولاء بل يقولون اجتهدوا فاخطئوا." (فتح الباری : ٦٧/١٣، كتاب الفتن، ط دار المعرفة)

وقال الامام النووی رحـ : " هذه الروايات صريحة فی ان عليا رضـ كان هو المصيب المحق. (شرح صحيح مسلم : كتاب الزكوة، باب اعطاء المولفة) وقال ابن العربی رحـ : فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين ان عليا رضـ كان اماما، وان كل من خرج عليه باغ. (أحكام القرآن، سورة الحجرات)

হলে তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতাম। কেউ যদি হজরত উমর রা. এর বাইয়াত বিনষ্ট করত, তা হলে তার বিরুদ্ধেও আমরা যুদ্ধ করতাম'।[৫২৬]

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাযাম জাহিরি রহ. বলেন, 'হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথে হজরত আলি রা. এর যুদ্ধ এজন্য ছিল না যে, হজরত মুয়াবিয়া হজরত আলির হাতে বাইয়াত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। কেননা বিরত থাকার অধিকার হজরত মুয়াবিয়ারও ছিল, যেমন ছিল হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং (বাইয়াত না হওয়া) অন্যদের জন্য। সুতরাং হজরত মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধের কারণ হলো, হজরত মুয়াবিয়া পুরো শামে হজরত আলির আদেশ জারির পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন; অথচ হজরত আলি রা. শরিয়তসম্মত খলিফা ছিলেন, যার আনুগত্য সকলের জন্য ওয়াজিব ছিল। সুতরাং হজরত মুয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধের বিষয়ে হজরত আলি রা. এর মত সঠিক ছিল'।[৫২৭]

শামের বিরুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহ এবং সেনাবাহিনীর বিন্যাস

হজরত আলি রা. কুফায় একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন, যা সংখ্যায় জঙ্গে জামালের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় অনেক বড় ছিল। কেননা বসরা ও কুফা ব্যতীত মাদায়েন ও মুসেলের বিভিন্ন গোত্রও এবারের বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিল।[৫২৮]

হজরত আহনাফ বিন কায়েস রহ. জঙ্গে জামালে নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু এবার তিনিও তার বাহিনী নিয়ে হজরত আলি রা. এর পক্ষে সমবেত হয়েছিলেন।[৫২৯] নাখাআ গোত্রের সরদার আশতার নাখায়ি শুরুতে সিফফিন যেতে গড়িমসি করেছিল এবং তার গোত্রকে সন্দেহের মধ্যে

---

[৫২৬] ولو ان رجلا ممن بايع ابا بكر خلعه لقاتلناه، ولو ان رجلا ممن بايع عمر خلعه لقاتلناه. (الاعتقاد للبيهقى، ص ٣٧١، ط دار الآفاق)

[৫২৭] ولم يقاتله على لامتناعه من بيعته، لانه كان يسعه فى ذلك ما وسع لابن عمر وغيره، لكن قاتله لامتناعه من انفاذ اوامره فى جميع ارض الشام، وهو الامام الواجبة طاعته، فعلى مصيب فى هذا. (الفصل فى الملل والاهواء والنحل : ج ٤ ص ١٢٤)

[৫২৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৬৩

[৫২৯] বালাজুরি কৃত 'আনসাবুল আশরাফ : ২/২৯৫,

ফেলে দিয়েছিল।[৫৩০] কিন্তু পরে সে তার দলবল নিয়ে সেনাবাহিনীতে শামিল হয় এবং প্রত্যেক প্রথম দলের নেতৃত্ব তাকেই দেওয়া হয়।[৫৩১]

শামের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য

শামবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হজরত আলি রা. এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহকে একতাবদ্ধ করা এবং ইসলামের ভূখণ্ডকে একীভূত করা। বিশাল বাহিনী সমবেত করার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, শামবাসীকে একেবারে পিষে ফেলবেন। বরং উদ্দেশ্য ছিল অধিক সৈন্য দেখিয়ে প্রতিপক্ষের উপর যুদ্ধের আগেই চাপ সৃষ্টি করা এবং বিনাযুদ্ধে কিংবা সাধারণ লড়াই দ্বারাই বিষয়টির সমাধান করা।

মূলত হজরত আলি রা. ছিলেন একতা ও ঐক্যের প্রতি আহ্বানকারী। যেমনটি তার প্রতিনিধি হজরত আবু মাসউদ রা. সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরুর সময় কুফার জামে মসজিদে শ্রোতাদের লক্ষ করে বলেছিলেন। তিনি বলেন, 'হে লোকসকল, (এ সমস্যা সমাধানের জন্য) বেরিয়ে পড়ো। যারা বের হবে, তারাই নিরাপদ থাকবে। আমরা এ বিষয়টি শান্তির উপায় মনে করি। আল্লাহ যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাহর মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেন এবং ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন জুড়ে দেন'।[৫৩২]

ইরাক ও শামের মানুষের চিন্তা ও স্বভাবের পার্থক্য এবং ইরাকিদের স্বাধীন মনোভাব

একই শরিয়তের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ইরাকি ও শামি বাহিনীতে শামিল হওয়া সাধারণ সৈনিক ও কমান্ডার ও গোত্রপতিদের চিন্তা ও মানসিকতায় অনেক পার্থক্য ছিল। হজরত আলি রা. এর অনুসারী অধিকাংশ লোক ছিল আরবের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা, যাদের গোত্র শুরু থেকেই স্বাধীন মনোভাবের এবং স্বকীয় চিন্তা ও ক্ষমতার অধিকারী। তদুপরি একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের উপর ইরানি সাম্রাজ্যের ছায়া পড়ে আসছিল। আর তা আকিদা ও মতাদর্শ থেকে শুরু করে রাজনীতি ও সংস্কৃতি পর্যন্ত

---

[৫৩০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৭৮৪, সনদ সহিহ,

[৫৩১] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৬৬

[৫৩২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৭৪,

বিস্তৃত ছিল। ফলে এসব অঙ্গনে সৃষ্টি হয়েছিল অস্থিরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও বহু রূপ। ইরানি সাম্রাজ্যের শেষ ৪০-৫০ বছর কেটেছে সীমাহীন অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে। শাসকদের ঘন ঘন পরিবর্তন, স্থানে স্থানে বিদ্রোহ এবং আঞ্চলিক ষড়যন্ত্রের ফলে জনসাধারণ সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগে এ অঞ্চলে, বিশেষত কুফা ও বসরায় পূর্ব আরবের এমন কিছু লোক এসে বসবাস করতে শুরু করে, যাদের পূর্বপুরুষেরা বাধা-বিঘ্নহীন স্বাধীন পরিবেশে থেকে অভ্যস্ত ছিল।

যদিও ইসলামি আকিদা ও শরিয়ত বাস্তবায়নের ফলে কুফা ও বসরা এবং তার আশপাশের এলাকা কুফর-শিরক এবং চরিত্রহীনতা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র ছিল; কিন্তু এখানকার প্রাচীন অধিবাসী ও নবাগত আরবদের স্বভাবে বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল আগের মতোই। পাশাপাশি বিগত কয়েক বছর যাবৎ এই অঞ্চলে সাবায়িদের সরব পদচারণা ছিল। যার ফলে কিছু মানুষ গোপনে আকিদাগত ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছিল। সাবায়িরা বহু মানুষকে খেলাফতের আনুগত্য এবং বিশিষ্ট সাহাবিদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের আবেগ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। এমন বহু মানুষ হজরত আলি রা. এর এই বাহিনীতেও ছিল। তাদের উপস্থিতিতে প্রতিমুহূর্তে গোলযোগ ও হানাহানী বেধে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল। এদের কারণেই গোটা বাহিনীর জন্য কোনো একটি কর্মপন্থায় একমত হওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি এদের সঙ্গে নিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়া ছিল সত্যিই বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

শামবাসীর স্বভাব ও প্রকৃতি

অন্যদিকে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর অধীনস্থ শামের অঞ্চলটি বহু শতাব্দীকাল থেকে রোম সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধানে ছিল। রোমানরা তাদের ভ্রান্ত আকিদা ও আমল সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলার দিক থেকে একটি স্বীকৃত সফল জাতি ছিল। যার ফলে যে মুসলিমরা তাদেরকে পরাজিত করেছিল এবং যারা সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল, তাদেরও অধিকাংশ ছিল আরবের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রসমূহের সদস্য, যারা বহু আগ থেকেই তুলনামূলক সভ্য ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। তদুপরি

বিগত চব্বিশ বছর যাবৎ শামে চলে আসছিল বনু উমাইয়া বংশের একক শাসন ও কর্তৃত্ব। হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রা. এর পর তারই অনুজ হজরত মুয়াবিয়া রা. শামের গভর্নর পদে সমাসীন আছেন। সুতরাং প্রায় বিশ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে হজরত মুয়াবিয়া শামে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছেন। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত চরিত্রবান, চিন্তাশীল এবং দূরদর্শী। এমনকি বনু উমাইয়া বংশের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল হজরত মুয়াবিয়ার ব্যক্তিত্বে। উন্নত চরিত্র মাধুর্য, দান-দক্ষিণা ও উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তিনি মানুষকে হাসি-খুশি রাখতেন।

এসব কারণে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সেনাবাহিনী ছিল আনুগত্য ও বশ্যতা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার সর্বোত্তম আদর্শে উত্তীর্ণ।

দুই বাহিনীতে আইন-শৃঙ্খলার পার্থক্য

উভয় বাহিনীতে নিয়ম-শৃঙ্খলার অবস্থায়ও বেশ পার্থক্য ছিল। একটি ঘটনা থেকে এর ধারণা পাওয়া যায়।

হজরত আলি রা. কুফায় সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার সময় শেষ সতর্কবার্তা হিসেবে তার দূতকে শামে পাঠালেন। তিনি হজরত মুয়াবিয়া রা. কে সংবাদ দিলেন যে, হজরত আলি রা বাহিনী প্রস্তুত করছেন। সংবাদ শুনে হজরত মুয়াবিয়া রা. নামাজের পর মসজিদে উপস্থিত জনসাধারণকে এই অবস্থা বর্ণনা করে পরামর্শ চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা নত করে ফেলল। শুধু একজন আমির বললেন, 'আপনার যা মত, সেটাই আমাদের মত। আপনি আদেশ করুন, আমাদের কাজ শুধু আনুগত্য করা'। একথা শুনে হজরত মুয়াবিয়া রা.-ও বাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন।

দূত ফিরে গিয়ে হজরত আলি রা. এর কাছে এ কথা জানালেন। তখন তিনিও নামাজের পর মসজিদে উপস্থিত লোকদেরকে শামবাসীর যুদ্ধের প্রস্তুতির সংবাদ শুনিয়ে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু একথা শুনতেই প্রত্যেকে চিৎকার করতে লাগল, 'হে আমির, এভাবে করুন। আমিরুল মুমিনিন, ওভাবে করুন'।

হজরত আলি রা. انا لله وانا اليه راجعون বলে উঠলেন এবং মিম্বার থেকে নেমে এলেন।[৫৩৩]

ফুরাত থেকে সিফফিন

হজরত আলি রা. পরামর্শের পর নিজে বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তারপর কুফায় হজরত আবু মাসউদ রা. কে তার প্রতিনিধি বানিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেন। প্রায় ৭০০ মাইল (১১২৭ কিলোমিটার) পথ পাড়ি দিয়ে শামের সীমান্ত বলে বিবেচিত ফুরাত নদীর তীরে এসে পৌঁছেন।[৫৩৪]

হজরত আলি রা. তার বিশাল বাহিনী ও রসদপত্র সহকারে রাক্কা নামক স্থান দিয়ে নদী পার হন।[৫৩৫] ৩৬ হিজরির যিলহজ মাসের শুরুর দিকে পুরো বাহিনী নিয়ে তিনি ফুরাত নদীর অপর তীরে সিফফিন নামক ময়দানে গিয়ে ছাউনি ফেলেন।[৫৩৬]

শামের বাহিনী আগ থেকেই সেখানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিল।[৫৩৭]

---

[৫৩৩] তারিখে দিমাশক : ১৭/৩৯১, তারিখুল ইসলাম লিয জাহাবি : ৩/৫৪১, ৫৪২, তাদাম্মুরি, ২/৩০৪, ৩০৫ বাশ্‌শার।

[৫৩৪] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৬৩ থেকে ৫৬৬

[৫৩৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৬৬

[৫৩৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৪৯৭

[৫৩৭] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৩

নোট : রাফেজি সম্প্রদায় হজরত আলি রা. কে তাদের নেতা প্রমাণ করার জন্য এমন কিছু গুজব রটিয়ে রেখেছিল (যা বানোয়াট বর্ণনা হিসেবে ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ আছে)। তা থেকে ধারণা হতে পারে যে, হজরত আলি রা. কে খলিফা বানিয়েছিল সাবায়িরা, আর অধিকাংশ সাহাবি হজরত আলি থেকে পৃথক ছিলেন। সাবায়িরাই তার আশপাশে প্রবল ছিল। তাই তার বাহিনীতেও সাবায়িদের সংখ্যা বেশি ছিল। তাদের কথায়ই শামে আক্রমণ করা হয়েছিল।

অন্যদিকে মারওয়ানি মহোদয়গণ যেহেতু এমন প্রতিটি রাফেজি বর্ণনাকে খাঁটি ঈমান বলে বিশ্বাস করেন, যার দ্বারা হজরত আলি রা. এর পক্ষটি দুর্বল মনে হয়, তাই তারা উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, হজরত আলির বাহিনীতে সাবায়িদের আধিক্য ছিল। তারাই মূলত শামের উপর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ছিল। ফলে সিফফিনের যুদ্ধেও অধিকাংশ নিহত ছিল সাবায়ি। শামবাসীরা যথাযথভাবেই তাদেরকে হত্যা করেছিল।

পরিস্থিতির প্রতিকূলতা এবং উভয় পক্ষের স্ব স্ব অবস্থানের উপর অবিচল দৃঢ়তা মুসলিম উম্মাহর বিশাল দুই বাহিনীর নেতাদেরকে সশস্ত্র সৈন্য-সামন্তসহ যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

কিন্তু মারওয়ানি চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে কতিপয় নতুন 'মুহাক্কিক' আহলে সুন্নাতকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য এমনও বলে থাকেন যে, হজরত আলি এবং সঙ্গের সাহাবিরা তো শুধু সাবায়িদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে করেই শাম চলে গিয়েছিল।

কিন্তু এ মতটি কতটা অন্তঃসারশূন্য তা আমরা আলোচনার শেষে 'সংশয় নিরসন' শীর্ষক শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে শুধু এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ ইতিহাসের দুর্বল কোনো বর্ণনার উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং আল্লাহর নবীর হাদিসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র হাদিস-সমাহার আমাদের বলছে যে, সিফফিনের যুদ্ধে উভয় দিকেই সিংহভাগ ছিলেন নেক ও সম্ভ্রান্ত মানুষ। আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন,

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، تمرق بينهما مارقة، يقتلها اولى الطائفتين بالحق. (مصنف عبد الرزاق، ح : ١٨٦٥٨)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

تمرق مارقة عند فئة المسلمين يقتلها اولى الطائفتين بالحق. (صحيح مسلم : ح : ٢٥٠٧ ، سنن ابى داؤد، ح : ٤٦٦٧)

এ ধরনের আরো কিছু হাদিসের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাতের ঐকমত্য এই যে, সিফফিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষ ছিল নেককার ও নেক নিয়তের অধিকারী। আর এ কারণেই হজরত আলি রা. এ যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে বলেছেন,

قتلانا وقتلاهم في الجنة

আমাদের ও তাদের থেকে যারাই নিহত হয়েছে, সবাই জান্নাতি। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৮০, আর রুশদ)

মারওয়ানিদের মতপন্থি উক্ত নব্য গবেষকদের এ ধারণা যদি সঠিক হতো যে, সাবায়িরাই শামের উপর আক্রমণ করেছিল, তাহলে তো হজরত আলি রা. এভাবে বলতেন,

قتلانا في جهنم وقتلاهم في الجنة

আমাদের নিহতরা জাহান্নামি, আর তাদের নিহতরা জান্নাতি।

তবে সিফফিনের যুদ্ধে সন্ত্রাসী ও মুনাফিক যে ছিল না, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এমন মানুষ তো বিভিন্ন যুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহর নবীর সাথেও গিয়েছিল। সুতরাং সন্ত্রাসী ছিল বলে তার অর্থ এই নয় যে, তারাই হজরত আলিকে যুদ্ধে নিয়েছিল। সিফফিনের যুদ্ধে তারা ছিল বটে; কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই কম ছিল যে, আল্লাহর নবীর বাণী তাদেরকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি।

সিফফিনের যুদ্ধ

হজরত আলি রা. এর হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দুই বিশাল বাহিনী সিফফিনের ময়দানের দুই প্রান্তে ছাউনি ফেলল। দীর্ঘ দুই মাস তারা মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে দুই বাহিনীর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ খণ্ড খণ্ড যুদ্ধও হতে লাগল। দুই বাহিনীর নামকরা সেনাপতিদের মধ্যে দুএকবার মোকাবেলাও হলো। তবে ধারণা করা হয় যে, বর্ণনাকারীরা এ যুদ্ধের বিবরণে বিভিন্ন জায়গায় অতিরঞ্জন করেছেন।[৫৩৮]

পানি বন্ধ করার রহস্য

অতিরঞ্জনের একটি উদাহরণ সেই বর্ণনা, যাতে বলা হয়েছে, হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলি রা. এর বাহিনীর জন্য পানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইরাকি বাহিনী বহু কাটখড় পোড়ানো, এমনকি রক্ত ঝরানোর পর পানি পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল।[৫৩৯] অথচ সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনার বাস্তবতা কেবল এতটুকু ছিল যে, উভয় পক্ষ নিজ নিজ বাহিনীর নিকটস্থ পানির উৎস নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে চাচ্ছিল।[৫৪০] কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত আছে, সেখানে বড় কোনো

---

[৫৩৮] সিফফিন যুদ্ধের অধিকাংশ তথ্য দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত। আমরা এখানে যে বিবরণ পেশ করছি, তাতে ঐসব বর্ণনা বাদ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়া বর্ণিত হয়ে আসছে এবং স্থানে স্থানে সাহাবায়ে কেরামের নিন্দা করা হয়েছে। আমাদের বর্ণনায় হাদিস থেকে অধিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সহিহ বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অবশ্য যেসব বিষয়ের সম্পর্ক কেবল সংবাদের সাথে, যেমন যুদ্ধের দিন-তারিখ, সংঘটিত হওয়ার স্থান, ইত্যাদি বিষয়ে আমরা কিছু দুর্বল ঐতিহাসিক বর্ণনাকারীর তথ্যও নিয়েছি।

[৫৩৯] ওয়াকআতু সিফ্ফীন, কৃত : নাসর বিন মুজাহিম, পৃষ্ঠা : ১৬৬ - ১৮৭ পর্যন্ত।

[৫৪০] সিফফিনের স্থানে এখন 'বানাতে আবি হুরাইরা' নামে একটি জনপদ আছে। সেখানে আজ পর্যন্ত নদী থেকে একটি ছোট্ট নালা এসে মিলেছে। (مقالة عبد القادر ريحان،

লড়াই হয়নি। বরং ঘটনা এতটুকু যে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বাহিনী সেখানে আগে পৌঁছেছিল। তাই তারা পানির উৎসটি নিজেদের অধিকার বলে দাবি করছিল। তারপর যখন হজরত আলি রা. এর প্রতিনিধি পানি নেওয়ার সুযোগ দাবি করল, তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. খুশিমনেই অনুমতি দিয়ে দেন। বর্ণিত আছে, 'আবু সালাত সুলাইম আল খায়রামি (সিফফিনের যুদ্ধে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর জনৈক সিপাহি) বলেন, আমরা ইরাকবাসী ও পানির মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে এ অশ্বারোহী এলো। তিনি ছিলেন হজরত আশআস বিন কায়েস রা.। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'মুয়াবিয়া, আল্লাহকে ভয় করুন, উম্মাহর বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করুন। চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি ইরাকিদের হত্যা করে ফেলেন, তা হলে তাদের সন্তানদের দায়িত্ব কে নেবে? অথবা ধরুন যদি আমরা আপনাদের সকলকে হত্যা করি, তা হলে আপনার পরিবার-পরিজনকে কে আশ্রয় দেবে? আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

> যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরে যুদ্ধে নেমে পড়ে, তা হলে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও।[৫৪১]

হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, আপনি কী চান?

তিনি বললেন, আমাদের জন্য পানির পথ ছেড়ে দিন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. আবুল আওয়ারকে বললেন, আমাদের ভাইদের জন্য পানির পথ ছেড়ে দাও।[৫৪২]

এ বর্ণনা থেকে জানা গেল, পানি নেওয়ার জায়গায় মতবিরোধ হয়েছিল বটে; কিন্তু তরবারি চালানোর প্রয়োজন আসেনি।

সিফফিনের যুদ্ধে দুর্বল ও মিথ্যা বর্ণনাকারীরা প্রচুর পরিমাণে এমন ঘটনা বর্ণনা করেছে, যাতে অতিরঞ্জন ও অন্যায় পক্ষপাত ফুটে উঠেছে।

(الحوليات العربية السورية، ١٩٦٩ء) সম্ভবত এ নালা থেকে পানি নেওয়ার জায়গা নিয়েই দুই বাহিনীর কিছু সৈনিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল।

[৫৪১] সুরা হুজুরাত, আয়াত ৯

[৫৪২] তারিখে দিমাশক : ৯/১৩৭, ১৩৮, ইবনে আবি হাতিম কৃত 'আল জারহু ওয়াত তাদিল' গ্রন্থে এ বর্ণনার সনদ উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য : ৪/২১২

তন্মধ্যে কিছু বর্ণনায় হজরত আলি রা. কে এমন পাষাণ ও কঠোর সেনাপতিরূপে পেশ করা হয়েছে, মনে হয় তিনি প্রতিপক্ষকে কাফের মনে করতেন এবং যেকোনো মূল্যে যুদ্ধের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে কিছু বর্ণনায় হজরত মুয়াবিয়া রা. কে এমন স্বেচ্ছাচারীরূপে তুলে ধরা হয়েছে, মনে হয় তিনি মুনাফিক ছিলেন। মুসলমানের বেশ ধরে মুসলমানদের মধ্যে হানাহানি সৃষ্টি করাই ছিল তার কাজ।

সুতরাং এ ধরনের বর্ণনা অবশ্যই বর্জনীয়।[৫৪৩]

যুদ্ধের ময়দানে সন্ধির চেষ্টা

নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, জঙ্গে জামালের ন্যায় জঙ্গে সিফফিনের সময়ও উভয়পক্ষ থেকেই সন্ধির চেষ্টা হতে থাকে এবং সংলাপ ও পর্যালোচনা চলতে থাকে। এই মর্মে হাফেজ ইবনে কাসির রহ. ইবনে দিজিলের সনদে একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, সিফফিনের ময়দানে ইরাক ও শামের বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী কারি সাহাবিগণ একটি ভিন্ন তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন।[৫৪৪] তাদের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হজরত আবিদা সুলমানি, হজরত আলকামা বিন কায়েস, হজরত আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ, আমের বিন আবদে কায়েস প্রমুখ। এই কারি সাহেবগণ উভয়পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতার বিষয়টিকে নিজেদের দায়িত্ব ভেবে নিয়েছিলেন। সে মতে উভয়পক্ষের ভুল ধারণাগুলো দূর করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান।

এই মধ্যস্থতা চলাকালে হজরত মুয়াবিয়া রা. বলে পাঠান যে, আমি এসেছি হজরত উসমান রা. এর রক্তের বদলা নিতে।

---

[৫৪৩] এটা আবশ্যক নয় যে, প্রতিটি দুর্বল বর্ণনার প্রতিটি অংশ অবাস্তব হবে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পূর্বাপর ইঙ্গিত ও উপসর্গের ভিত্তিতে দুর্বল বর্ণনা গ্রহণ করার সুযোগ তো অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতার খাতিরে এজাতীয় দুর্বল বর্ণনাকে একেবারেই বর্জন করেছি।

[৫৪৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৫০৬, এই কারিগণ তারা নন, যারা পরবর্তীতে খারেজি হয়ে গেছিল। তাদের আলোচনা সামনে আসবে। বরং সন্ধিপ্রিয় এ কারিগণ ফকিহও ছিলেন, আবার খারেজিদের থেকে পৃথকও ছিলেন।

হজরত আলি উত্তরে বলেন, হজরত উসমানের রক্তে আমার কোনো অংশ নেই।

হজরত মুয়াবিয়া রা. বারবার বলতে থাকেন, হজরত আলি তার এই দাবির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য হজরত উসমানের হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে তুলে দিক।[৫৪৫]

অন্যদিকে হজরত আলি রা. বারবার আহ্বান করতে থাকেন যে, যেহেতু মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ আমার হাতে বাইয়াত হয়েছেন, সুতরাং শামবাসীদের জন্যও তাদের অনুসরণ করা উচিত।

হজরত মুয়াবিয়া উত্তরে বলেন, মুহাজির ও আনসার সাহাবি তো আমাদের সাথেও আছেন। তারা তো এখন পর্যন্ত হজরত আলির হাতে বাইয়াত হননি।

মোটকথা, কারি সাহেবদের মধ্যস্থতায় এভাবে দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকে।

কারী সাহেবগণ আরেকটি কাজও করেছিলেন। যখনই দুই পক্ষের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, তারা দুই পক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াতেন এবং দুই পক্ষকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরিয়ে দিতেন। যিলহজের শুরু থেকে সফর পর্যন্ত এভাবেই দুই বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান করে। এই দুই মাসে মোট ৮৫ বার লোকেরা হইচই ও হট্টগোল করে একে অন্যের দিকে ধেয়ে আসে। কিন্তু প্রতিবারই কারি সাহেবদের উক্ত দলটি মধ্যস্থতা করে দেয়, যাদের মধ্যে হজরত আলি রা. এর সাথিও ছিল, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথিও ছিল।[৫৪৬]

---

[৫৪৫] হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষ থেকে পেশকৃত উক্ত দাবি হজরত আলি রা. কেন পূর্ণ করলেন না, তার যুক্তিসঙ্গত কারণ পেছনের কয়েকটি শিরোনামে অতিবাহিত হয়েছে। যেমন, 'বিদ্রোহীদের থেকে কেন বাইয়াত গ্রহণ করলেন', 'হজরত উসমানের হত্যাকারীদের গ্রেফতারে কালবিলম্বের কারণ', 'বিচারিক কার্যক্রমে জটিলতা' এবং 'ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক জটিলতা'। তদুপরি সামনে 'সংশয় নিরসন' অধ্যায়ে 'হজরত আলি রা. এর খেলাফতকাল' শিরোনামের অধীনে এ সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে দেখা যেতে পারে।

[৫৪৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৫০৬, ৫০৭

যুদ্ধের সূচনা

সন্ধির এই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে ৩৭ হিজরির ৭ সফর মঙ্গলবার উভয়পক্ষের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধের সূচনা হয়।[৫৪৭] এখানেও হজরত আলি রা. তার সারিবদ্ধ সেনাদেরকে আদেশ করেছিলেন, তারা যেন আগে আক্রমণ না করে। তিনি প্রতিটি যুদ্ধের বিভীষিকা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সেনাবাহিনীর উদ্দেশে এই ভাষণ দিতেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ প্রতিপক্ষ আক্রমণ না করবে। মহান আল্লাহর শোকর যে, তোমরা সত্যের উপর আছ। তোমাদের সত্যের উপর থাকারই আরেক প্রমাণ হবে তোমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা না করা। যুদ্ধ করে যখন তোমরা তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেবে, তখন পলায়নপর কাউকে হত্যা করবে না। কোনো আহতের উপর আক্রমণ করবে না। কোনো নিহত ব্যক্তির মৃতদেহের অসম্মান করবে না। যদি তোমরা প্রতিপক্ষের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে যাও, তবে তাদের তাঁবু বিদীর্ণ করবে না। অনুমতি ব্যতীত তাতে প্রবেশ করবে না এবং তাদের সম্পদ থেকে সেগুলো ছাড়া কিছুই ধরবে না, যা তোমরা যুদ্ধের ময়দানে পাবে। নারীদেরকে কোনো ধরনের কষ্ট দেবে না, তারা তোমাদের অসম্মান করুক কিংবা তোমাদের নেতা ও নেক লোকদের গালমন্দ করুক। কেননা নারীরা দেহ ও মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে।'[৫৪৮]

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, উম্মাহর নেক ও সৎ এবং জ্ঞানী ও মর্যাদাবান একটি শ্রেণি জঙ্গে জামালের মতো সিফফিনেও পরিস্থিতির উন্নতি ও সংশোধনের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। আরো বোঝা যাচ্ছে যে, জঙ্গে জামালের ন্যায় এখানেও দাঙ্গাবাজদের পক্ষ থেকে হঠাৎ যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা ছিল। সম্ভবত এ কারণেই ত্রিশ হাজার কারির বিশাল বাহিনী দুই পক্ষের মধ্যখানে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান নিয়েছিল, যাতে কোথাও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

যেসব দুর্বল বর্ণনায় এ সময় নব্বুইটি খণ্ডযুদ্ধ হওয়ার এবং প্রতিদিন কুস্তি লড়াই হওয়ার কথা বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অতিরঞ্জিত। আমাদের ধারণায় প্রকৃত অবস্থা এতটুকুই ছিল, উক্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, কোথাও দাঙ্গা বা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হলে মধ্যস্থতা করে দেওয়া হয়েছে।

[৫৪৭] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯১

[৫৪৮] তারিখুত তাবারি : ৫/১০, ১১

قال : لا تقتلوا القوم حتى يبدؤكم فانتم بحمد الله عز وجل على حجة وترككم اياهم حتى يبدؤكم حجة اخرى لكم

সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী যুদ্ধ তিনদিন অব্যাহত ছিল।[৫৪৯] এই সময় উভয়পক্ষ পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে অবতরণ করতেন; এবং অত্যন্ত ভয়াবহ গতিতে তরবারি চলত।

হজরত আলি রা. এর বাহিনীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ

উভয়পক্ষেই সাহাবি ও তাবেয়ি ছিলেন; তবে হজরত আলি রা. এর বাহিনী এই দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল যে, তাতে কয়েকজন বদরি সাহাবিও ছিলেন।[৫৫০] ছিলেন বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিও।[৫৫১]

যদিও এ বর্ণনাটি অনেক দুর্বল, তবে সহিহ সনদে প্রমাণিত আছে যে, আমিরুল মুমিনিনের এ একই আদেশ জঙ্গে জামালেও ছিল। (শরহু মাআনিল আসার, হাদিস : ৫১১২ , কিতাবুস সিয়ার) হানাফি ফকিহদের প্রসিদ্ধ উক্তিও এটিই যে, বিদ্রোহীদের উপর আগে আক্রমণ করা হবে না। (হিদায়াহ, বাবুল বুগাত)

[৫৪৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯১

[৫৫০] **সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন প্রসিদ্ধ বদরি সাহাবি নাম :**

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. (তারিখুল ইসলাম, জাহাবি : ৫/৩৩০)
হজরত আবু সা'দ আস সায়িদি রা.
হজরত আবুল য়ুস্‌র্‌ কা'ব বিন আমর আনসারি রা.
হজরত রিফাআ বিন রাফে' আনসারি রা.
হজরত সাহ্‌ল বিন হুনাইফ রা.
হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা.
হজরত খাওয়াত বিন জুবাইর রা. (তারিখুল ইসলাম, জাহাবি : ৩/৫৪৫)
হজরত আবু ফাজালা আনসারি (আল ইসাবাহ : ৭/২৬৭, তারিখুল ইসলাম, ৩/৫৮৫)
হজরত উসাইদ বিন সা'লাবা আনসারি রা. (উসদুল গাবাহ : ১/২৪০)
হজরত সাবেত বিন উবাইদ রা. (উসদুল গাবাহ : ১/৪৪৮)
হজরত আবু উমরা আনসারি রা.
হজরত বাকির বিন আমর রা. এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। (তারিখুল ইসলাম, জাহাবি : ৩/৫৮৫, তাবাকাতে ইবনে সা'দ) রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন।

বদরি নন এমন কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহাবি নাম

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.
হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রা.
হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা.
হজরত হাসান রা.
হজরত হুসাইন রা.
হজরত খুযাইমাহ বিন সাবিত রা.

হজরত সুলাইমান বিন সুরাদ রা. (তারিখুত তাবারি : ১১/৫২৩)
হজরত সাহল বিন সা'দ রা.
হজরত কায়েস বিন সা'দ রা.
হজরত কারাযাহ বিন কা'ব রা.
হজরত জুনদুব বিন আবদুল্লাহ রা.
হজরত আবু কাতাদাহ আনসারি রা.
হজরত আদি বিন হাতিম রা.
হজরত আশআস বিন কায়েস রা. (তারিখুল ইসলাম, জাহাবি : ৩/৫৪৫)
হজরত আমর ইবনুল হামিক রা.
হজরত হুজর বিন আদি রা. (তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা : ১৯৪, ১৯৫)
হজরত আসওয়াদ বিন রাবিআহ রা. (আল ইসাবাহ : ৭/২২৮)
হজরত আবু ওয়াকিদ লাইসি রা. (আত তারিখুল আওসাত : ১/৯৭)
হজরত বাকির বিন উকবা রা.
হজরত আবু মাসউদ আনসারি রা. (আল ইসতিআব : ১/১৭৭)
হজরত জাবালা বিন আমর আনসারি রা. (তারিখুল ইসলাম, জাহাবি : ৪/২৮)
হজরত রবিয়া বিন কায়েস রা. (তারিখে ইবনে ইউনুছ : ১/১৭৪)
হজরত যায়েদ বিন আরকাম রা. (আল ইসাবাহ : ২/৪৮৮)
হজরত আবদুর রহমান আবযা রা. (তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা : ১৯৬)
হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি তালহা রা.
হজরত আনাস বিন মালিক রা. এর বৈপিতৃয় ভাই (তাহযিবুল আসমা' ওয়াল লুগাত : ১/২৭৩)
হজরত ফাকাহ বিন সা'দ আনসারি রা. আবু উকবা (আল ইসাবাহ : ৫/২৬৮)
হজরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল বিন উরকা রা. সিফফিনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। (তাকরিবুত তাহযিব, তরজামা : ৩২২৫)
হজরত সা'দ বিন হারেস বিন সামতা রা. এ যুদ্ধেই শহিদ হন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/৫০৮)
হজরত মিসতাহ বিন উসাসা রা. এ যুদ্ধে শহিদ হন। (তাহযিবুল আসমা' ওয়াল লুগাত : ২/৮৯)

[৫৫১] হজরত আলি রা. এর বাহিনীতে বাইয়াতে রিদওয়ানে ধন্য হওয়া সাহাবিদের উপস্থিতির বিষয়টি নিম্ন বর্ণিত বর্ণনাগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় :

عن عبد الرحمن بن ابزى رضـ قال : شهدنا مع على ثمانية مائة ممن بايع بيعة الرضوان قتل منا ثلاثة وستون، منهم عمار بن ياسر

আমরা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী ৮০০ লোক হজরত আলি রা. এর সঙ্গে সিফফিনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমাদের থেকে ৬৩ জনকে হত্যা করা হয়েছিল, যাদের অন্যতম ছিলেন হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. (তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা : ১৯৬)

উক্ত বর্ণনার সনদ

উক্ত বর্ণনাটির সনদ এই : আবদুস সালাম বিন হারব, ইয়াজিদ বিন আবদুর রহমান, (আবু খালেদ আদ-দালানি) জাফর ইবনে আবিল মুগিরা, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান, আবদুর রহমান বিন আবযা।
এদের মধ্যে আবদুস সালাম বিন হারব বুখারি ও মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবি। ইয়াজিদ বিন আবদুর রহমান সত্যবাদী, জাফর বিন আবিল মুগিরা সত্যবাদী এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য। আর সর্বশেষ ব্যক্তি হজরত আবদুর রহমান বিন আবযা রা. তো একজন সাহাবি। সুতরাং সনদটি অবিচ্ছিন্ন এবং সহিহ।
তবে ভিন্ন একটি বর্ণনা উক্ত বর্ণনাটির সাথে সাংঘর্ষিক, যেটিতে ইমাম ইবনে সিরিন রহ. বলেন,

هاجت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضر فيها مائة بل لم يبلغوا ثلاثين

অর্থাৎ যখন ফেতনা দেখা দিল, তখন আল্লাহর নবীর ১০ হাজার সাহাবি জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাদের থেকে ১০০ জনও সে ফেতনায় জড়িত হননি। বরং জড়িতদের সংখ্যা ত্রিশও হবে না। (আস সুন্নাতু লিল খাল্লাল, হাদিস : ৭২৮)
এ বর্ণনাটিকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আসাহহুল আসানিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু তার এ দাবিটি প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা ইমাম সিরিন রহ. জঙ্গে সিফফিনের সময় উপস্থিত ছিলেন না। যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দ রহ. সহিহ ও মুত্তাসিল সনদে তারই ভাই আনাস বিন সিরিন থেকে। তিনি বলেন, মুহাম্মদ বিন সিরিন জন্মগ্রহণ করেছেন ৩৩ হিজরিতে। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৯৩ এর অর্থ সিফফিন যুদ্ধের সময় ইবনে সিরিন রহ. এর বয়স ছিল মাত্র চার বছর। সুতরাং এ যুদ্ধ সম্পর্কে তার বর্ণনাটি সনদসূত্রে মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত বর্ণনার রাবি হজরত ইবনে আবযা রা. সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর চোখে দেখা কথা নিঃসন্দেহে কানে শোনা কথার উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে।
কেউ কেউ বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী ৮০০ সাহাবি সিফফিনের যুদ্ধে শরিক হওয়ার বিষয়টি আপত্তিকর বলেছেন এ কারণে যে, এদের প্রত্যেকের জীবনী আলাদাভাবে সংকলিত আছে। কিন্তু সেখানে যাদের জীবনীতে আছে যে, তারা সিফফিনের যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা এত অধিক নয়। সুতরাং এখানে এ সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে যে, হজরত ইবনে আবযা রা. এর বর্ণনাটির কোনো রাবি হয়তো সংখ্যায় ভুল করেছেন। আর ঐ বর্ণনার সনদে ইয়াজিদ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. মন্তব্য করেছেন যে, صدوق يخطئ كثيرا অর্থাৎ তিনি সত্যবাদী, তবে প্রায়ই ভুল করেন। (তাকরিবুত তাহযিব, তরজামা : ৮০৭২)
কিন্তু এ আপত্তিকে যদি গুরুত্ব দেওয়ার হয়, তবু এতটুকু তো স্বীকৃত যে, হজরত আলি রা. এর সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক সাহাবি ছিলেন, যাদের মধ্যে বদরি ও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরাও ছিলেন। পক্ষান্তরে শামের বাহিনীতে সাহাবি ছিলেন বটে; তবে মান ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই তারা ছিলেন কম।

হজরত আলি রা. এর বাহিনীতে সৈনিক সারির বিন্যাস এভাবে ছিল যে, ঝান্ডা ছিল হজরত হাশেম বিন উতবা রহ. এর হাতে। ডান পার্শ্ব ছিল হজরত আশআস বিন কায়েস রা. এর নেতৃত্বে এবং বাম পার্শ্ব ছিল হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.র নেতৃত্বে।[৫৫২] অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ছিলেন হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এবং পদাতিক বাহিনীর আমির ছিলেন হজরত সুলাইমান বিন সুরাদ রা.।

হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রা. কুরাইশের আমির ছিলেন। হজরত আমর ইবনুল হামিক, হজরত আদি বিন হাতিম, হজরত হুজর বিন আদি এবং জারিয়া বিন কুদামা রা. হজরত রিফাআ বিন শাদ্দাদ, হজরত

যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, সাহাবিদের উপস্থিতি হজরত আলির দলেই বেশি ছিল। তবে তাবেয়িদের উপস্থিতি উভয় বাহিনীতেই ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হজরত আলি রা. এর বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী কতিপয় তাবেয়ির নাম

হজরত আহনাফ বিন কায়েস রহ.
হজরত রিফাআ বিন শাদ্দাদ রহ.
হজরত হারেস বিন মুররা রহ.
হজরত সা'সাআ বিন সুহান রহ.
হজরত হুসাইন বিন মুনযির রহ. (তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা : ১৯৪, ১৯৫)
হজরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী রহ. (আস সিকাত লিবনি হিব্বান : ৪/৪০০)
হজরত রবিয়া বিন কায়েস (আল ইসাবাহ : ২/৩৯৪)
হজরত সুওয়াইদ বিন গাফালা (ইবনে সা'দ : ৬/৬৮)
হজরত আবদুর রহমনা বিন খারাশ আল আনসারি (আল ইসাবাহ : ৪/২৫৪)
হজরত আবদুর রহমান বিন আবি উমরা রহ. (ইবনে সা'দ : ৫/৮৩)
হজরত আলি রা. শাগরিদ ও ইমাম আসেম কুফির উসতাদ শাইখুল কুর্রা আবদুল্লাহ বিন হাবিব
হজরত আবু আবদুর রহমান সুলামি (তারিখে তাবারি : ৫/৪০)
হজরত আবদুল্লাহ বিন যুরাইর গাফেকি (ইবনে সা'দ : ৭/৫১০)
হজরত আমর বিন শুরাহবিল রহ.
হজরত আবু মাইসারা কুফি রহ. (তারিখে ইবনে আবি খাইসামাহ, আস সাফারুস সালিস : ৩/১৭২)
হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া, (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/৯৩)
হজরত মুসাইব ইবনে নাজবা রহ. (তাবারি : ১১/৬৬৫, ফিয যাইলিল মুযিল)
হজরত হাশেম বিন উকবা এ যুদ্ধেই শাহাদাত বরণ করেন। (তারিখে দিমাশক : ৭৩/৩৩৭)

[৫৫২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৩

হারেস বিন মুররা, হজরত আহনাফ বিন কায়েস এবং সা'সাআ বিন সুহান রহ. প্রমুখও বিভিন্ন গোত্রের নেতৃত্বে ছিলেন।[৫৫৩]

এ ছাড়া আশতার নাখায়ির হাতে ছিল মাজহিজ গোত্রের পরিচালনার ভার।[৫৫৪]

শামের বাহিনীর নেতৃত্ব

অন্যদিকে শামের বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন হজরত আবদুর রহমান বিন খালেদ রা.। অশ্বারোহী বাহিনীর আমির ছিলেন উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা.। ডান দিকের বাহিনীর আমির ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. এবং বাম দিকের বাহিনীর আমির ছিলেন হাবিব বিন মাসলামা রা.। এ ছাড়া আবুল আওয়ার সুলামি, যুলকালা হিময়ারি, মাসলামা বিন মুখাল্লিদ, বুসর বিন আরতাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখও ভিন্ন ভিন্ন দলের আমির ছিলেন।[৫৫৫]

---

[৫৫৩] তারিখে খলিফা পৃষ্ঠা : ১৯৪, ১৯৫ সনদ সহিহ।

[৫৫৪] তারিখে খলিফা পৃষ্ঠা : ১৯৫

[৫৫৫] তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা : ১৯৫, ১৯৬, সনদ হাসান।

শামের বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী কতিপয় সাহাবির নাম

হজরত আমর বিন হাযাম রা. (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৭৭৭৮)
হজরত উকবা বিন আমের জুহানি রা. (আল ইসাবাহ : ৪/৪২৯)
হজরত আমর ইবনুল আস রা. (উসদুল গাবাহ : ৪/২৩২)
হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. (উসদুল গাবাহ : ৩/৩৪৫)
হজরত মাসলামা বিন মুখাল্লাদ রা. (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৪২৪)
হজরত আবদুর রহমান খালেদ রা.
হজরত হাবিব বিন মাসলামা রা.
হজরত বুসর বিন আরতাআত রা.
হজরত আবুল আওয়ার আসলামি রা. (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৫, ১৯৬)
হজরত উবাইদুল্লাহ বিন উমর ইবুল খাত্তাব রা. এ যুদ্ধেই শাহাদাত বরণ করেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৫৮, আল ইসাবাহ : ৫/৪১, ৪২)
হজরত উবাদা বিন আওফা রা. (মুখতাসারু তারীখি দিমাশক : ১১/৩০১)
হজরত আবু গাদিয়া জুহানি রা. (মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ২২/৩৬৩)
হজরত হামল বিন সা'দানা রা. (আল ইসাবাহ : ২/১০৮)
হজরত যুল কালা' হিমইয়ারি রা. (আল ইসাবাহ : ২/৩৫৬)
হজরত যামাল বিন আমর রা. (আল ইসাবাহ : ২/৪৬৯)

হজরত শুরাহবিল বিন সামত রা. (আল ইসাবাহ : ৩/২৬৬)
হজরত আমর বিন সাবি' রা. (আল ইসাবাহ : ৪/৫২২)
হজরত ইয়াজিদ বিন আসাদ রা. (আল ইসাবাহ : ৬/৫০৬)
হজরত হাওশাব যি জুলাইম হিমইয়ারি রা. (আল ইসতিআব : ১/৪১০)
হজরত মুয়াবিয়া রা. বলতেন,

لقد شهد معی صفین عدة من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم

সিফফিনের যুদ্ধে আল্লাহর নবীর কয়েকজন সাহাবি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। (আল আহাদ ওয়াল মাছানী, হাদিস : ৫০০)

শামের বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী কতিপয় তাবেয়ির নাম

হজরত আবদুর রহমান আল ফাইসি রহ.
হজরত হাবিস বিন সা'দ তায়ি রহ.
হজরত তারিফ বিন হাস্‌সাস রহ.
হজরত হাস্‌সান বিন বাহদাল রহ.
হজরত আব্বাদ বিন ইয়াজিদ রহ.
হজরত ইবনে হাওয়া সাকসাকি রহ.
হজরত ইয়াজিদ বিন জুবাইর রহ.
হজরত হুবাইশ বিন দুলজা রহ.
হজরত শারিক কিনানি রহ.
হজরত মাখারিক বিন হারিস রহ.
হজরত হামযা বিন মালিক রহ.
হজরত ইয়াজিদ বিন আবি নুমাইস রহ. (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৫, ১৯৬)
হজরত যফর বিন হারেস রহ.
হজরত হারেস বিন আবাদাহ আল আযদি রহ. (আল ইসাবাহ, ২/১৩৫)
হজরত মিলহান বিন যুন্নার রহ. (আল ইসাবাহ, ৬/২৪৫)
হজরত কুরাইব বিন সাবাহ রহ. ইনি হজরত আলি রা. এর সঙ্গে লড়াই করার সময় নিহত হন। (আল ইসাবাহ, ৫/২৭৯)

রাফেজিরা হজরত আবু হুরাইরা রা.র নিন্দা করার জন্য তাদের কিতাবে একটা মনগড়া কাহিনি উল্লেখ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, হজরত আবু হুরাইরা রা. এত লোভী ছিলেন যে, সিফফিনের যুদ্ধের সময় নামাজ পড়ত হজরত আলির পেছনে, কিন্তু খাবার খেত হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দস্তরখানে।

অথচ এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট। হজরত আবু হুরাইরা রা. এ যুদ্ধে উপস্থিতই ছিলেন না। (আয যাওউল লামিউল মুবিন : পৃষ্ঠা : ১৩১)

এমনিভাবে রাফেজিরা হজরত উকাইল বিন আবি তালিব রা. এর নিন্দা করে এ কাহিনি বানিয়েছে যে, সিফফিনের যুদ্ধে তিনি ছিলেন শামবাসীর পক্ষে।

অথচ রাফেজিদের কিতাব ছাড়া কোনো প্রাচীন কিতাবে এ কাহিনির উল্লেখ নেই। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের রচনাসম্ভার থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে,

যুদ্ধের চিত্রপট

সিফফিনের যুদ্ধে যখন রীতিমতো লড়াই শুরু হয়, তখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়ায়। কিন্তু প্রথম সারির যোদ্ধারা যখন পরস্পর মুখোমুখি হতো, তখন দু'দিক থেকে বর্শা এসে একটির মধ্যে অপরটি গেঁথে যেত। বর্শা এত অধিক পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হতো যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়াও সম্ভব ছিল।[৫৫৬] হজরত আলি রা. নিজে কয়েকবার যুদ্ধের ময়দানে আগমন করেন এবং তার প্রসিদ্ধ তরবারি 'যুলফিকার' এত ক্ষিপ্রতার সাথে চালনা করেন যে, তার ধারালো অংশ মুড়িয়ে যায়।[৫৫৭]

যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা এই ছিল যে, সৈন্যদের আধিক্যের কারণে উভয় বাহিনীর সারির শেষপ্রান্ত দেখা যাচ্ছিল না। উভয় দিক থেকে একসাথে তাকবিরধ্বনি উচ্চারিত হতো এবং কালিমা তাইয়েবার ধ্বনি উঠত। আর তাতে ইথার-পাথার প্রকম্পিত হয়ে উঠত।[৫৫৮]

উভয়পক্ষের বীর সেনানিদের মধ্যে ছিলেন প্রচুর পরিমাণে সাহাবি ও সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু কোনো জাগতিক স্বার্থে নয়; বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত অর্জন এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তারা লড়াই করছিলেন। হজরত আলি রা. এর বাহিনীতে পদাতিক দলে হজরত ওয়ায়েস কারনিও ছিলেন। এ যুদ্ধেই একপর্যায়ে হামলা করতে গিয়ে তিনি শহিদ হয়ে যান। আল্লাহর নবী তাকে তথা তাবেয়িদের সরদার উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।[৫৫৯]

এমনিভাবে তাদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর ফিকহি উত্তরাধিকারের আস্থা হজরত আলকামা বিন কায়েস রহ.। তারই স্থলাভিষিক্ত হজরত ইবরাহিম নাখায়ি বলেন, আমাদের উসতাদ

হজরত উকাইল একবার দামেশকে গিয়েছিলেন। তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে অনেক আদর-আপ্যায়ন করেন। কিন্তু হজরত উকাইল রা. সেখানেও হজরত আলি রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১০০)

[৫৫৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৪৯,

[৫৫৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৭৮, সনদ সহিহ

[৫৫৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৮১ আবুল আলিয়াহ থেকে বর্ণিত।

[৫৫৯] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৭২৮ ইমাম জাহাবি এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

সিফফিনের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ণ শক্তি দিয়ে তরবারি চালনা করেন।[৫৬০]

সিফফিনের যুদ্ধটি হয়েছিল জুন মাসে; কিন্তু ইরাকি বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী বদরি সাহাবি হজরত আবু আমরা আনসারি রা. তখনও নফল রোজা রেখেছিলেন। একদিন প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে খাদেমকে বললেন, আমার উপর পানি ছিঁটিয়ে দাও।

তারপর তিনি মাত্র তিনটি তির নিক্ষেপ করেন; কিন্তু দুর্বলতার কারণে তা বেশি দূর যায়নি। তারপর তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তির চালনা করবে, তা লক্ষ্য ভেদ করুক বা না করুক, সেই তিরের বদলায় কেয়ামতের দিন তাকে একটি আলো দান করা হবে। তারপর সেদিনই হজরত আবু আমরা আনসারি রা. শহিদ হয়ে যান।[৫৬১]

সতর্কতাবশত যারা সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি

কেউ কেউ ঠিক লড়াইয়ের মুহূর্তে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। ফলে তারা কোনো মুসলমানের রক্তে হাত রঞ্জিত করা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধের ময়দান থেকে বেরিয়ে আসেন।[৫৬২]

---

[৫৬০] বর্ণিত আছে-

رجع علقمة يوم صفين وخضب سيفه مع علي. (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٨٦٩و ٣٧٨٧٠ ط الرشد) اسناده متصل صحيح. الرواة : عبد الله بن نمير، اعمش، مسلم البطين (مسلم بن عمران) وابو البختري، وهذه الرواة كلهم ثقات.

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, যুদ্ধ তো যুদ্ধই ছিল। আর তা ফুল দিয়ে নয়, বরং তরবারি দিয়েই হয়। সুতরাং উল্লিখিত কিছু বিবরণ দুর্বল সনদে বর্ণিত হলেও শরিয়ত বা যুক্তির আলোকে তাতে অসম্ভবের কিছু নেই।

[৫৬১] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ২২/৩৮১, মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৬৮৯

[৫৬২] আবুল আলিয়াহ বলেন-

لما كان زمن علي ومعاوية وانى لشاب، القتال احب الى من الطعام الطيب، فتجهزت بجهاز حسن، حتى اتيتهم، فاذا صفان لا يرى طرفا هما، اذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء، واذا تهلل هؤلاء هلل هؤلاء، فراجعت نفسي، فقلت اى الفريقين انزله كافرا واى الفريقين انزله مؤمنا، او من اكرهني على هذا، فما امسيت حتى رجعت وتركتهم. (طبقات ابن سعد : ٨١/٧، سير اعلام النبلاء : ٢٠٩/٤)

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. এর অবস্থা এই ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তিনি প্রতিপক্ষের উপর অস্ত্র তুলতে গিয়ে কাঁপতে থাকেন।[৫৬৩] মূলত তিনি এ অঙ্গীকার নিয়ে সিফফিনের ময়দানে এসেছিলেন যে, সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না। তার পিতা হজরত আমর ইবনুল আস রা. বহু পীড়াপীড়ির পর তাকে ময়দানে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৬৪] যুদ্ধের পর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. প্রকাশ্যে বলতেন, সিফফিনের সাথে আমার কী সম্পর্ক? মুসলমানদের সাথে লড়াই করার আমার কী প্রয়োজন? এর চেয়ে তো দশ বছর আগে যদি মরে যেতাম, তা-ই ভালো হতো![৫৬৫]

মোটকথা, অনেকেই সেখানে উপস্থিত থেকেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করছিলেন।[৫৬৬]

তারপরও সিংহভাগই ময়দানে জমে রইলেন এবং যুদ্ধও চলতে থাকল।

দুই বাহিনীতে মানবতাবোধ ও বিশ্বস্ততার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত

সিফফিনের যুদ্ধ ইতিহাসে এই দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের যুদ্ধ ছিল যে, যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতেও উভয় পক্ষ থেকে উন্নত চরিত্র, মানবতাবোধ, ভদ্রতা এবং উদারতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত

---

[৫৬৩] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/২৬৬, ২৬৭

[৫৬৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৫৩৮

[৫৬৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/২৬৬, ২৬৭,

[৫৬৬] আবু মিখানফের বর্ণনা মতে হজরত আলি রা. এর বড় পুত্র হজরত হাসানও বাহিনীতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কার্যত যুদ্ধে অংশ নেননি। (তাবারি : ৫/১৯)
আবু মিখনাফেরই আরেক বর্ণনামতে একবার হজরত আলি রা. এর সন্তান মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার মোকাবেলায় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষ থেকে হজরত উমর রা. এর পুত্র উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. এসে দাঁড়ালেন। হজরত আলি রা. তাদের দুজনকে মুখোমুখি তরবারি হাঁকাতে দেখে তার বাহনজন্তুকে পদাঘাত করে মুহূর্তে নিজ পুত্রের কাছে পৌঁছে যান। তারপর তাকে সরিয়ে দিয়ে উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. কে বলেন, 'লড়াই যদি করতেই হয়, আমার সঙ্গে করো, আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়ালাম'।
উত্তরে তিনি বললেন, 'আপনার সাথে যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না'। এই বলে তিনিও সরে যান। (তারিখুত তাবারি : ৫/১২, ১৩)

প্রকাশ পাচ্ছিল। দাঙ্গাবাজ সাবায়ি ও উগ্র মানসিকতার একটি দল ছাড়া অধিকাংশই ছিল পূর্ণ ঈমানের অধিকারী। আসলে এটা বনু উমাইয়া ও বনু হাশিমের গোত্রীয় কোনো যুদ্ধ ছিল না; বরং ছিল ন্যায়-নীতির লড়াই। দুনিয়ার ইতিহাসে নিজ দেশের মাটিতে সংঘটিত নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের এটিই ছিল প্রথম দৃষ্টান্ত, যাতে সমর-আইনের পূর্ণ অনুসরণ এবং প্রতিপক্ষের সাথে ভদ্রোচিত আচরণের একটি মানদণ্ড দাঁড় করানো হয়েছিল। আর কেনই-বা এমনটি হবে না, যখন উভয় পক্ষের নেতৃত্ব ছিল নামি-দামি সাহাবিদের হাতে, যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর রাসুলের অনুসরণ। তাই তরবারি খাপবদ্ধ করার সাথে সাথেই তারা হয়ে যেতেন একে অপরের ভাই। একই স্থান থেকে তারা পানি সংগ্রহ করতেন। মতভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কেউ কাউকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতেন না। কেউ অন্যের কোনো জিনিস পেলে আমানত মনে করে তা সংরক্ষণ করতেন এবং মালিকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করতেন।[৫৬৭]

হজরত আলি রা. এর অবস্থা এই ছিল যে, যুদ্ধের হাঙ্গামা সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের প্রতি পূর্ণ লক্ষ রাখতেন। এমনকি রাতে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার তাসবিহ পড়ার যে আমল ছিল, তাও হাতছাড়া হতে দেননি।[৫৬৮]

জঙ্গে জামালের ন্যায় এখানেও কোনো পক্ষ কোনো আহত ব্যক্তির প্রাণ হরণের চেষ্টা করেনি, কোনো পলায়নপরের উপর আক্রমণ করেনি এবং কোনো লাশ থেকে অস্ত্র ও রসদ হাতিয়ে নেয়নি।[৫৬৯]

হজরত আলি রা. এর দয়ার্দ্রতা

হজরত আলি রা. এর কাছে শামের কোনো সৈন্য গ্রেফতার করে আনলে তিনি বলতেন, 'আমি কখনোই তোমাকে হত্যা করব না। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে ভয় করি'।

---

[৫৬৭] তারিখুত তাবারি : ৪/৫৭১, এটা আবু মিখনাফের সাক্ষ্য

[৫৬৮] শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি : ২/১২০

[৫৬৯] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ২৬৬০

তারপর তার থেকে এই অঙ্গীকার নিয়ে ছেড়ে দিতেন যে, আর কখনো হজরত আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে না। শেষে চার দিরহাম দিয়ে বিদায় করতেন।[৫৭০]

যুদ্ধের বিভীষিকা চলমান থাকা সত্ত্বেও হজরত আলি রা. এর হৃদয়ের কোমলতার অবস্থা এই ছিল যে, কেউ তার সম্মুখে চিৎকার করে বলল, 'এলাহী, শামবাসীর উপর অভিশাপ নাজিল করুন'।

হজরত আলি রা. তৎক্ষণাৎ নিষেধ করে বললেন, 'শামবাসীকে মন্দ বল না। তাদের মধ্যে আবদাল (আল্লাহর অলি) আছেন'।[৫৭১]

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মত অনুযায়ী হজরত আলি রা. কে একদিন রাতের নির্জনতায় দেখা গেল শামবাসীর ছাউনির দিকে তাকিয়ে দেখছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন,

اللهم اغفرلى ولهم

হে আল্লাহ, আমাকেও ক্ষমা করুন, তাদেরও ক্ষমা করুন।[৫৭২]

যুদ্ধ চলাকালে যখন পানাহার, বিশ্রাম, শহিদদের জানাজা, দাফন ইত্যাদি কাজের জন্য বিরতি দেওয়া হতো, তখন উভয় পক্ষের লোক একে অপরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং নিঃসঙ্কোচে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন।[৫৭৩]

উভয় দিকে নামাজের প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। উভয় বাহিনীর শিবির থেকে আজানের সুমধুর ধ্বনি গুঞ্জরিত হতো। তারপর ইকামত দিয়ে পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে নামাজ আদায় করা হতো।[৫৭৪]

---

[৫৭০] মুসানান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৫৯, ৩৭৮৬১,

[৫৭১] ইতহাফুল খিয়ারাহ : ৭/৩৫৬, , মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক মাআ জামিয়ী মা'মার বিন রাশিদ, হাদিস : ২০৪৫৫,

[৫৭২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৬৫,

[৫৭৩] মাজমাউয যাওয়ায়েদ লি নুরিদ্দীন আল হাইসামি, হাদিস : ১২০৪৮

[৫৭৪] বর্ণিত আছে-

فحضرت الصلوة فاذنا واذنوا، واقمنا فاقاموا، فصلينا وصلوا، (سنن سعيد بن منصور : ٣٩٧/٢ ط دار السفلية)

হজরত আলি রা. এর সৈন্যরা দ্বিধাহীনচিত্তে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সেনাপতিদের পেছনে নামাজ আদায় করতেন। হজরত আলি রা. এর জন্য উন্মুক্ত অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন।[৫৭৫] হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. শহিদ হলে উভয় বাহিনী তার জানাজা পড়ে।[৫৭৬]

মোটকথা, সিফফিনের যুদ্ধ ছিল ভদ্রতা, উন্নত চরিত্র এবং কালিমা-বলা মানুষের অসাধারণ মর্যাদা প্রদর্শনের এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত; অথচ যারা মানবাধিকারের অন্তঃসারশূন্য স্লোগান তুলে গলা ফাটায়, মানবতার সম্মান রক্ষার নামে সারা পৃথিবীতে যারা ঢোল পিটিয়ে বেড়ায়, সেই পশ্চিমা দুনিয়া আজ পর্যন্ত এমন কোনো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি।

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর শাহাদাত

যুদ্ধের তৃতীয়দিন ঘটে হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন ইরাকি বাহিনীর বিশিষ্ট ব্যক্তি। সর্বপ্রথম যে ক'জন সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন, হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. ছিলেন তাদেরই একজন। শাহাদাতের সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।[৫৭৭] তাই শারীরিকভাবে তিনি তখন বেশ দুর্বল ছিলেন।

সে সময় হজরত উসমান রা. এর কিসাস সম্পর্কে চলমান বিতর্কে হজরত আম্মার রা. এর অন্তরে স্বীয় অবস্থানের ত্রুটিহীনতার ব্যাপারে এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম, শামের লোকেরা যদি আমাদের মারতে মারতে হিজর পর্বতের চূড়ায়ও ঠেলে নিয়ে যায়, তবু আমার অবস্থানের সত্যতা ও প্রতিপক্ষের ভ্রান্তির বিষয়ে আমার বিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন আসবে না।[৫৭৮] কিন্তু নিজের এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে তিনি মুসলমানই মনে করতেন। তাই কেউ যখন বলল, 'শামবাসী তো কাফের হয়ে গেছে', হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. তার কথা খণ্ডন করে বললেন, 'আমাদের এবং শামবাসীর রাসুল

---

[৫৭৫] বুগয়াতুত তলাব ফী তারীখি হালব লি কামালিদ্দীন ইবনুল আদিম : ১/৩০২,

[৫৭৬] তারিখে দিমাশক : ১০/৩৬০,

[৫৭৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/৪২৬,

[৫৭৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৪০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস : ১৫৬০১

একজনই, কেবলাও একটিই, কিন্তু তারা ফেতনার শিকার হয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ফিরে না আসবে, আমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়া আবশ্যক।[৫৭৯]

ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত কী হতে পারে যে, যুদ্ধের ময়দানেও তিনি তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে ইনসাফের কথা বলতেন।

যুদ্ধের তৃতীয়দিন সন্ধ্যায় হজরত আম্মার রা. ইফতারের জন্য দুধ চেয়ে আনেন এবং বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, তুমি দুনিয়া থেকে সর্বশেষ যা পান করবে, তা হবে এক ঢোক দুধ।

ইফতার করে তিনি যুদ্ধে শরিক হন এবং শাহাদাত বরণ করেন।[৫৮০]

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর হত্যাকারী কে?

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে শহিদ করেছিল শামের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, যার নাম ছিল আবু গাদিয়া আল জুহানি।[৫৮১]

---

[৫৭৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৪১, মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি, হাদিস : ৬৭৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৮৮৮৪, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৭০৮০

[৫৮০] আল আহাদ ওয়াল মাসানি লিবনি আসিম, হাদিস : ২৭২, মুসনাদে আহমাদ বিন হামবল, হাদিস : ১৯৩৯৩, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/২৫৭,

[৫৮১] এটি সহিহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। আবু গাদিয়া (কেউ বলেছেন, আবুল গাদিয়াহ) এর নিজের বক্তব্য হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كنا نعد عمار بن ياسر من خيارنا، قال : فلما كان يوم صفين، أقبل يمشى اول الكنيبة راجلا، حتى اذا كان من الصفين طعن رجل فى ركبته فانكفأ المغفر فضربته فاذا هو رأس عمار

আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করতাম। তারপর যখন সিফফিনের দিন এলো, তিনি প্রথম বাহিনীতে পদব্রজে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকলেন। যখন দুই দিকের সারির মাঝে এসে পড়লেন, এক ব্যক্তি তার হাঁটুতে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। ফলে তার শিরস্ত্রাণ খুলে মাটিতে পড়ে গেল। তখন আমি তরবারি দ্বারা আঘাত করলাম। পরক্ষণেই তাকিয়ে দেখি, সেটি হজরত আম্মারের মাথা। (আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ২২/৩৬৩, এর রাবিগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। আরো দ্রষ্টব্য : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস : ৮২২২, ইমাম হাইসামি বলেন, এর রাবিগণ সহিহ হাদিসের রাবি। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৫৬৫৮, এর রাবিগণ নির্ভরযোগ্য।)

হজরত আম্মার রা.কে হত্যার দায় যদি কোনোক্রমে সাবায়িদের দিকে ঠেলে দেওয়ার সামান্য সুযোগও থাকত, তাহলে আমরা কখনোই তা হাতছাড়া করতাম না। কিন্তু সহিহ সনদে আবু গাদিয়ার নিজ মুখের স্বীকারোক্তি বর্ণিত আছে। তদুপরি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উভয়ই একমত যে, আবু গাদিয়াই হত্যা করেছিল। ইমাম মুসলিম রহ. বলেন,

ابو الغادية يسار بن سبيع، قاتل عمار، له صحبة.

আবুল গাদিয়া ইয়াসার ইবনে সাবি হজরত আম্মারকে হত্যা করেছে। তিনি সাহাবি ছিলেন। -আল কুনা ওয়াল আসমা : ২/২৬৯

ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেন, আবুল গাদিয়া যখন শামের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত, তখন দারোয়ানের কাছে নিজের পরিচয় দিত এভাবে-

قاتل عمار بالباب

হজরত আম্মারের হত্যাকারী আপনার দরজায় অপেক্ষমাণ। -আত তারিখুল আওসাত: হাদিস : ৭২৮

ইমাম দারাকুতনি রহ. বলেন, আবুল গাদিয়া ইয়াসার ইবনে সাবি, তিনি সাহাবি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তিনিই সিফফিনের যুদ্ধে হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে হত্যা করেছিলেন। (সুওয়ালাতুস সুলামি-দারাকুতনি : ৪৩১, আল মু'তালাফ ওয়াল মুখতালাফ : ৪/১৭৯৩)

সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের মত এটাই। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, আল্লামা ইবনে আবদুল বার, ইবনুল আসির জাযারি এবং হাফেজ জাহাবি রহ. এটাই লিখেছেন। (আল ইসাবাহ : ৭/২৫৮ আল ইসতিআব : ৪/১৭২৫, উসদুল গাবাহ : ৬/২৩১, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৫৪৪,)

ঠিক একারণেই ইমাম বুখারি রহ. এবং ইমাম নববি রহ. থেকে শুরু করে শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. পর্যন্ত সকলে শামবাসীকে হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর হত্যাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই সাথে এ সংক্রান্ত হাদিসে বর্ণিত- تقتلك الفئة الباغية - বাক্যের আলোকে হজরত আলি রা. এর ইজতিহাদ সঠিক হওয়া এবং শামবাসীর ইজতিহাদ ভুল হওয়ার আকিদা পোষণ করতেন। (দ্রষ্টব্য : শরহে মুসলিম- নববি : ১৮/৪০, কিতাবুল ফিতান ও আশরাতিস সাআহ, ফাতহুল বারি : ১৩/৮৫, কিতাবুল ফিতান, উমদাতুল কারি : ২৪/১৯২, মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল ফাজাইল, বাবুল মু'জিযাত, তাকরিরে বুখারি : শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. ২/১৬৬, ১৬৭)

وقال الشيخ المفتى محمد تقى العثمانى : وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اخبر ان عمارا رضـ سيموت مقتولا، ووقع كذلك، وانه تقتله فئة تبغى على امام حق، ومن المسلم تاريخيا انه قتل بصفين وهو من حزب على رضـ ، وهو من اوضح الدلائل على ان علينا رضـ كان هو المحق المصيب فى حروبه مع معاوية رضـ وان كان معاوية واصحابه رضى الله عنهم معذورين فى اجتهادهم (تكملة فتح الملهم شرح صحيح مسلم : ٦/٢٦٠)

এ কারণে শামের বাহিনীর সিপাহসালার হজরত আমর ইবনুল আস রা.-ও স্বীকার করতেন যে, হজরত আম্মার রা. কে আমাদের সৈনিকরাই হত্যা করেছে। ইমাম নাসায়ি রহ. সহিহ-সনদে বর্ণনা করেছেন, একবার আমর ইবনুল আস রা. বলতে লাগলেন, আমি বুঝি না যে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহর নবী আমৃত্যু ভালোবেছেন, তাকে আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

লোকেরা বলল, আমাদের ধারণা আল্লাহর নবী আপনাকে ভালোবাসতেন। সে কারণেই তিনি আপনাকে সেনাপতি হিসেবে নির্বাচন করতেন।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বললেন, আল্লাহই ভালো জানেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ভালোবাসতেন, না আমার মন রক্ষা করতেন। কিন্তু এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা জানতাম, আল্লাহর নবী অবশ্যই তাকে ভালোবাসতেন।

লোকেরা জানতে চাইল, তিনি কে?

আমর ইবনুল আস রা. বললেন, হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা.।

লোকেরা বলল, তাকে তো আপনারাই সিফফিনের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন?

তিনি বললেন, অবশ্যই, আল্লাহর কসম, আমরাই তাকে হত্যা করেছিলাম।[৫৮২]

হজরত আম্মার রা. সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল,

---

[৫৮২] সুনানে নাসায়ি আল কুবরা, হাদিস : ৮২১৬,

نصه : قالوا : فذاك قتيلكم يوم صفين، قال : قد، والله قتلناه (الرواة : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة، معاذ بن هشام الدستوائى، عبد الله بن عون بن ارطبان، حسن البصرى،

এরা সকলেই বুখারি ও মুসলিমের সর্বস্বীকৃত রাবি।

ঠিক এ বর্ণনাটিই ইবনে সা'দ দুটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন। পাঠ এই,

انا والله قتلناه ... والله لقد قتلناه.

-তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩/২৬৩

تقتله الفئة الباغية

তাকে হত্যা করবে একটা বিদ্রোহী দল।[৫৮৩]

এই হাদিসের কারণে তিনি শহিদ হওয়ার পর, হজরত আলির পক্ষের যারা এ যাবৎ যুদ্ধে শরিক হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তাদের মনে শামবাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আর কোনো দ্বিধা-সংকোচ থাকল না। ফলে ইরাকিদের দিক থেকে আক্রমণ ভীষণ জোরদার হয়ে ওঠে।

হজরত খুজাইমা বিন সাবিত রা. তরবারি কোষবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনিও আল্লাহর নবীর উক্ত হাদিস শুনেছিলেন। তাই বলেছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত হজরত আম্মার নিহত না হবেন, ততক্ষণ আমি লড়াই

---

[৫৮৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭৫০৬, কিতাবুল ফিতান, বাবু লা তাকুমুস সাআহ, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ৪১৭০, বাবু মানাকিবি আম্মার রা.

হজরত আম্মার রা. এর হত্যা সংক্রান্ত এ বর্ণনাটি সহিহ। উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা হজরত উসমান বিন আফফান, হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. হজরত আমর বিন হাযাম, হজরত আনাস বিন মালিক, হজরত আমর ইবনুল আস, হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আসসহ বিভিন্ন সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে। ইমামগণ এটিকে 'হাদিসে মুতাওয়াতির' তথা অবিচ্ছিন্ন সনদসূত্রে বর্ণিত হাদিস বলে গণ্য করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও এটিকে সহিহ বলেছেন। হাদিসটি প্রমাণিত এবং সহিহ, (মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৪১৮)

ইমাম নববি রহ. লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরাম সিফফিনের যুদ্ধে হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর পেছনে চলছিলেন। কেননা আলোচ্য হাদিসের কারণে সাহাবিদের বিশ্বাস ছিল, হজরত আম্মার নিশ্চয় সঠিক দলের সঙ্গে থাকবেন। (তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত লিল ইমামিন নববি : ২/৩৮)

ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. প্রথমে উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলতেন, الفئة الباغية শীর্ষক হাদিসের কোনো সহিহ সনদ নেই। (আস সুন্নাহ লিল খাল্লাল : ২/৪৬৩)

কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, فآخر الامرين منه تصحيحه অর্থাৎ ইমাম আহমাদের শেষমত ছিল, হাদিসটি সহিহ। (মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৪১৪)

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, হজরত আম্মারকে হত্যা করার আগ থেকেই হজরত আলি ও তার সঙ্গীগণ শামবাসীর বিদ্রোহী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। কেননা বিদ্রোহীদের শরয়ি সংজ্ঞা পূর্ণরূপে তাদের উপর প্রযোজ্য হচ্ছিল। (সন্দেহ হলে তো তারা বিদ্রোহীদের বিধান তথা শরয়ি যুদ্ধের আদেশ জারি করতেন না।)

তবে হজরত আম্মার রা. কে হত্যা করার কারণে যারা ভুল ধারণার শিকার ছিল, তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

করব না'। হজরত আম্মার রা. এর শাহাদাতের পর তিনিও যুদ্ধে শামিল হন এবং লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান।[৫৮৪]

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর হত্যা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বাহিনীর জন্য একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে যায়। ফলে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শামের বাহিনী ছেড়ে হজরত আলি রা. এর বাহিনীতে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে হজরত যাবিদ বিন আবদুল খাওলানি[৫৮৫] এবং হজরত উমর ফারুক রা. এর আজাদকৃত গোলাম হজরত হুনাই রহ. এর নাম উল্লেখযোগ্য।[৫৮৬]

হজরত আম্মার রা. এর শাহাদাতের খবর পেয়ে হজরত আমর বিন হাযাম রা. তৎক্ষণাৎ হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে অবগত করেন। হজরত আমর ইবনুল আস রা. বিচলিত হয়ে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে যান এবং হজরত আম্মার রা. এর শাহাদাতের সংবাদ দিয়ে الفئة الباغية শীর্ষক হাদিসটিও শুনিয়ে দেন।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদিস প্রমাণ করছিল যে, হজরত আলি রা. তার ইজতিহাদে সত্যের উপর আছেন এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. আছেন ভুলের মধ্যে।[৫৮৭] কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. এর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, আমরা এ হাদিসের লক্ষ্য হতে পারি না। আমরা তো হজরত উসমান রা. এর কিসাস গ্রহণের জন্য লড়াই করছি। হয়তো তার সম্মুখে সেই হাদিস ছিল, যাতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উসমান রা. সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, 'তার পদতল থেকে (তার মৃত্যুর পর) একটি ফেতনা প্রকাশ পাবে, আর তখন তার অনুসারীরাই হেদায়েতের উপর থাকবে।'[৫৮৮] তাই হজরত মুয়াবিয়া রা. প্রথমোক্ত

---

[৫৮৪] আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানি : ৪/৮৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২১৮৭৩, ২৩১৮৭, সনদ সহিহ লি গাইরিহি।

[৫৮৫] আল ইসাবাহ : ২/৫০২

[৫৮৬] তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/২৫৩

[৫৮৭] মুসনাদে আবি ই'লা, হাদিস : ৭১৭৫, সনদ সহিহ, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৭৭৭৮, সনদ সহিহ।

[৫৮৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৮০৬৮, সনদ সহিহ, ইবনে আবি আসেম কৃত 'আল আহাদ ওয়াল মাসানী', হাদিস : ১৩৮১

হাদিসের মূল মর্ম দৃষ্টির অগ্রাহ্য করে হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে বললেন,

او نحن قتلناه؟ انما قتله على واصحابه، جاؤا به حتى القوه بين رماحنا

হজরত আম্মারকে কি আমরা হত্যা করেছি? তাকে হত্যা করেছে আলি ও তার সঙ্গীরা। তারা তাকে এনে আমাদের বর্শার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।[৫৮৯]

স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর এ ব্যাখ্যা সঠিক ছিল না। তবে এর দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছিল যে, হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. নিহত হওয়ার কারণে তিনি এবং হজরত আমর ইবনুল আস রা. অত্যন্ত চিন্তিত ও অস্থির ছিলেন।[৫৯০]

---

[৫৮৯] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৭৭৭৮,

قال المحقق شعيب الارنؤوط : اسناده صحيح، واخرجه الحاكم فى المستدرك (ح : ٢٦٦٣) بلفظه.

قال الذهبى : "على شرط البخارى ومسلم". وهو اصح الاسانيد عند اهل الاصول.

[৫৯০] সম্ভবত এই অস্থিরতার কারণেই হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে হত্যার উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। নতুবা এমন দূরবর্তী ব্যাখ্যার তো কোনো সুযোগ ছিল না।

একটি ধারণার অপনোদন

অনেকে মনে করেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা আসলে সাবায়িদের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, সাবায়িরা হজরত আম্মারকে নিয়ে এসেছে এবং তারাই তাকে হত্যা করেছে।

যারা একথা বলেন, তারা অন্য বর্ণনায় বর্ণিত হজরত মুয়াবিয়ার আরেকটি কথা দ্বারা দলিল পেশ করেন। তা হলো,

انما قتله الذين جاءوا به

হজরত আম্মারকে তারাই হত্যা করেছে, যারা তাকে নিয়ে এসেছে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৪৯৯)

কিন্তু এ বর্ণনাটি সম্পর্কে আমাদের কথা হলো, প্রথমত এটি সনদের বিচারে প্রথমোক্ত বর্ণনার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, যেটিতে হজরত মুয়াবিয়ার স্পষ্ট বক্তব্য আছে- انما قتله على واصحابه অর্থাৎ হজরত আম্মারকে হত্যা করেছে আলি এবং তার সাথিরা।

দ্বিতীয়ত এ বর্ণনার শুরুতে রাবি নিজেই স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে, এ কথা সিফফিনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে প্রথমোক্ত স্পষ্ট বর্ণনাটিতে রাবি পরিষ্কার বলেছেন, হজরত আম্মারকে হত্যার পরপরই হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আলির নাম নিয়ে ঐ কথাটি বলেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, আসল বক্তব্য এটিই। পরে যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যে অস্পষ্ট

এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, একবার হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, এই রোগে আমার মৃত্যু হবে না। কেননা আমার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, আমার মরণ হবে দুটি মুমিন দলের পরস্পরের যুদ্ধের কারণে'।[৫৯১]

এর দ্বারা জানা গেল, সিফফিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল ঈমানদার ও ইখলাসের অধিকারী।

আর্তচিৎকারের রাত

৭ থেকে ৯ সফর, মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার, টানা তিনদিন উভয় বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে নিজ নিজ শক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বহু মানুষ কাজ করেছেন। উভয় পক্ষই চাচ্ছিল একটি চূড়ান্ত ফল আসুক। তাই হজরত আম্মার রা. এর শাহাদাতের পর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ার পরও লড়াই চলতে থাকে।

এদিকে সৈনিকরা লড়াই করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তবু গভীর রাত পর্যন্ত যুদ্ধের বিভীষিকা অব্যাহত থাকে। ক্লান্ত-অবসন্ন সৈনিকদের করুণ আর্তনাদ, একে অপরকে চিৎকার করে হাঁক দিয়ে ডাকা এবং ঘন ঘন তাকবিরধ্বনি ওঠার কারণে এ রাতকে ইতিহাসের পাতায় 'লাইলাতুল হারির' নামে অভিহিত করা হয়, যার অর্থ আর্তচিৎকারের রাত।[৫৯২]

বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, তাতেও সাবায়িরা উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা হত্যাকারী তো কোনো অজানা লোক ছিল না। বরং হত্যাকারী ছিল শামের বাহিনীর প্রসিদ্ধ অফিসার আবু গাদিয়াহ জুহানি। আর কোনোভাবেই এটা প্রমাণিত নয় যে, তিনি সাবায়ি ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন হজরত উসমান রা. এর কিসাস আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী একজন সাহাবি।

সুতরাং দ্বিতীয় বর্ণনার অস্পষ্ট বক্তব্যকে প্রথোমক্ত স্পষ্ট বর্ণনার উপরই ধরে নেওয়া হবে।

৫৯১

لا اموت الا قتيلا بين فئتين مؤمنتين. (التاريخ الاوسط، امام بخارى : ۷۹/۱، ط دارالوعى)

৫৯২ লিসানুল আরব : ৫/২৬০, ফাতহুল বারি, আত তাকবির ওয়াত তাসবিহ ইনদাল মানাম : ১১/১২৩

এ রাতে হজরত আলি রা. মাগরিবের নামাজ আদায় করেন 'সালাতুল খাওফ' তথা ভয়ের সময়ের নামাজের পদ্ধতিতে। আর এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর নবীর একটি সুন্নাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।[৫৯৩]

এই রাতে যুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে হজরত আলি রা. যথাসময়ে তার নিয়মিত অজিফা পাঠ করতে পারেননি। পরে রাতের শেষপ্রহরে একটু অবসর পেয়ে অজিফা পূর্ণ করেন।[৫৯৪]

যুদ্ধের সমাপ্তি

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, হজরত আলি রা. এর উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহর একতা ফিরিয়ে আনা। এমনকি তার পক্ষে বিপুল সৈন্যের সমাবেশ ঘটা সত্ত্বেও তার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে পক্ষে নিয়ে আসা। কিন্তু যখন এ চেষ্টা সফল হলো না, তখন নিরুপায় হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হলো। তবে তখনও ধারণা ছিল যে, শামের লোকেরা হয়তো সাধারণ কিছু সমাবেশ ও বিতর্কের পর আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু এ ধারণার বিপরীতে যুদ্ধ যখন অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে গেল এবং তীব্র আকার ধারণ করল, তখন হজরত আলি রা. আফসোস করলেন এবং নিজের ঠোঁট কামড়ে বললেন, 'আমি যদি জানতাম, ঘটনা এতদূর গড়াবে, তা হলে কোনোদিনই কুফা থেকে বের হতাম না'।[৫৯৫]

লাইলাতুল হারিরের শেষপ্রহরে নিহত ও আহতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। অনেকের তরবারি ভেঙ্গে গেল, বর্শার ফলা বেঁকে এলো। সৈনিকরা ক্লান্তিতে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ফলে আপনা থেকেই যুদ্ধ থেমে গেল।[৫৯৬]

---

[৫৯৩]

ان عليا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير. (السنن الكبرى للبيهقى، ح : ٦٠٠٨، باب الدليل على ثبوت صلوة الخوف)

[৫৯৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৬২, কিতাবুন নাফাকাত। মুসলিম শরিফে আছে-

قال على : ماتركته منذ سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم، قيل ولا ليلة صفين؟ قال : ولا ليلة صفين. (ح : ٧٠٩٣) فى مسند الحميدى : ولا ليلة صفين، ذكرتها من آخر الليل. (ح : ٤٣، ط دار السقا)

[৫৯৫] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৮৫২,

[৫৯৬] আল আখবারুত তিওয়াল, আবু হানিফাহ দিনাওয়ারি : পৃষ্ঠা : ১৮৮

হজরত আলি রা. রীতিমতো যুদ্ধবিরতির জন্য শামি বাহিনীর সিপাহসালার হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, 'দেখুন, নিহতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এখন যুদ্ধ বন্ধ করে এদের দাফনের ব্যবস্থা করা দরকার'।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. প্রস্তাবে সাড়া দিলেন। তারপর উভয় বাহিনী পরস্পরে মিলে গেল।[৫৯৭]

এ বিরতিটি হয়েছিল সেই রাতের শেষপ্রহরে। সকালে উভয় বাহিনী তরবারি কোষবদ্ধ করে একে অপরের কাছে আসা-যাওয়া এবং নিজ নিজ আহত ও নিহতদের খুঁজে নিয়ে যেতে লাগল।[৫৯৮]

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের দীনি অবস্থান

সিফফিনের যুদ্ধে নিহতদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম একমত ছিলেন যে, যে যে দলেরই হোক না কেন, সবাই জান্নাতি। নিম্নের ঘটনাগুলো থেকে একথাই বোঝা যায় :

- যুদ্ধবিরতির পরদিন যে গর্তে নিহতদের লাশ দাফন করা হচ্ছিল, হজরত আমর ইবনুল আস রা. তার পাশে বসে ছিলেন। একপর্যায়ে

---

[৫৯৭] আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি : ২/৩২৮,

নোট : অনেকে মনে করেন, এ বর্ণনা নিছক কাল্পনিক যে, সিফফিনের যুদ্ধের শেষদিকে হজরত আলি রা. এর দল শামবাসীর উপর প্রবল ছিল। কারণ, এটা আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত।

কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। আবু মিখনাফের বর্ণনা আমাদের মতেও বেশ দুর্বল। তবে সহিহ সনদেই একথা প্রমাণিত আছে যে, যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সময় হজরত আলি রা. এর বাহিনী প্রবল ছিল। এ কথা স্বয়ং মুয়াবিয়া রা. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সম্মুখে স্বীকার করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য : মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৮৭৩,

অবশ্য আবু মিখনাফের বর্ণনায় উল্লেখকৃত এ কথা আসলেই কাল্পনিক যে, 'আশতার নাখায়ি তার বাহিনী নিয়ে প্রতিপক্ষকে পিছু ধাওয়া করছিল, ঠিক এমন সময় হঠাৎ হজরত আলি রা. অত্যন্ত জোরালোভাবে আদেশ করে তাকে ফিরিয়ে আনেন'।

এটা কাল্পনিক এজন্য যে, উল্লিখিত দিনাওয়ারি এবং বালাজুরির বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, লাইলাতুল হারিরের শেষপ্রহরে যুদ্ধ বন্ধ করা হয়েছিল। পরদিন এই বিরতি চালাকালে, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সন্ধিচুক্তির আলোচনা শুরু হয়েছিল।

[৫৯৮] আল আখবারুত তিওয়াল, আবু হানিফাহ দিনাওয়ারি : পৃষ্ঠা : ১৮৮

হজরত আলি রা. এর দলের জনৈক ব্যক্তির লাশ দাফনের জন্য আনা হলে হজরত আমর ইবনুল আস রা. কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, 'এ তো বড় বীর মুজাহিদ ছিল। হায়, এই যুদ্ধে এমন কত মানুষ নিহত হলো, যারা আল্লাহর বিধানের উপর জীবন পরিচালনা করত'![৫৯৯]

- যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর হজরত আলি নিহতদের দেখার জন্য বের হলেন। তখন উভয় দলের নিহত সৈন্যদের জন্য একইভাবে রহমতের দোয়া করেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এদের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল বলে ঘোষণা দিলেন, আবার এদের জন্য রহমতের দোয়াও করছেন?

  তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এদের নিহত হওয়াকে এদের গুনাহের জন্য কাফফারা বানিয়ে দিয়েছেন'।[৬০০]

- আশতার নাখায়ি শামি বাহিনীর নিহতদের মধ্যে হাবেস ইয়েমেনি নামক এক ব্যক্তিকে দেখে বলল, ইন্না লিল্লাহ।

  হজরত আলি রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইন্না লিল্লাহ বললে কেন?

  সে বলল, আমি একে মুমিন মনে করতাম। কিন্তু আজ তো সে বিপথগামী হয়ে মরল।

  হজরত আলি রা. বললেন, সে এখনো মুমিনই আছে।[৬০১]

  তারপর বললেন, আমাদের এবং তাদের থেকে যারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেছিল, তারা মুক্তি পেয়ে গেছে।[৬০২]

  আরো বললেন, আমাদের এবং তাদের সকল নিহত ব্যক্তি জান্নাতি। আর এ দুর্ঘটনার সব দায়িত্ব বর্তাবে আমার ও মুয়াবিয়ার উপর।

- হজরত আলি রা. এর দলের জনৈক ব্যক্তি শামবাসী সম্পর্কে অশালীন কথা বলতে লাগল। হজরত আলি রা. বললেন, এভাবে বলো না।

---

[৫৯৯] আল আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি : ২/৩২৮

[৬০০] জামিউল আহাদিস, হাদিস : ৩৪৩৩৪, কানযুল উম্মাল, হাদিস : ৪১৭১৫

[৬০১] জামিউল আহাদিস, হাদিস : ৩৪৭৮৬, কানযুল উম্মাল, হাদিস : ৩১৭১১

[৬০২] জামিউল আহাদিস, হাদিস : ৩৪৮৬৪, কানযুল উম্মাল, হাদিস : ৩১৭০৭

কেননা তারা মনে করেছে আমরা বিদ্রোহ করেছি, আর আমরা মনে করেছি তারা বিদ্রোহ করেছে। তাই আমরা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি।[৬০৩]

লক্ষ করার বিষয় যে, যুদ্ধ চলাকালেও প্রতিপক্ষের ব্যাপারে এমন ভারসাম্যপূর্ণ কথা আসলে হজরত আলি রা. এর অসাধারণ উদারতাই প্রমাণ করে। এমন ন্যায়সঙ্গত কথা একজন খলিফায়ে রাশেদই বলতে পারেন।

স্বপ্নযোগে সুসংবাদ

সিফফিনের যুদ্ধের পর স্বপ্নের মাধ্যমে উভয় পক্ষের জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। জনৈক তাবেয়ি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করছেন। তার সম্মুখেই একটি তাঁবু টানানো হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কাদের তাঁবু?

উত্তরে বলা হলো, যুলকালা ও হাওশাব রা. এর। (এরা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষে লড়াই করে সিফফিনের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।)

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হজরত আম্মার রা. এবং তার সঙ্গীরা (হজরত আলির পক্ষের নিহতরা) কোথায়?

উত্তরে বলা হলো, আরো সম্মুখে। (অর্থাৎ জান্নাতের আরো উচ্চ স্তরে)

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী করে হলো? এরা তো একে অপরকে হত্যা করেছিল (অর্থাৎ যে দল সত্যের উপর ছিল, তারা জান্নাতি এবং অপর দলটির জাহান্নামি হওয়া উচিত)।

উত্তরে বলা হলো, যখন তারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, তাকে অনেক ক্ষমাশীল পেয়েছে।[৬০৪]

---

[৬০৩]

انما هم قوم زعموا انا بغينا عليهم، وزعمنا انهم بغوا علينا، فقاتلناهم. (تعظيم قدر الصلوة لمحمد بن نصر المروزى م ٢٩٤ هجرى، رقم الرواية : ٥٩٤، تاريخ دمشق : ٣٤٣/١، بغية الطلب فى تاريخ حلب : ٣٠٠/١) وفى معناه قول عمار بن ياسر رض فى صفين، قال : ديننا واحد، وقبلتنا واحدة، ودعوتنا واحدة، ولكن قوم بغوا علينا فقاتلناهم. (تعظيم قدرالصلوة للمروزى، ح : ٥٩٩)

[৬০৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৪৪

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য ও নিহতের সংখ্যা

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সিফফিনের যুদ্ধে ইরাকি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ,[৬০৫] যাদের মধ্যে বহু বদরি ও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিও ছিলেন।[৬০৬] অন্যদিকে শামি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৭০ হাজারের কম ছিল না।[৬০৭] আর বিশুদ্ধ মত অনুসারে এ যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার,[৬০৮] যাদের মধ্যে ৪৫ হাজার ছিল শামি এবং ২৫ হাজার ইরাকি।[৬০৯]

---

[৬০৫] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৩, সৈন্যসংখ্যার ব্যাপারে মাসউদির উক্তি ছিল ৯০ হাজার। কিন্তু এ বর্ণনাটি দুর্বল। (দ্রষ্টব্য : মুরুযুয যাহাব : ৩/১২০,

تسمية من شهد على رضط الرسالة

[৬০৬] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৬, সনদ হাসান।

ইরাকি বাহিনীতে বদরি সাহাবিদের উপস্থিতির প্রমাণ

এখানে ইমাম শাবি রহ. ইরাকি বাহিনীতে ৯০ জন বদরি সাহাবির থাকার কথা খণ্ডন করে বলেছেন, এ বাহিনীতে বদরি সাহাবিদের থেকে হজরত খুজাইমা বিন সাবিত রা. ছাড়া কেউ ছিলেন না। (দ্রষ্টব্য : আস সুন্নাতু লিল খাল্লাল, বর্ণনা নং ৭২৬, সনদ সহিহ।)

কিন্তু ইমাম জাহাবি রহ. ইমাম শাবির এ বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলেছেন-

قد شهدها عمار بن ياسر والامام على ايضا.

(সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/২২১)

সুতরাং সত্য ও সঠিক মত এটাই যে, হজরত আলি রা. এর সঙ্গে অবশ্যই বদরি সাহাবি ছিলেন। তবে বাহ্যিকভাবেই বোঝায় যায় তাদের সংখ্যা শত শত ছিল না।

ইমাম তাবারি রহ. মু'জামে কাবিরের মধ্যে শিরোনামে এমন কয়েকজন সাহাবির নাম উল্লেখ করেছেন, যারা সিফফিনের যুদ্ধে হজরত আলি রা. এর পক্ষে ছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন বদরি সাহাবিও ছিলেন।

কিন্তু শামি বাহিনীতে কোনো বদরি সাহাবি ছিলেন না। কেউ কেউ শুধু হরজত উবাদা বিন সামিত রা. সম্পর্কে শামি বাহিনীতে ছিলেন বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু তাবাকাতের কিতাবসমূহ, মাআজিমে সাহাবা, আসমাউর রিজাল এবং তারিখের কিতাবসমূহে এর পক্ষে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ঠিক যেমন পাওয়া যায় না হজরত আবুল হাইসাম মালিক বিন তিহান রা. সম্পর্কে ইরাকি বাহিনীতে থাকার প্রমাণ। সুতরাং এটাও ভুলভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।

[৬০৭] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৩, মাসউদির বর্ণনা মতে শামি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮৫ হাজার। কিন্তু এ মত দুর্বল। (দ্রষ্টব্য : মুরুযুয যাহাব : ৩/১২১)

[৬০৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৮৬০, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৪, عن ابن سيرين مرسلا بسند حسن

[৬০৯] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৪, عن عبد الرحمن بن ابزى رضـ.., মাসউদি বর্ণনা করেছে, সিফফিনের যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার। কিন্তু এটি অতিরঞ্জিত কথা। (দ্রষ্টব্য : মুরুযুয যাহাব : ৩/১৪৩)

লাইলাতুল হারিরের পর উভয় পক্ষের মনের অবস্থা

লাইলাতুল হারিরে নিহতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদেরকে দাফন করার জন্য হজরত আলি রা. যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব করেছিলেন এবং সে প্রস্তাব অনুযায়ী যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালে উভয় বাহিনীর মনে ভীষণ অস্থিরতা শুরু হলো। একদিকে ইরাকি বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও ছিল অনেক। ফলে বহু ইরাকি অফিসার এবং তাদের আমিররা ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে শামি বাহিনীর অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। আর একদিন যদি যুদ্ধ অব্যাহত থাকত, তা হলে যুদ্ধের ফল হয়তো ইরাকিদের পক্ষেই চলে যেত। এমনকি রণাঙ্গন থেকে পলায়নের অবস্থাও হতে পারে, এই আশঙ্কায় হজরত মুয়াবিয়া রা. অত্যন্ত দ্রুতগামী একটি ঘোড়া প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কিন্তু শামি বাহিনীর এ পর্যুদস্ত অবস্থা ইরাকি বাহিনীর জানা ছিল না। অন্যদিকে তাদের এক ব্যক্তি শামি নেতাদেরকে বলেছিল, 'আমি ইরাকিদেরকে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় দেখে এসেছি'।[৬১০] কিন্তু

ইমাম বাইহাকি রহ. নিজস্ব সনদে আরেকটি মত উল্লেখ করেছেন। সেটি অনুযায়ী ইরাকি বাহিনীতে সৈন্য ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার। এদের থেকে ৪০ হাজার নিহত হয়েছিল। অন্যদিকে শামি সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, এদের থেকে ২০ হাজার নিহত হয়েছিল। এ হিসেবে মোট নিহতের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। (দ্রষ্টব্য : দালায়েলুন নুবুওয়াহ : ৬/৪১৯)

৬১০

عن عاصم بن كليب عن ابيه قال : انى لخارج من المسجد اذ رأيت ابن عباس حين جاء من عند معاوية فى امر الحكمين........ وفيه : فقال ابن عباس : هل علمتم ان اهل الشام سألوا القضية فكرهناها وابيناها. فلما اصابتكم الجروح وغضكما الالم ومنعتم ماء الفرات انشأتم نطلبونها/ولقد اخبرنى معاوية انه اتى بفرس بعيد البطن من الارض ليهرب عليه، ثم اتاه آت منكم فقال : انى تركت اهل العراق يموجون مثل الناس ليلة النفر بمكة. (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٨٧٣، ط الرشد)

আসলে উভয় পক্ষের সেদিনকার অবস্থা সম্পর্কে বিপরীতমুখী বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সহিহ বর্ণনা এটাই। এ বর্ণনার সনদ হলো, ইয়াহয়া বিন আদাম, ইবনে উয়ায়না, আসেম বিন কুলাইব, কুলাইব বিন শিহাব। এরা প্রত্যেকে উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য রাবি

- ইয়াহয়া বিন আদাম বুখারি মুসলিমের বর্ণনাকারী এবং শতভাগ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৯/৫২২, ৫২৩)

তারপরও এমনটা আশা করা দুষ্কর ছিল যে, ইরাকি বাহিনী বিজয়ের নিকটবর্তী হয়েও সন্ধির প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু যেহেতু শামি নেতৃবর্গ ইরাকি বাহিনীর ভেতরগত অবস্থা জেনে ফেলেছিলেন এবং নিজেদের অবস্থা তারা গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই তারা সন্ধির জন্য খুব আশাবাদী হয়ে ওঠেন। তবে সন্ধির প্রস্তাব পাঠানোর পূর্বে হজরত মুয়াবিয়া রা. বাড়তি সতর্কতা এভাবে অবলম্বন করেছিলেন যে, তার বাহিনীকে পেছনে সরিয়ে একটি পাহাড়ের কোল-ঘেষে তাঁবু ফেলেন।[৬১১] কারণ তার দলের নিহতের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

- ইবনে উয়ায়না (সুফিয়ান বিন উয়ায়না) ছিলেন হিজাজের নামকরা মুহাদ্দিস এবং বুখারি ও মুসলিমের রাবি। তিনি শুধু নির্ভরযোগ্যই নন, বরং তিনি ছিলেন হাফেজ ও হুজ্জাত। (তাকরিবুত তাহযিব, জীবনী : ২৪৫১)
- আসেম ইবনে কুলাইব সিহাহ সিত্তার রাবি। ইমাম বুখারি রহ. তালিকান তার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাকে বলা হয়েছে সালেহ ও সাদুক। (তাকরিবুত তাহযিব, জীবনী : ৩০৭৫)
- কুলাইব ইবনে শিহাব ছিলেন আসেমের পিতা। তিনি প্রথম সারির তাবেয়িদের একজন, যাদেরকে সাদুক বলা হয়েছে। (তাকরিবুত তাহযিব, জীবনী : ৫৬৬০)

৬১১

عن ابن نمير قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بى ابن ثابت عن ابى وائل : لما استحر القتل فى اهل الشام بصفين اعتصم معاوية واصحابه بجبل، فقال عمروبن العاص : ارسل على بالمصحف (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٩١٤ باسناد صحيح، ط الرشد)

এ বর্ণনার রাবিদের অবস্থা

- ইবনু নুমাইর : (আবদুল্লাহ বিন নুমাইর, মৃত্যু : ১৯৯ হিজরি) উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং বুখারি-মুসলিমের রাবি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/৪৫৫,)
- আবদুল আজিজ বিন সিয়াহ : (মৃত্যু : ১৫০) বুখারি-মুসলিমের সাদুক রাবি। (তাহযিবুল কামাল : ১৮/১৪৫,১৪৬)
- হাবিব বিন আবি সাবিত : (মৃত্যু : ১১৯ হিজরি) বুখারি-মুসলিমের উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য রাবি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/২৮৮)
- আবু ওয়ায়েল : (শাকিক বিন সালামা, মৃত্যু : ৯০ হিজরি) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের চারজনেরই শাগরিদ। (তারিখুল ইসলাম লিয জাহাবি : ২/৯৪২)

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালার প্রস্তাব

এ পর্যায়ে এসে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করা আবশ্যক মনে করা হলো, যেখানে ফয়সালার ভিত্তি হবে শরিয়তে মুহাম্মদী। আর শরিয়তের ভিত্তি যেহেতু কুরআন, এ আহ্বানের নাম দেওয়া হলো 'আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান'। এ আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল, কুরআনের প্রতি ভালোবাসার কারণে যেন উভয় দলের মুসলমানরা যুদ্ধবন্ধের প্রতি সহজেই উদ্বুদ্ধ হয়।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. কে পরামর্শ দিয়ে বললেন, হজরত আলির কাছে পবিত্র কুরআনের একটি কপি পাঠিয়ে দিয়ে তাকে এর প্রতি আহ্বান করুন, তা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন না। সেমতে এ প্রস্তাব নিয়ে এক ব্যক্তি হজরত আলি রা. এর কাছে গিয়ে বলল, আমাদের এবং আপনার মধ্যে (সমাধানের জন্য) আল্লাহর এই কিতাব বিদ্যমান আছে।

একথা বলে লোকটি এ আয়াত তেলাওয়াত করে-

> اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ
>
> আপনি কি দেখেন না ওইসব লোককে, যাদের দান করা হয়েছে কিতাবের একটি অংশ, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, যাতে তারা তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করে, তারপরও তাদের থেকে একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ভ্রুক্ষেপ করে না।[৬১২]

হজরত আলি প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো এ প্রস্তাব সবার আগে গ্রহণ করছি। আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব আছে।[৬১৩]

---

[৬১২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ২৩; আয়াতটি শোনানোর উদ্দেশ্য ছিল, কারো জন্যই কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে এ আয়াতের ধমকির উপযুক্ত হওয়া উচিত নয়।

[৬১৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৯১৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৫৯৭৫, তাফসিরুন নাসায়ি : ২/৩০৬, সনদ সহিহ। সহিহ বুখারিতেও এ বর্ণনার কিছু অংশ আছে, হাদিস : ৩১৮৯, গাযওয়াতু হুদাইবিয়া সংক্রান্ত অধ্যায়।

হজরত আলি রা. সমঝোতার প্রস্তাব কেন গ্রহণ করলেন?

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যুদ্ধে হজরত আলি রা. এর অবস্থান দৃঢ় ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি সমঝোতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন? আর যদি সন্ধি করার ইচ্ছাই থাকে, তা হলে প্রথমে যুদ্ধের জন্য কেন এত আয়োজন করলেন?

আসলে এর দুটি কারণ ছিল। যথা :

১. বিপুল পরিমাণে জনশক্তি ক্ষয় হওয়ার কারণে ইরাকি বাহিনীর বহু আমির মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও ভারাক্রান্ত এবং যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। এ কারণেই হজরত আলি ইরাকি সৈনিকদের মধ্যে বিক্ষিপ্ততার বিভিন্ন নিদর্শন দেখে চিন্তিত হয়ে তাদেরকে বলেছিলেন, হায়! তোমাদের পরিবর্তে আমার সাথে যদি বনু ফারেসের মাত্র এক হাজার সৈন্য থাকত![৬১৪]

২. যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ ছিল, হজরত আলি রা. এর মত ছিল, একান্ত নিরুপায় না হলে তরবারি ব্যবহার না করা, যেমনটি রয়েছে শরিয়তের বিধানে। সেমতে এবার যেহেতু শামবাসীর পক্ষ থেকে কুরআনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করা হচ্ছিল, তাই তিনি সাগ্রহে সেই প্রস্তাব মেনে নেন।

আবু মিখনাফের হঠকারিতা সবারই জানা। তবু যুদ্ধ বন্ধের এ প্রস্তাব সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তার বক্তব্য এই :

(ইরাকি বাহিনীর প্রধান) আশআস বিন কায়েস হজরত আলির কাছে এসে বলল, আমার ধারণা, পবিত্র কুরআনের বিধান মেনে নেওয়ার

---

[৬১৪] এ বর্ণনাটি ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণিত আছে। যথা :

عن ابی حنیفة عن موسی بن ابی کثیر عن علی رضہ انه قال لابی موسی رضہ حین حکمه : خلصنی منها ولو بعرق رقبتی، فانه لن یصول بهم احد الا صال بالسهم الا خبث، ولو ددت انی معی مکانهم الف فارس بن غنم ولاجتماع هؤلاء علی باطلهم اشد من اجتماعکم علی حقکم، (کتاب الآثار، للقاضی ابی یوسف، ح : ۹۲۹، ط العلمیة)

ফাররাস বিন গানাম ছিল জাহিলি যুগের এক প্রসিদ্ধ কবি। তার সন্তানদের বলা হতো বনু ফাররাস। তারা যুদ্ধ ও লড়াইয়ে বেশ সাহসী বলে প্রসিদ্ধ ছিল। (মু'জামু শুআরাইল আরব, পৃষ্ঠা : ১৮৬২)

ব্যাপারে যে আহ্বান জানানো হয়েছে, বাহিনীর সবাই তা মেনে নিতে আগ্রহী এবং এজন্য তারা আনন্দিত। এবার আপনি চাইলে আমি মুয়াবিয়ার কাছে গিয়ে তার মনোভাব জেনে আসতে পারি। আশাকরি, তা হলে আপনি তাদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পাবেন।

হজরত আলি রা. বললেন, আপনি প্রয়োজন মনে করলে গিয়ে জেনে আসতে পারেন।

আশআস রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুয়াবিয়া, আপনি পবিত্র কুরআন কেন পাঠালেন?

তিনি বললেন, 'পবিত্র কুরআন পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা এতে যে বিধান নাজিল করেছেন, আমরা এবং আপনার সবাই সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারি। সুতরাং আপনি আপনাদের থেকে এমন এক ব্যক্তিকে পেশ করুন, যাকে আমরা মেনে নিতে পারি। আর আমরাও আমাদের থেকে এমন একজনকে পেশ করি। আমাদের উভয় পক্ষের জন্য আবশ্যক হলো, আল্লাহর কিতাবে যে বিধান পাব, সে অনুযায়ী আমল করা। তা থেকে এক চুল বিচ্যুত না হওয়া। সুতরাং নির্বাচিত দুই ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত দেবে, উভয় পক্ষের জন্য সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হবে'।

আশআস বললেন, আপনি ইনসাফের কথাই বলেছেন।

তারপর তিনি হজরত আলি রা. এর কাছে এসে এ সংবাদ প্রদান করেন। হজরত আলির সঙ্গীরা বলে ওঠেন, আমরা এ প্রস্তাব মেনে নিয়েছি, আমরা এতে সন্তুষ্ট আছি।[৬১৫]

দাঙ্গাবাজদের পক্ষ থেকে যুদ্ধবন্ধের বিরোধিতা

কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হলো, ইরাকি বাহিনীর অনেকে মনে করত, যদি আর একটি দিন যুদ্ধ করা হতো, তা হলে তারাই জয়লাভ করত। তাই তারা যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে ছিল না। এদের মধ্যে কিছু তো ছিলেন নিষ্ঠাবান,

---

[৬১৫] তারিখুত তাবারি : ৪/৫১; আবু মিখনাফের এই বর্ণনাটি ছাড়া যুদ্ধ বন্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বর্ণনা হাদিসের সহিহ বর্ণনা থেকে পেশ করা হয়েছে।

যারা একটি পর্যায়ে গিয়ে এমন কথা বলছিলেন। কেননা নিজ বাহিনীর বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার প্রতিও তাদের লক্ষ ছিল, আবার হজরত আলি রা. এর দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের গভীরতাও তারা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা হজরত আলির যেকোনো সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত ছিলেন।[৬১৬]

কিন্তু এ দলের মধ্যে কিছু দাঙ্গাবাজও ছিল, যাদের একান্ত বাসনা ছিল, যুদ্ধের দাবানল আরো শক্তিশালী হয়ে উঠুক এবং মুসলিমজাতি নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে করতেই দুর্বল হয়ে যাক।

এদের কেউ কেউ মদিনায় গিয়ে সন্ত্রাসী ও বিশৃঙ্খলার কাজে লিপ্ত হয়েছিল।[৬১৭] এরা ভয় পাচ্ছিল, যদি যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তা হলে তাদের ব্যাপারে কোনো সর্বস্বীকৃত আইনি সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে। তাই এ শ্রেণির লোকেরা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধবন্ধের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে লাগল। আবু মিখনাফও মেনে নিয়েছে যে, যুদ্ধবন্ধের প্রস্তাবের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে অগ্রগামী ছিল, যারা হজরত উসমান-বিরোধী আন্দোলনে জড়িত হয়েছিল। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

১. হজরত আলির বাহিনীতে প্রত্যেক অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে ছিল আশতার নাখায়ি। সে হজরত আলির পক্ষ থেকে যুদ্ধবন্ধের আদেশ পেয়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো। সে প্রতিবাদ করে বলল, এখন কি যুদ্ধ বন্ধ করার সময়? আমরা তো জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছি।

   হজরত আলি যখন তাকে জোরালোভাবে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিলেন, তখন সে এই আদেশের প্রতিবাদ করে অন্যদেরও প্ররোচিত করতে চেষ্টা করল। হজরত আলির আদেশ মান্য করার কারণে অন্যদেরকে সে তিরস্কার করতে লাগল।[৬১৮]

৬১৬

كما قال عبد الله بن عباس للخوارج : هل علمتم أن أهل الشام سألوا القضية فكرهناها وأبيناها.........وفى آخره قال : لا تنكروا حكمين في دماء الأمة وقد جعل الله في قتل طائر حكمين (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٣٧٨٧٣ بسند صحيح، ط الرشد)

৬১৭ তারিখুত তাবারি : ৫/৬; আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত।

৬১৮ তারিখুত তাবারি : ৫/৪৯; আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত।

২. অবশেষে যখন হজরত আলির আদেশে যুদ্ধ বন্ধের খসড়া প্রস্তুত করা শুরু হলো, তখন আশতার নাখায়ি এ প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলল :

যদি আমি এ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করি, তা হলে যেন আল্লাহ আমার ডান হাতও ভালো না রাখেন এবং বাম হাতও। আমি কি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই? শত্রুর ভ্রষ্টতা সম্পর্কে কি আমার নিশ্চিত বিশ্বাস নেই? আরে! তোমরা যদি এ জুলুমের ব্যাপারে একমত না হতে, তা হলে বিজয় এসেই পড়েছিল।

যুদ্ধবন্ধের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিলেন হজরত আশআস বিন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি আশতার নাখায়ির এ কথা শুনে বললেন :

আল্লাহর কসম, তুমি কোনো বিজয়ও দেখনি, কোনো জুলুমও দেখনি। আমাদের পক্ষে এসে পড়ো, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।

আশতার বিদ্রুপের সুরে বলল, শত্রুতা নেই, না? আরে আমি তো তোমাদের সাথে দুনিয়াতে দুনিয়ার স্বার্থে এবং আখেরাতে আখেরাতের স্বার্থে শত্রুতা পোষণ করি। আল্লাহ আমার এই তরবারির মাধ্যমে বহু মানুষের রক্ত প্রবাহিত করেছেন। তুমি কিন্তু আমার কাছে তাদের চেয়ে উত্তম নও। আমি তোমার রক্তও প্রবাহিত করা হারাম মনে করি না।

একথা শুনে হজরত আশআস বিন কায়েস রা. ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।[৬১৯]

---

[৬১৯] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৪, ৫৫; আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত।
এখানে এমন সন্দেহ করা ঠিক হবে না যে, হজরত আলি রা. এ ধরনের বেআদব প্রকৃতির লোককে কীভাবে সহ্য করে সঙ্গে রাখলেন? কেননা এজাতীয় কিছু মানুষ হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দলেও ছিল। তিনিও তাদেরকে সহ্য করে যাচ্ছিলেন। সর্বোপরি আল্লাহর নবীর আশপাশেও কিছু মুনাফিক ওঠাবসা করত। বিভিন্ন কারণে তাদের দুর্ব্যবহার দেখেও না দেখার ভান করা হতো।

৩. এরপর হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে হজরত আসআস বিন কায়েস রা. যুদ্ধবন্ধের খসড়া নিয়ে বাহিনীর বিভিন্ন মজলিসে গিয়ে পাঠ করে শোনান। একপর্যায়ে যখন বনু তামিম গোত্রের কাছে পৌঁছেন, উরওয়া বিন উদাইয়া নামে তাদের এক সরদার উক্ত খসড়া মানতে সরাসরি অস্বীকার করে। শুধু তা-ই নয়, لا حكم إلا لله বলে স্লোগান তুলে হজরত আসআস বিন কায়েস রা.র ঘোড়ার উপর তরবারির হামলা চালিয়ে দেয়।[৬২০]

উদাহরণস্বরূপ এ তিনটি বর্ণনা শুধু ঘটনার সমর্থনের জন্য দুর্বল উৎস থেকে পেশ করা হলো। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, ইরাকি বাহিনীতে কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক ছিল, যারা যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে হজরত আলির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

বুখারি শরিফের বর্ণনা

এবার সহিহ বর্ণনার আলোকে যুদ্ধবন্ধের ব্যাপারে সন্ত্রাসীদের আপত্তি এবং বিশিষ্ট সাহাবিদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বুঝানোর দৃশ্য লক্ষ করুন। সিফফিনের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হজরত আবু ওয়ায়েল রহ. বলেন : 'হজরত আলি রা. যখন (হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে) বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহর কিতাবের উপর অধিক আমলকারী', তখন সেই সকল কারি সাহেব সামনে এলেন, যারা পরে খারেজি হয়ে গেছেন। আমরা তখন তাদেরকে কারি সাহেবই বলতাম। তাদের তরবারি থাকত তাদের কাঁধে। তারা এসে বলতে লাগলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আমরা ওই দল (শামবাসী) থেকে আর কী আশা করছি? কেন আমরা তরবারি উঁচু করে তাদের দিকে ছুটে যাচ্ছি না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন?'

একথা শুনে হজরত সাহল বিন হুনাইফ রা. দাঁড়িয়ে যান এবং (এ স্বেচ্ছাচারী মনোভাব থেকে বাধা দিয়ে) বলেন, 'হে লোকসকল, নিজের মতকে সন্দেহজনক মনে করো। হুদাইবিয়ার ঘটনার কথা আমাদের মনে আছে'।[৬২১]

---

[৬২০] তারিখুত তাবারি : ৫/৫৫; আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত।

[৬২১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৫৯৭৫; তাফসিরে নাসায়ি : ২/৩০৬

হজরত সাহল বিন হুনাইফ রা. এর জ্বালাময়ী ভাষণ

এরপর হজরত সাহল বিন হুনাইফ রা. বললেন, হুদাইবিয়ার ঘটনার দিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু জান্দাল রা. কে কাফেরদের হাতে তুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। ফলে কতিপয় সাহাবির মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, আমরা যদি সত্যের উপর থাকি, তা হলে কাফেরদের সাথে এই নমনীয়তা কেন? কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছিল আল্লাহর নবীর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াটাই ছিল কল্যাণকর। সাহাবায়ে কেরাম সেদিন না বুঝেও আল্লাহর নবীর আদেশ মেনে নিয়েছিলেন।[৬২২]

হজরত সাহল বিন হুনাইফ রা. এর বক্তব্য ছিল এই—'আবু জান্দালের ঘটনা যেদিন ঘটেছিল, সেদিন আমার নিজের অবস্থার কথা মনে আছে। যদি আমি আল্লাহর নবীর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারতাম, তা হলে সেদিন করে দিতাম। কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসুল সবচেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী'।

তারপর হজরত সাহল বিন হুনাইফ রা. চলমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মন্তব্য করে লোকদেরকে বলেন, 'চলমান বিষয়টির পূর্বে সব সময় এমনই হয়েছে যে, যখনই কোনো ভয়ানক বিষয়ের জন্য আমরা তরবারি কাঁধে ঝুলিয়েছি, তরবারি আমাদের পথ সুগম করে দিয়েছে এবং আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছে দিয়েছে'।[৬২৩]

এ কথার উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান প্রেক্ষাপটটি সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং কেবল তরবারি দ্বারাই এর সমাধান করার জন্য জেদ ধরে বসে থাকা যাবে না। হজরত সাহল বিন হুনাইফের বক্তব্যের পর হজরত আলি রা. বললেন,

ايها الناس ان هذا فتح

লোকসকল, নিশ্চয়ই এই যুদ্ধবিরতি বিজয়-ই বটে।[৬২৪]

---

[৬২২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৫৯৭৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৯১৪; সনদ সহিহ; তাফসিরে নাসায়ি : ২/৩০৬

[৬২৩] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ৪১৮৯; কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতিল হুদাইবিয়া।

[৬২৪] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৭৯১৪

কিন্তু তাতে কী হবে, সন্ত্রাসী ও দাঙ্গাবাজরা তো বিভেদ সৃষ্টির জন্য বাহানা খুঁজছিল। বিশিষ্ট সাহাবিদের বুঝানোর প্রতি তারা কোনো কর্ণপাত করল না। আর এ সময় হজরত আলি ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যে যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করে যে দলের উদ্ভব ঘটেছিল, ইতিহাসে তাকে 'খারেজি সম্প্রদায়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরা لا حكم الا لله বলে উভয় বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে সংঘবদ্ধ হয়েছিল।

হজরত আলি রা. যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন?

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং হজরত আমর ইবনুল আস রা. প্রতারণার উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করেছিল। এখানে যেসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে, তার মর্ম যদি কেবল এতটুকু হয় যে, শামি বাহিনী নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য সন্ধির প্রস্তাব করেছিল, তা হলে তো কোনো অসুবিধা থাকে না। কারণ, যুদ্ধের সময় প্রতিটি বাহিনীই নিজেদের রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা হলো, কোনো কোনো বর্ণনায় বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার দ্বারা মনে হয়, শামি বাহিনী মানুষের আবেগ ও ভক্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য কুরআনকে মাঝখানে টেনে এনেছিল।

এসব দুর্বল বর্ণনার কোনোটিতে হজরত আলি রা. এর উক্ত প্রস্তাবকে অস্বীকার বলা হয়েছে, এটা ছিল শামি বাহিনীর নিছক প্রতারণা। শুধু তা-ই নয়, আরো বলা হয়েছে যে, শামি বাহিনীর নেতৃত্বদানকারীরা ছিল সব মুনাফিক। কিন্তু আসল কথা হলো, এসব বর্ণনা সনদের বিচারে অত্যন্ত দুর্বল এবং মতনের দিক থেকেও নানা ধরনের অসামঞ্জস্য ও অবাস্তবতায় ভরপুর। এগুলোর কোনো কোনোটি বানিয়েছে আবু মিখনাফের মতো মিথ্যুক রাবি। আর অন্যগুলোর মধ্যেও এ ধরনের অতি দুর্বল বর্ণনাকারী আছে। এসব যয়িফ বর্ণনার সমর্থনে কোনো সহিহ বর্ণনা নেই।[৬২৫]

---

[৬২৫] এ ঘটনা দুর্বল সনদে কয়েক জায়গায় বর্ণিত আছে। যথা :

১. ইবনে শিহাব যুহরি, সুলাইমান ইবনে ইউনুস থেকে বর্ণিত। (তাবারি, ৫/৫৭, ৫৮)
২. আবু মিখনাফের বর্ণনা। (তাবারি : ৫/৪৮-৫৬)
৩. ইবনে জু'দুবার বর্ণনা। (আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি : ২/৩৪৪)
৪. মাসউদির বর্ণনা। (মুরুযুয যাহাব : ৩/১৩৮, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৬)

উক্ত বর্ণনাসমূহের সনদের মান

১. ইবনে শিহাব যুহরির বর্ণনার সনদে এক রাবির নাম 'সুলাইমান বিন ইউনুস বিন ইয়াজিদ'। এর সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

২. আবু মিখনাফের মনগড়া বর্ণনা তৈরির কথা তো কারো অজানা নয়।

৩. আনসাবুল আশরাফের বর্ণনার রাবি হল ইবনে জু'দুবা, যাকে জারহ-তাদিলের ইমামগণ মাতরুক ও কাজ্জাব মনে করেন। (দ্রষ্টব্য : তাকরিবুত তাহযিব, জীবনী : ৭৭৬১, মাউসুআতু আকওয়ালিদ দারাকুতনি : ২/৭২২; আলকামিল ফি জুআফাইর রিজাল : ৯/১৪১)

৪. আর মাসউদি তো হচ্ছে শিয়া মতাদর্শী রাবি। সুতরাং তার দুর্বলতা স্পষ্ট।

মোটকথা, সনদের দিক থেকে এসব বর্ণনার কোনো মান বা অবস্থান নেই।

মতনের দিক থেকে উক্ত বর্ণনাগুলোর অবস্থান

মতনের দিক থেকে এসব বর্ণনা এজন্য অগ্রহণযোগ্য যে, এগুলোতে দাবি করা হয়েছে, হজরত মুয়াবিয়া এবং হজরত আমর ইবনুল আস রা. হজরত আলি রা.কে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পবিত্র কুরআন বর্শার ফলায় উঁচু করে ধরে সন্ধির প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু হজরত আলি রা. তাদের চক্রান্ত বুঝে ফেলেন। তাই তিনি তার বাহিনীকে শামি নেতাদের প্রতারণায় প্রতারিত হওয়া থেকে সাবধান করে দেন। (আবু মিখনাফের উক্তি অনুযায়ী) হজরত আলি রা. তার বাহিনীকে হজরত মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস রা. এবং তাদের সঙ্গীদের সম্পর্কে বুঝিয়েছেন,

ليسوا باصحاب دين ولا قرآن، انا اعرف بهم منكم، قد صحبتهم اطفالا وصحبتهم رجالا، فكانوا شر اطفال وشر رجال.

এরা না দীন পালন করে, আর না কুরআনকে মান্য করে। আমি তাদের সঙ্গে শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত করেছি। শৈশবে ও যৌবনে এরা ছিল সর্বনিকৃষ্ট।

কিন্তু এভাবে বুঝানোর পরও ইরাকি বাহিনী শামি বাহিনীর প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তরবারি কোষবদ্ধ করে ফেলে। ফলে হজরত আলি রা.-ও সন্ধি করতে বাধ্য হন।

আমরা এসব দুর্বল বর্ণনাকে পূর্ণরূপে বর্জন করেছি। কেননা এগুলোর সনদও সন্দেহপূর্ণ এবং মতনও। বিশেষত শামিবাহিনী সম্পর্কে হজরত আলি রা. এর অশোভন কথার ব্যাপারটা তো নিঃসন্দেহে বানোয়াট রাবিদের সংযোজন। কারণ সহিহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে, হজরত আলি রা. তাদের দীন ও ঈমান এমনকি তাদের ইখলাস সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করতেন না। একারণেই তিনি প্রতিপক্ষ দলের নিহতদেরকেও জান্নাতি বলতেন।

অবশ্য দুর্বল বর্ণনাগুলো থেকে এতটুকু কথা নেওয়া যায় যে, যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য পবিত্র কুরআন মাজিদকে বর্শার ফলায় উঁচু করে ধরা হয়েছিল। কেননা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হজরত আবদুর রহমান বিন আবজা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাসান ও মুত্তাসিলুস সনদ বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণনাটি এই-

শিয়াদের নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থ 'নাহজুল বালাগাহ'তে উক্ত যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে হজরত আলি রা. এর একটি চিঠি উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিটি থেকে হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে যুদ্ধবন্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ছাড়াও কিছু বিষয় প্রমাণিত হয়। যেমন : হজরত আলি ও মুয়াবিয়া রা. ছিলেন একই মতাদর্শের অনুসারী; তবে তাদের মতানৈক্য ছিল কেবল হজরত উসমান রা. এর কিসাস আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে। নিম্নে চিঠিটি উল্লেখ করা হলো, 'আমাদের ব্যাপারটি এভাবে সূচিত হয়েছে যে, শামবাসীর সঙ্গে আমরা যুদ্ধের ময়দানে সমবেত হলাম। এটা তো স্পষ্ট যে, আমাদের এবং তাদের রব এক, নবীও এক এবং ইসলামের প্রতি আমাদের এবং তাদের আহ্বানও এক। আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা এবং তার রাসুলকে সত্য বলে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রেও আমরা তাদের থেকে অগ্রগামী ছিলাম না এবং তারাও আমাদের থেকে অগ্রগামী ছিল না। শুধু একটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। অর্থাৎ হজরত উসমান রা. এর রক্তের বদলা।

আমরা এই রক্তের দায় থেকে মুক্ত। কিন্তু এর বদলা নেওয়ার বিষয়টি এভাবে পেশ করেছি যে, যে ব্যাপারটি এখন অর্জন করা যাচ্ছে না, তার সাময়িক সমাধান এই যে, যুদ্ধের দাবানল নিভিয়ে দেওয়া হবে এবং মানুষের আবেগ স্তিমিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা হবে। তারপর যখন

شهدنا مع على ثمان مائة، فاقتتلوا يوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت، ثم رفعت المصاحف ودعوا الى الصلح.

আমরা আটশত মানুষ হজরত আলি রা. এর সাথে শরিক হয়েছি। বুধ বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। তারপর পবিত্র কুরআন উঁচু করে ধরা হয় এবং সন্ধির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ১৯৪)

বিবেকের দাবিতেও এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কেননা হাজার হাজার মানুষকে একসাথে মনোযোগী করার জন্য পবিত্র কুরআনের একটি অথবা একাধিক কপি এভাবে উঁচু করে ধরা হয়েছিল, যাতে একসাথে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় এবং সবাই সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়।

তবে যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা সেভাবেই হয়েছে, যেমনটি আমরা সহিহ বর্ণনার আলোকে কিতাবে উল্লেখ করেছি। আবু মিখনাফসহ অন্যান্য দুর্বল রাবির বর্ণনা একদিকে যেমন দুর্বল তেমনি তা বুখারি ও মুসনাদে আহমাদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই এগুলো বর্জন করাটাই নিয়মের দাবি।

শাসনব্যবস্থা দৃঢ় হবে এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে চলে আসবে, তখন আমরা এতটা শক্তিশালী হবো যে, কিসাসের ঘটনার হক আদায় করতে পারব; কিন্তু তারা বলছিল যে, এর একমাত্র সমাধান যুদ্ধ। ফল এই হলো যে, যুদ্ধ সবকিছু গ্রাস করে নিল। যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল এবং স্থায়ী হয়ে গেল। সবাই যখন দেখল, যুদ্ধ উভয় বাহিনীকে দাঁত দিয়ে কাটতে শুরু করেছে এবং তার থাবা বসিয়ে দিয়েছে, তখন তারা আমার কথা মানতে সম্মত হলো। আমিও তাদের কথা মেনে নিলাম এবং অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করলাম'।[৬২৬]

খারেজি মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষক কে ছিল?

হজরত আলি ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যে যুদ্ধবন্ধের চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই হঠাৎ করে একযোগে বিরাট সংখ্যক মানুষের একটি দল এ চুক্তির সঙ্গে বিরোধিতার ঝড় তুলল। তারা একসাথে لا حكم الا لله এর স্লোগান তুলে পৃথক হয়ে গেল।

এখন হজরত আলি, হজরত মুয়াবিয়া ও সকল মুসলমানের বিরুদ্ধে এই যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ, এটাকে কোনো আকস্মিক ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা মনে হয় না। বরং এ সন্দেহ অবশ্যই আছে যে, জঙ্গে জামালে যে দলটি সামান্য সুযোগ পেয়েই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিবদমান দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সফল হয়েছিল, তারাই হয়তো সিফফিনের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কোনো নতুন ষড়যন্ত্র সাজিয়েছিল। অর্থাৎ আগে থেকেই তারা প্রস্তুত ছিল যে, যদি দুই বাহিনীর মধ্যে ঐক্য-সংহতির কোনো পথ সৃষ্টি হতে শুরু করে, তা হলে সেটাকে দীন ও ঈমানের পরিপন্থি হিসেবে প্রচার করে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা হবে এবং পৃথক একটি দল গঠন করে হজরত আলির বিরুদ্ধে এক নতুন সংগ্রামের দুয়ার খুলে দেওয়া হবে।

ইতিহাসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যখনই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবন্ধের ঘোষণা দেওয়া হলো, তখনই কট্টরপন্থি লোকগুলো চিৎকার করতে লাগল যে, হজরত আলি আল্লাহর বিধানের বিপরীত সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। আর কিছু মানুষ না জেনে না বুঝে তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

---

[৬২৬] নাহজুল বালাগা, সাইয়েদ শরিফ রাজি, চিঠি নং ৫৮

কারণ তাদেরকে শোনানো হলো لا حكم إلا لله তথা আদেশ ও বিধান কেবল আল্লাহর। এই মুখরোচক স্লোগান সাধারণ চিন্তার বহু মানুষকে গভীর চিন্তা ও উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত করে দিল। ফলে যুদ্ধবিরতির যে সিদ্ধান্ত ছিল মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম, তারা এর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। ইতিহাসে এ প্রতিবাদী দলটিকেই 'খারেজি' বলে চিহ্নিত করা হয়।

বস্তুত এদের পৃথক হয়ে যাওয়ার পেছনে এই ষড়যন্ত্রই ছিল যে, পুরাতন দাঙ্গাবাজরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খেলাফতে রাশেদাকে আরো দুর্বল ও অকার্যকর করে দিতে চাচ্ছিল। কেননা খারেজি নেতাদের মধ্যে আমরা এমন কিছু লোকের চেহারা দেখতে পাই, যারা হজরত উসমান রা. এর আমল থেকে সাবায়ি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিল, যাদের মধ্যে ছিল হুরকুস বিন যুহাইর, আবদুল্লাহ ইবনুল কাওয়া প্রমুখ। তা ছাড়া বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে জানা যায় যে, যুদ্ধবিরতির পর বহু সাবায়ি—বিশেষত যারা হজরত উসমান রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে হজরত মুয়াবিয়ার টার্গেটে ছিল—হঠাৎ করে ইরাকি বাহিনী থেকে বেরিয়ে খারেজিদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ফলে ইরাকি বাহিনীতে সাবায়িদের উপস্থিতির চিহ্ন আরো ফিকে হয়ে এলো।[৬২৭]

মীমাংসার জন্য সালিস নিয়োগ

হজরত আলি ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যকার মতবিরোধের কারণগুলো দূর করার জন্য সিদ্ধান্ত হলো যে, উভয় পক্ষ একজন করে সালিস বা বিচারক নির্বাচন করবে। উভয় সালিস একসাথে বসে উম্মাহর চলমান বিবাদ দূর করার চেষ্টা করবে। স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার কোনো পথ নিরূপণ করে দেবে। তাদের সিদ্ধান্ত অবশ্যই কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী হবে এবং উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে হবে। উভয় পক্ষের জন্য সে সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া আবশ্যক হবে।

হজরত আলি রা. এর দলে যোগদানকারী সন্ত্রাসীদের ইচ্ছা ছিল আশতার নাখায়িকে সালিস বানানো হোক। আর এদেরই অনুসারী আবু মিখনাফের মতো লোকেরা পরে প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে যে, এটা হজরত আলিরও ইচ্ছা

[৬২৭] খারেজিদের সাথে হজরত আলি রা. এর বিরোধের আলোচনা পরে উল্লেখ করা হবে।

ছিল।[৬২৮] অথচ এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। এটা কী করে হতে পারে, যখন উভয় দল আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রত্যেকে এমন একজনকে সালিসরূপে পেশ করবে, যার ব্যাপারে উভয় পক্ষই আশ্বস্ত থাকবে।[৬২৯] আশতার নাখায়ির উপর তো হজরত আলির দলের নিষ্ঠাবান নেতারাই সন্তুষ্ট ছিলেন না। সে কারণেই তো এক্ষেত্রে হজরত আশআস বিন কায়েস রা. আশতার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা পরে বেশ প্রসিদ্ধ হয়েছিল। মন্তব্যটি হলো,

هل سعر الارض الا الاشتر

আশতার ছাড়া কেউ কি পৃথিবীতে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে?[৬৩০]

হজরত আশআস বিন কায়েস রা. আরো বলেছিলেন, 'আশতার তো এটাই চায় যে, আমরা তরবারি নিয়ে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি'।[৬৩১]

যাই হোক, সহিহ বর্ণনার আলোকে জানা যায় যে, হজরত আলি রা. সালিস-কাজ পরিচালনা করার জন্য হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কে বাদ দিয়ে নির্বাচন করেছিলেন আপন মতের ভিত্তিতে হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে। হজরত আলি তাকে সিদ্ধান্তের পূর্ণ অধিকার দিয়ে এ পর্যন্তও বলেছিলেন যে,

احكم ولو يخر عنقى

আপনি সিদ্ধান্ত পেশ করুন, যদিও তাতে আমার গর্দান যায়।[৬৩২]

হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে সালিস নির্বাচনের কারণ ছিল, একদিকে তিনি ছিলেন বয়স, বুদ্ধি, ইলম ও অভিজ্ঞতায় অনন্য, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছিলেন নিরপেক্ষ। তাই উভয় পক্ষের দৃষ্টিতেই তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। তার তীক্ষ্ণ মেধা, দূরদর্শিতা,

---

[৬২৮] তারিখুত তাবারি : ৪/৫১
[৬২৯] তারিখুত তাবারি : ৪/৫১
[৬৩০] তারিখুত তাবারি : ৪/৫১
[৬৩১] তারিখুত তাবারি : ৪/৫১
[৬৩২] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, বর্ণনা নম্বর : ৩৭৮৫৩, সনদ সহিহ, কিতাবুল আসার লিল কাযি আবি ইউসুফ, বর্ণনা নম্বর : ৯২৯,

ইলম ও মর্যাদা এবং বিবেচনাশক্তির কারণেই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যুবাইদ ও আদনের শাসকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন।[৬৩৩] তারপর হজরত উমর ও উসমান রা. এর যুগেও তিনি কুফা ও বসরার গভর্নর ও কাজির পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এত বড় পদে ইলম ও বিবেকসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি সমাসীন থাকবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

হজরত আলি রা. এর পরামর্শসভার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও হজরত আবু মুসাকে সালিস নিযুক্ত করার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই সালিস নির্বাচনের পর হজরত আশআস বিন কায়েস রা. যখন হজরত আলি রা. কে পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি তো গ্রাম্য এলাকার এক কোমল হৃদয়ের মানুষকে নির্বাচন করলেন। তার স্থলে আমাকে পাঠিয়ে দিন, আমি আপনার চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করতে পারব'।

সঙ্গে সঙ্গে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. উত্তরে বললেন, 'আহনাফ, আমাদের ব্যাপারটি ছাড়ুন, আমরা আমাদের ব্যাপারটি আপনার চেয়ে ভালো বুঝি'।[৬৩৪]

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হলো, বানোয়াট শিয়াপন্থি বর্ণনায় হজরত আবু মুসা আশআরির মতো একজন বিদ্বান ও বিশিষ্ট সাহাবিকে—আল্লাহ পানাহ—'নির্বোধ' বলা হয়েছে। তা ছাড়া আবু মিখনাফ ও নসর বিন মুজাহিমের বর্ণনায় এভাবে মিথ্যা দাবি করা হয়েছে যে, হজরত আলি রা. হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর উপর আস্থাশীল ছিলেন না। বরং তিনি হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কে সালিসরূপে নির্বাচন করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ইরাকি বাহিনীর একরোখা নেতাদের পীড়াপীড়িতে তিনি হজরত আবু মুসা আশআরি রা.কে নির্বাচন করতে বাধ্য হন।[৬৩৫]

এ বর্ণনা সনদের বিচারে অত্যন্ত দুর্বল। তদুপরি সহিহ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য।

---

[৬৩৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ৯৭

[৬৩৪] আনসাবুল আশরাফ : ২/৩৩০, সনদ হাসান,

[৬৩৫] ওয়াকআতু সিফফিন, নসর বিন মুজাহিম, পৃষ্ঠা : ৫৬১, তারিখুত তাবারি : ৫/৫১

হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে নির্বাচনের কারণ

হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে বিবাদ মীমাংসার জন্য হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে সালিস হিসেবে নির্বাচন করা হলো। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর নির্ভরযোগ্য সাহাবি। গাজওয়ায়ে যাতুস সালাসিলে নবীজি তাকে আমির নিযুক্ত করেছিলেন।[৬৩৬]

কিন্তু শিয়া মতাবলম্বীরা তাকে লোভী, দুনিয়ামুখী বলে প্রচার করার সব রকম চেষ্টা করেছে; অথচ তার সম্পর্কে আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছিলেন, 'আমর ইবনুল আস কুরাইশের অন্যতম সৎ ব্যক্তি'।[৬৩৭]

একবার আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে কোনো একটি জিহাদি অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে বললেন, আমর, আমি তোমাকে একটি অভিযানে প্রেরণ করতে চাই। আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখবেন এবং গনিমতের সম্পদও দান করবেন। আমিও তোমাকে সেই সম্পদ থেকে দান করব।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমি তো ধনসম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করিনি। বরং আল্লাহর রাহে জিহাদ করা এবং আপনার সঙ্গ লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য।

নবীজি বললেন, আমর, সৎ মানুষের জন্য হালাল সম্পদ উত্তম জিনিস।[৬৩৮]

এ হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা গেল, হজরত আমর ইবনুল আস রা. ছিলেন দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখেরাতের প্রত্যাশী। আল্লাহর নবী তাকে সৎ বলেছিলেন।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হলো, শিয়ারা একদিকে যেমন হজরত আবু মুসা আশআরি রা. কে অবিবেচক ও অযোগ্য প্রমাণ করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে চরম প্রতারক ও ধোঁকাবাজ বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছে। অথচ এ দুই মহান ব্যক্তিকে বিবদমান প্রেক্ষাপটে উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ

---

[৬৩৬] সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৬২৩
[৬৩৭] সুনানুত তিরমিজি, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আমর ইবনুল আস রা.।
[৬৩৮] তারিখে দিমাশক : ৪৬/১৪২

থেকে পারস্পরিক ঐক্য ফিরিয়ে আনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্বশীলরূপে নিযুক্ত করাই স্পষ্ট প্রমাণ যে, এরা উম্মাহর নিকট কতটা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ছিলেন।

হজরত আলি রা. এর কুফায় প্রত্যাবর্তন

অবশেষে জঙ্গে সিফফিন, সংলাপ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করে হজরত আলি ৩৭ হিজরির ১২ রজব নিজ কেন্দ্রস্থল কুফায় ফিরে যান। এর পূর্বে দীর্ঘ সময়ের জন্য কুফায় অবস্থানের সুযোগ হয়নি। এবার লোকেরা তাকে কিছুটা অবসর দেখে বলতে লাগল, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনি শাহিমহলে অবস্থান গ্রহণ করবেন?'

তিনি বললেন, 'না, কেননা হজরত উমর রা. এটা পছন্দ করতেন না'।[৬৩৯]

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

---

[৬৩৯] আল আখবারুত তিওয়াল : পৃষ্ঠা : ১৫২
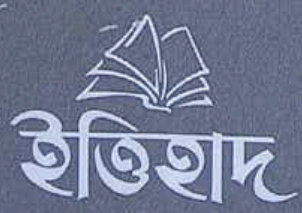
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদকে আল-মানহালের অনুমতিপত্র

AI-MANHAL Publishers

Ref: AMP-107 Date: 10-Feb-2021

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, "Tareekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 151375926893) will take strict legal action.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت کتاب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بنام: مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ بازار، ڈھاکہ، بنگلہ دیش

ہم مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ دیش کو اپنی مشہور و معروف کتاب بنام "تاریخ امت مسلمہ (چار جلدیں)" مؤلف حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب مد ظلہ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

نیز مکتبۃ الاتحاد کے سوا کسی اور شخص / ادارے کو مذکورہ کتاب کے مواد کی نقل یا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بصورت دیگر مکتبۃ الاتحاد کو مذکورہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے۔

والسلام

المنہل پبلشرز

کراچی، پاکستان

Al Manhal Publisher

حامد علی کھوکھر

جنرل منیجر

المنہل پبلشرز، کراچی

92 321 2855000
92 321 3135009
92 213 4914596

SH # 4 & 5, Block 1/A,
Near Shaikh Zaid Islamic Centre,
Gulistan-e-Johar, Karachi, Pakistan.

www.almanhalpublisher.com
admin@almanhalpublisher.com
web.facebook.com/almanhal.publisher
@almanhalpublish

ইত্তিহাদ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

Cover : Kefayat 01712-813999